আলো আঁধার



অনিরুদ্ধ বসু

আলো আঁধার



অনিরুদ্ধ বসু

আলো আঁধার

অনিরুদ্ধ বসু



স্মৃতি পাবলিশার্স

ALO ANDHAR
A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE
Published by **SMRITI PUBLISHERS**
Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৭
প্রথম ই-বুক প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রচ্ছদপটঃ অদিতি চক্রবর্তী
অলংকরণঃ অনিরুদ্ধ বসু
ISBN No : 978-93-82303-90-9

প্রকাশকঃ
স্মৃতি পাবলিশার্স
“ওয়েসিস”
সি এফ - ৪১ সেক্টার ১
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৭০০০৬৪

কবি, কথা সাহিত্যিক, শিল্পী

নীলাচর্যকে

সূচি

যাদের সহযোগিতা এ লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

আশিস কুমার চট্টপাধ্যায়
সুনীল কুমার ভট্টাচার্য
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
ইমদাদুল হক

ভূমিকা

সীমা আর অসীম...

না, নায়ক নায়িকার নাম নয়। কবিতাও নয়, নিতান্তই কঠোর গদ্য।

সীমা কী? কীসের সীমা? জানার? না অজানার? না কি অন্য কিছুর? মানবমনের? না কি মানব-চেতনার? অসীমই বা কী? কবি বলেন এক, আর গণিতজ্ঞ বলেন আরেক। আর মাঝখানের যে সাধারণ মানুষ, তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের কাছে সীমা হচ্ছে জানার সীমা। অসীম হচ্ছে জানার সীমানার বাইরের একটা রহস্যময় কিছু। চেতনার বাইরের একটা অবচেতন বা অতিচেতন স্তর।

সাধারণ পাঠক এতেই বিরক্ত হয়ে হাই তুলবেন। সীমা-অসীম, চেতন-অবচেতন-অতিচেতন এসব ইন্টেলেকচুয়াল তত্ত্বের কচকচানি শুনে কী লাভ? কিন্তু কেউ কেউ হয়ত স্রোতের বাইরে। মধ্যমেধার রাজত্বের বিবর্ণ ধুসর প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে একাকি হেটে চলা এই বিরল দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা ভাবেন এই সব নিয়ে। তাঁদের অনুসন্ধিৎসু চেতনার অস্পষ্ট ধ্যানালোকে ডাক আসে এক আশ্চর্য স্পন্দনে নিরন্তর স্পন্দিত হওয়া অতিচেতনের, শুষুম্না ঈড়া পিঙ্গলার দ্বার বেয়ে বয়ে চলা এক অবচেতন থেকে অতিচেতনে উত্তরনের আহ্বানের। জাগতিক দিকচক্রবালের নিঃঝুম আকাশগঙ্গায় স্নান করে ওঠা অস্পষ্ট মুক্ত আত্মার বিমূর্ত বর্ণহীন অবয়ব ভেসে যায় অসীমের দিকে। যাঁরা এই আহ্বানের মূক ভাষা বুঝতে পারেন, তাঁরাই সীমা আর অসীমের চিরন্তন দ্বন্দ্বের পরপারে চলে যাওয়ার পথটির সন্ধান পান। সন্ধান পান সীমা-অসীম ছাড়িয়ে সেই যে পরম অজ্ঞেয় ক্ষেত্র, সেই তূরীয়লোকের, আজ্ঞাচক্রের পথ ধরে সহস্রারের সেই পরমচেতনার অন্তিম আশ্রয়ে।

কিন্তু সেই ডাক শোনে কয় জনা? শুনতে পেলেও বোঝে ক'জন? বুঝলেও চেনাজানা সীমার নিরাপত্তার বাইরে পা বাড়াবার সাহস খুঁজে পায় ক'জন?

তবে কেউ কী পায় না?

না পায়। কেউ কেউ পায়। তারা বিরল। তারা ব্যতিক্রমী। তারা প্রায় সব সময়েই সমসাময়িকদের মাঝে একটা রহস্যময় চরিত্র, একটা এনিগমা। বা, পাগল!

এই রকম একটি চরিত্র অনিরুদ্ধ বসুর সাহসী সৃষ্টি **'আলো আঁধার'**-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রটি। সে একটি মেয়ে। নাম? নামে কিছু যায় আসে কী? শ্যামা রমা বিশাখা দেবী বনলতা – নাম যাই হোক না কেন, সেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয় যেখানে মানবিক সঙ্কট প্রবল সেখানেই অস্তিত্বচিহ্ন গুরুত্বহীন। যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল তার চরিত্র। অতি সাধারণ চেনা জানা মেয়েটি জীবনের ঘটনাবহুল স্রোতে ভাসতে ভাসতে আর হাজারটা চরিত্রের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে হারিয়ে গেল না, ভাগ্যের এক আশ্চর্য খেলায় সে হঠাৎই খুঁজে পেল জীবনের রহস্য সন্ধানের চাবিকাঠি। আলো আর আঁধারের চোখ ধাঁধানো খেলার মধ্য দিয়ে, হাজারটা চরিত্রের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যের বেড়াজাল ভেঙে, নিজের সীমা পেরিয়ে সে পাড়ি দিল অসীমের খোঁজে। না কি তারও ওপারে? একদিন যে জ্ঞানের বিদ্যুতাগ্নি তার চেতনাকে শিখিয়েছিল 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', যে জ্ঞানজ্যোতিঃ একদিন তার কাছে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিল তার অবচেতনের ঘুমভাঙানিয়া সঙ্গীত 'অয়মাত্মানং ব্রহ্ম', একদিন সেই জ্ঞানের আলোই তাকে বুঝতে শেখাল সীমা আর অসীমের আপাত বিভেদের অন্তস্থলে লুকিয়ে থাকা অভেধ সত্য 'তৎত্বম অসি'। সেই জ্ঞানই অবশেষে তাকে নিয়ে গেল সীমা-অসীমের ওপারে এক একমেবাদ্বিতীম সত্যে – 'অহম ব্রহ্মাস্মি'-র অতিচেতনে।

বইটির পাণ্ডুলিপি শেষ করার পর অনিরুদ্ধ বসুর এই অসাধারণ সৃষ্টিকে কী বলে সাধুবাদ জানাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। বহুমাত্রিক এই উপন্যাসটি হয়ত সবাই একই দৃষ্টিতে দেখবেন না। সেটা সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়। শুধু এই আশা করব, এই অপূর্ব কাহিনিটি কিছু সেরিব্রাল পাঠককে ভাবনার খোরাক যোগাক।

এমন একটি গণ্ডিভাঙা ব্যতিক্রমী উপন্যাস উপহার দেওয়ার জন্য লেখকের কাছে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য ঋণী থাকবে, যদিও এ আমার নিজস্ব অনুভূতি।

ধন্যবাদান্তে

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়
দুর্গাপুর

(প্রকাশকের বক্তব্যঃ ভূমিকা-লেখক নিজেও দুটি ব্যতিক্রমী মগজাশ্রয়ী উপন্যাসের স্রষ্টা – **‘চরৈবেতি’** ও **‘অলীক’**, যার প্রথমটি প্রথাগত স্বীকৃতিও পেয়েছে, দু’ দু’বার আনন্দবাজার পত্রিকার ‘বেস্টসেলার’ লিস্টে স্থান পেয়ে)

অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...



অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, কলকাতায়। পেশায় প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জন। লেখাটা তার নেশা। ২০০৬ সাল থেকে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন।

প্রথম উপন্যাস **"অন্বেষণ"** আলোড়ন সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্য মহলে। ছুঁয়ে যায় আপামর বাঙালি মন। তথাকথিত উচ্চবিত্ত সমাজের পঙ্কিলতা ঘেঁটে আসল ঘরের অমোঘ সত্যটা গণিতের Venn Diagram Theory-র ওপর ভিত্তি করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে ধরতে সক্ষম হয়। পরে তার ইংরেজি ভাবান্তর "Quest" নামক উপন্যাসে প্রকাশিত হয়।

তার দ্বিতীয় উপন্যাস **"নিঃশব্দে"** বর্তমান সমাজের বিরাট ক্যানভাসে আঁকা, আজকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান খণ্ডিত সময়, পূর্ণতার আস্বাদ নিয়ে, এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবনদর্শনের উপাখ্যান। শুধু বহুদিন ধরে বেস্টসেলারই হয়নি, লন্ডন বুক ফেয়ারে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ সাক্ষর রাখে।

তৃতীয় লিরিক্যাল উপন্যাস **"দেখা"** তার পৃথিবী পরিক্রমা ও জীবন দর্শনের এক নিভৃত আরাধনা। পশ্চিম দেখছে পুবের জাগতিক দৈন্যের পিছনের এক বিশাল ঐতিহ্যকে। নাকি পুব দেখছে পশ্চিমের বৈভবের আড়ালে এক অনন্ত হাহাকারকে? কী ভাবে দেখছে? অণুবীক্ষণে না দূরবীক্ষণে? না কী, বিহঙ্গ দৃষ্টিতে! এই উপন্যাসও বেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। উপন্যাসটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় "The Vision" নাম নিয়ে।

সে বারবার তার রচনাশৈলী ও চিন্তাধারাকে সাজাতে চায় নতুন আঙ্গিকে, নতুন দর্শনের বিন্যাসে।

যার ফলস্বরূপ তার চতুর্থ চাঞ্চল্যকর রহস্য উপন্যাস **"চক্র"** প্রচলিত দেশি ও বিদেশি প্রথার বেড়া ভেঙে পরিবর্তন এনেছে মৌলিক চিন্তাধারায়। যুক্তি বিদ্যা ও আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক নতুন আঙ্গিকের রহস্য কাহিনি, যা খুন এবং খুনির বিবর্তন ঘটিয়েছে এই উপন্যাসটিতে। এটিও বেস্টসেলারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা পরে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে "Fulcrum" নাম নিয়ে।

পঞ্চম উপন্যাস **"তোমাকে..."** - তে একটি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে উপস্থাপনা করেছে প্রেমের ছন্দোময় পত্র-উপন্যাসে। নামহীন দুজন মানব মানবী, আধুনিক জীবনের গোলোকধাঁধায় কানামাছি খেলতে খেলতে কখন পৌঁছে যায় সময়ের অন্দরমহলে, যেখানে সময় হয়ে ওঠে উল্লম্ব, নিয়ে যায় তাদের তুরীয় লোকে। আগের মতোই বেস্টসেলারের তালিকায় এটিও অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে প্রকাশিত হয় ইংরেজি উপন্যাস "The Moment" নামে।

ষষ্ঠ বাংলা উপন্যাস **"ক্যানভাসে"** মানব চরিত্রের রং-এর খেলা। প্রিজমের মধ্য দিয়ে চলা সাদা আলোর রঙিন বর্ণালীর মতো প্রতিটি মানুষের চরিত্রই নানা রং-এর। কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি বিশেষ রং, আর কখনো বা ঝলসে ওঠে অন্য কোন রং, আসলে সবই তো সেই জীবন নামক প্রিজমের খেলা। একই জন, বিভিন্ন প্রকাশ। কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনী জীবনকে প্রীজম দিয়ে নানা রঙে ভেঙে অবশেষে পৌঁছে যায় রঙের ওপারে... এটিও বেস্টসেলারের তালিকায় নাম লেখায়। এটিও পরে ইংরেজিতে **"Canvas"** নামে প্রকাশিত হয়ে পোস্ট মডার্ন সাহিত্য হিসেবে আলোড়ন তোলে সাহিত্য জগতে।

সপ্তম বাংলা উপন্যাস **"স্ফুলিঙ্গ"** তে সর্বক্ষেত্রে বাঙালির পিছিয়ে পড়ার উন্নাসিক কূপমণ্ডুকত্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানভূমি থেকে আলোর পাখি ফিনিক্সের উঠে আসার মতো উপন্যাসের প্রটাগনিস্টের লড়াই করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার গল্প।

তার প্রথম স্বরচিত ইংরেজি ইন্টারন্যাশনল অ্যাড্রিনালিন চার্জড থ্রিলার **"Pursuit"** এক অনন্য চিন্তাশৈলীর উদাহরণ। অনেক রহস্যময় মৃত্যুর ফাঁকে উঠে আসে বর্তমান জগতের কঠিন জিও-ইকনমিক্স। আর নিভৃতে ফল্গুধারার মতো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউসিকের মতো বেজে চলে বিশ্বশান্তির অমৃতবাণী। উঠে আসে মানুষের উত্তরণের অমোঘ মন্ত্র, যা পরিণতি পায় তার আগামী ইংরেজি উপন্যাসে।

দ্বিতীয় স্বরচিত ইংরেজি অ্যাড্রিনালীন রেজার **"Eternal Mayhem"** বিশ্ব জুড়ে বৈজ্ঞানিক খুনের প্রতিলিপি। বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক খুনের ব্যাপ্তি প্রসারিত বালি, পুনটা ক্যানা, হাওয়াই, ফিজি, থেকে জামাইকা, পিউয়ারটো রিকো ও ভারতে। সুন্দরী, সায়েন্টিস্ট, শিক্ষিত সম্প্রদায়, সবাই মারড়সার জালে জড়িয়ে পড়ে দ্রুতগতি এই ইন্টারন্যাশানাল থ্রিলারে। চলে যায় জেনেটিক ক্লোনিং রিসার্চের গভীর থেকে সভ্যতার বুৎপত্তিতে। উন্মোচিত হয় বহু অজানা সত্য মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য।

পরের ইংরেজি থ্রিলার "Conundrum" এক অন্য ধাঁধা। অজ্ঞাত পরিচয় এক তুখড় বুদ্ধিসম্পন্ন খুনি অকল্পনীয় অঙ্কে একের পর এক খুন করে যাচ্ছে। সেই অঙ্ক খেলছে আরেক বুদ্ধিদৃপ্ত স্ট্যাটিসটিক্সের অধ্যাপকের সঙ্গে। খেলার গ্র্যামার না জানলে খুনের কিনারা করা অসম্ভব। অধ্যাপক কী ধরতে পারবে এই খেলার গণিত?

তার ইংরেজি উপন্যাস "Shadow" জীবনদর্শনের নতুন চিন্তাধারা। মানসিক উত্তরণ ও শান্তির চাবিকাঠি।

প্রতিটি লেখায় নিজেকে ভেঙে নতুন করে সাজাবার চেষ্টা করে। নিজেকে নতুন ভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই তার সৃষ্টির তৃপ্তি। জীবনের শান্তি খুঁজে পায় স্ত্রী স্মৃতি বসুর মধ্যে।

লেখকের বাংলা উপন্যাস



লেখকের ইংরেজি উপন্যাস



এক

ছবিটা ধোঁয়াশা। চেতনাটা অন্ধের মতো সাদা ক্যানভাসে কিছু আঁকতে চাইছে।

আঁকছে...

মুছছে...

আবার আঁকছে...

আবার মুছছে।

মন রামধনুর সাতটা রঙের বাহারে নতুন স্পর্শ টানতে চাইছে। তবুও... সে স্পর্শকে চেনা যাচ্ছে না।

বোঝা যাচ্ছে না।

পাওয়া যাচ্ছে না।

ধরতে গিয়েও অস্পষ্ট আকার ক্রমশ নিরাকার হয়ে যাচ্ছে। ক্ষণিকের পাওয়া না-পাওয়ার আকাশে হারিয়ে যাচ্ছে নানা রঙের বাইরে... তুলিছোঁয়া ছন্দ, সুর, গন্ধের বর্ণচ্ছটায়। অর্থহীন পৃথিবীর ঘনঘটায়। তবুও মন বিলুপ্ত সত্তার বাইরে অবলুপ্তির অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা অস্পষ্টতা। মনের দোসর... পাওয়া, না-পাওয়ার মধ্যে নিভৃত অবসর।

ছবিটা আলো-আঁধারি মেশানো সিল্যুট। চেনা যায় না। অথচ আছে। অস্তিত্বের প্রতিটি কণায় রয়ে গেছে মানসিক ঊর্ধ্বগতির অলিখিত সেতু। আলো-আঁধারির যুগলবন্দিতে নিরাকার-সাকারের মধ্যে অচেনা ভূমণ্ডল। কায়ার অন্ধকারে নিভৃতে টিমটিম করে জ্বলা ইহলোকের শেষ রশ্মির অস্পষ্ট ছায়া। অবচেতনের অচৈতন্যে, চেতনাকে দেখার নিঃশব্দ চাওয়া। যুগ থেকে যুগান্তরে... অনন্ত সত্যের গভীরে... অনন্ত মহাশূন্যে ভাসছে অদৃশ্য নিরবয়ব। চেনা থেকে অচেনার ব্যাপ্তিতে। না-পাওয়া থেকে গাঢ়তর বাসনায়।

অসীম লক্ষ্মণরেখার বাইরে একটা পৃথিবী খুঁজছিল। আকাশের অন্ধকারে কোনও নাম-না-জানা তারা। সাতাশটা নক্ষত্রের বাইরে কোনও অজানা এক। নাম-না-জানা নক্ষত্রের দিকে অন্ধের মতো না তাকিয়ে সে পথে হাঁটা ভোরের আলোয়। দূর্বা ঘাসে নতুন শিশিরবিন্দু।

সবাই বিশ্বপ্রকৃতির জল, মাটি, ফুল, আকাশ, বাতাস নিয়ে কত খেলাই খেলছে। নানা আঙ্গিকে, জন্ম থেকে জীবনসায়াহ্নে। খেলায় হারজিতের অঙ্ক মেলাতে গিয়েই জীবনটাই পার করেছে। পাওয়ার আশায়... আরও... আরও... আরও... আরও... তারপর? ছোটার নেশায় এই 'তারপর' প্রশ্নটার দিকে ফিরে দেখার সময় হয়নি। তার অনেক পর রয়ে গেছে। জীবনে কত কিছু করার। সময় কই?

না-পাওয়ার খেদ বারবার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে জানান দিয়েছে। চাহিদা বাড়িয়েছে। তারপর একদিন ইঁদুর দৌড় শেষ করে মানিয়ে নিয়েছে নিজের সংকীর্ণতায়, বাধ্যত। এর মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে, মর্ত্যেই গড়ে তুলতে হবে স্বর্গের প্রতিবিম্ব। স্বর্গ না পাতাল, জেনে কী হবে?

সেটাই ইহলোক। সেটাই পরলোকের পথ। জীবন।

এর বাইরে ভাবতে চাইলেও অসীম দিশা পায়নি। সময়ও ছিল না। ভুখা পেটে ইঁদুর দৌড়ে নামা। যার শুরুটা জানলেও শেষ অজানা। প্রয়োজনও হয়নি। শুধু অন্তহীন বন্ধনহীন দৌড়। যার শেষ নেই। তাই পাওয়া না-পাওয়ার হিসেবে মেলানোর অঙ্কে শুধু লাল-নীল, জাগতিক। বলিরেখা উতরিয়ে সময় হয়েছে ফিরে দেখার।

এ তো এক্সেল বা ট্যালি নিয়ে ব্যালেন্স শিটে বড় অঙ্কের বাজিমাতে দাঁও নয়। জৈবিক চাহিদার মধ্যে চেনা অথচ না-চেনা এক স্রোত। যাতে বেশিরভাগ লোক গা ভাসায়। হাসে-কাঁদে। এভাবেই পার হয়ে যায়। তবুও

খোঁজা হয় না কায়ার শিকলে জড়ানো চেনা পটে আসল নক্ষত্র। অকারণ প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া। সার্থকতায় না-দেখা স্ফুলিঙ্গের না-পাওয়া রেশ।

এক নক্ষত্র তার র‍্যাগস টু রিচেস জীবনে, দশ বছর প্রোজ্জ্বল। ছবিটা দেখা-জানা-বোঝা-চেনার আগেই বেশিরভাগের জীবন ফুরিয়ে যায়। যাপনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয়, ওই অদেখা নক্ষত্রটা তো দেখা হল না। বোঝা, জানা হল না। সেই দৃশ্যমান প্রান্তরের মাঝেই স্বর্ণালী। জীবনের লড়াইকে পেছনে ফেলে, সময় হয়েছে নতুন করে খোঁজা। ঈশ্বরের অসীম করুণা, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি তার জন্য। স্বর্ণালীই সূত্র। মাঝখানের অজানাই জেগে ঘুমোনোর সুপ্তি... যা ওকে তাড়িয়ে বেড়ায় না-পাওয়ার সন্ধানে।

তাই খোঁজা। সারাজীবন ধরে বারবার। অতি পরিচিত নক্ষত্রগুলোর বাইরেও আরেক নাম-না-জানা, অনাবিষ্কৃত। মন্ত্র কী, শেষের মুছে যাওয়া আলোটুকু? না কি, আলোর ডানা মেলে ভেসে বেড়ানো?

আলো-আঁধারিতে মন যখন গাঙচিল, স্বর্ণালী বারান্দার দরজায় “ভেতরে এস। শীত পড়ে গেছে। ঠান্ডা লেগে যাবে”

“চাদরটা দিয়ে যাও” অসীম অন্ধকারে চেয়ে।

“আমি একা ঘরে টিভি দেখব আর তুমি হিমে বসে থাকবে? আমারও তো ভালো লাগে পাশে বসে টিভি দেখ”

“আমার ভালো লাগে না” অসীম হারিয়ে গেল। অন্ধকারের মাদকতায় ঢাকা না-চেনা পৃথিবীর মোহ। কাল মিশে গেল ওর দৃষ্টির বাইরের মহাকালে – ভেসে আসা ঝিঁঝির ক্যাকোফনিক ঐকতানে। এই নিঝুম অন্ধকারের মাদকতার মোহময় রূপ আছে। সেই মোহ মনকে আলেয়ার মতো ছোটাচ্ছে অজানা দীপালোকে।

দরজায় দাঁড়ানো স্বর্ণালীর সামনের আর পেছনের দুনিয়ার সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছে। টিভি দেখতে ভালো লাগে না।

শালটা জড়িয়ে স্বর্ণালী “চা এনে দেব?”

“দাও”

বারান্দা ছাড়িয়ে স্বর্ণালী হারিয়ে গেল ঘরের কৃত্রিম আলোয়। দিবালোকের প্রতীক্ষায়। স্বপ্ন-বাস্তবের দোটানায় মায়ালোকের দিশায়। কালকে চেম্বারের সেশন চেয়ার করা থেকে সোনার বাংলার ককটেল ডিনার। লাঞ্চ টাইমে সিএম-এর সঙ্গে মিটিং। এসব ছকে বাঁধা রোজকার অঙ্ক। সেই গণিতেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাথেয় করে খেলেছে শৈশব থেকে, কুড়িটা বছর ধরে।

ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়া মুখস্থ থেকে শুরু। আজ ‘চ্যাটার্জি’ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ’-এর কর্ণধার। পরিচিত ছোটা, জাগতিক পথে এগোনো, স্বাভাবিক, দৈনন্দিন রুটিন। তখন খুঁজছিল বাঁচার মন্ত্র। এখন চেতনার অব্যর্থ তন্ত্র। তখন এত তারা চিনত না। নামও জানত না। অচেনা তারাদের ভিড়ে শুধু একটাই পরিচিত। ধ্রুবতারাই দিশা। বাঘাযতীনের রিফিউজি কলোনির বাঁশমোড়া ঘর থেকে প্রতিষ্ঠার মসনদে, সিংহাসন ঘিরেই স্বপ্ন। তীব্র বাসনায় এগোনো। পুজোয় নতুন জামা? স্বপ্নের জলছবি। দেওয়ালির রোশনাই দূরে, চকচকে চোখে।

মৃত্তিকা ফুলঝুরি এগিয়ে দিত “নে, আজ দেওয়ালি”

মানে বোঝার আগেই, মন ফিরত সলতের দিয়ায় পড়া মুখস্তে। মৃত্তিকার দেওয়া ফুলঝুরি নাড়ানোয় ক্ষণিকের স্ফুরণ। বর্ণাঢ্য আলোয় ক্ষণিক আনন্দের স্পর্শ। কবিগুরু বোঝার সময় ছিল না। বাঘাযতীনের কলোনিতে কবিগুরু-চর্চা স্কুলপাঠ্য। শুধু বাঁচার ঠিকানা খোঁজা। স্বপ্নকে ধরার তীব্র প্রচেষ্টা। স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে? ভারতবর্ষ... সভ্যতা... ঐতিহ্য... শুধু বড়লোকি মায়া। ওপার বাংলার সম্বলহীনের কাছে অর্থহীন। মুড়ি জলে আগ্রাসী খিদের ভূত তাড়িয়ে, স্বপ্নের হাত ধরেই একটু সুস্থভাবে বাঁচার প্রয়াস। চেয়েছে কুড়ি বছর ধরে।

তবুও... আজও স্বপ্ন দেখে।

সময়ের আবর্তে শুধুমাত্র স্বপ্ন কিংবা তার রংটা পালটেছে। হয়ত সব কিছুই আগের মতো। শুধু নতুন করে ভাসছে। প্রাসাদে দাঁড়িয়ে না-পাওয়ার আশা। পেলেই জীবন সার্থক। চাওয়াটা যখন গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ে, তখনই পাওয়ার জন্য মন হু-হু করে।

স্বর্ণালী চায়ের কাপটা বারান্দার বেতের টেবিলে নামিয়ে বলল "গরম গরম ঘুগনি করেছি। দেখ তো, ঠিক হয়েছে কি না?"

ঘুগনিটা মুখে পুরে বলল "বেশ হয়েছে"

"তোমাকে খাইয়ে মজা নেই। যা-ই দিই না কেন তাতেই খুশি" স্বর্ণালীর আক্ষেপ।

কী করে বুঝবে স্বর্ণালী? যার দু-বেলা অন্ন জুটত না, তার কাছে আহারে বাহার বাতুলতা। শৈশবের অভ্যাস আজও ছাড়তে পারেনি। বাহারি খাবারের মেলায় অতৃপ্ত। খিদেটা বারবার হাতছানি দেয় আড়ম্বরের আড়ালে। পূর্ণতাতেই শান্তি। বাকিটা বাড়তি। মোহ কোন অজান্তেই কেটে গেছে। বুঝতে পারেনি কখন, কীভাবে। প্রাপ্তির সম্পূর্ণতা তাকে ক্রমশ অসম্পূর্ণ করে তুলেছে। সীমার বাইরে অসীমের সন্ধানে। অচেনা পৃথিবীর আলোকিত দিশায়।

মুচকি হেসে বলল "কেন খারাপ বললে খুশি হতে?"

স্বর্ণালী ফিরতে গিয়ে বলল "তোমার তো পেট ভরলেই শান্তি"

কার যে কীসে শান্তি, সে কি জানে? এই আবর্তেই ছুটে বেড়ায় সারাটা জীবন। উত্তরের কথা না-ভেবেই অনুমানের ওপর এগিয়ে চলে। জীবনের গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে। না পারে ছাড়তে। না পারে আসল রূপ দেখতে। এতকাল অসীম তাই করেছে।

সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওপার বাংলার রাজানগরের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে আসা। পেট্রাপোল পেরোবার আগেই পাক সৈনিকের গুলিতে বাবা-মায়ের মৃত্যু। বাবার মুখাগ্নির দৃশ্যটা এখনও চোখে ভাসছে। মায়ের পড়ে থাকা লাশ। তিন বছরের ছেলেটার বুঝতে অসুবিধা হয়নি, ওরা বেঁচে নেই। সীমান্তপারে শব্দের ঘূর্ণিঝড়ে সে-ও হারিয়ে যেত। যদি না সেদিন রবীনকাকুর পরিবার হাত ধরে তাকে নিয়ে আসত কলকাতায়। অচেনা শহর। অচেনা লোকজন। হাফ প্যান্টের পকেটে শুধু এক টুকরো চিরকুট। বাঘাযতীনে মামাবাড়ির ঠিকানা। বাঁচার একমাত্র সম্বল।

মামার হাতে অসীমকে তুলে রবীনকাকু বলেছিল "বলতাসে ও সনাতনের পোলা"

মামা আদর করে অসীমের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল "স্নেহময়ীর পোলা? স্নেহময়ী আর আমি পিঠাপিঠি ভাইবোন। কুমিল্লায় থাকতে ওর সনাতনের সঙ্গে বিয়া হইল। তারপর ওরা চইল্লা গেল রাজানগরে। আর চাকরির আশায় আমি পাড়ি দিলাম এপারে, কইলকাতায়"

রবীনকাকু বলেছিল "আপনার বোন স্নেহময়ী আর সনাতন দুজনেই গুলির লড়াইয়ে মারা গেসে পেট্রাপোলের আগে। আমাগো ছোট্ট মেয়ে রুমকিও মারা যায় একই সময়। সেখানেই এই পোলাটি বইসসা কানতাসিল। রুমকির কথা মনে হইতেই ওর জন্য মায়া হইল। আমারাও তো জানি না কোথায় যাইতাসি। শেষমেশ ওর পকেট ঘাইট্টা আপনাগো ঠিকানাটা পাইলাম। ভাবলাম নিয়া যাই, যদি আপনারা ঠাই দেন"

মামা অসীমকে জড়িয়ে বলেছিল "হ্যাঁ... হ্যাঁ... আমরা সারা আর ওর কে আসে?"

অসীমকে মামার হাতে তুলে বাঁচার খোঁজে হারিয়ে গেছিল রবীনকাকু। আর দেখেনি তাদের। আজ তারা কোথায়, কে জানে? পরে, বহু বছর পরে, অনেক খুঁজেছে। জীবনের উত্তরণের পথে খুঁজে পায়নি তাদের। চেনা ধ্রুবতারা থেকে অচেনার রথে। আশ্রয়ের সহায়–সম্বলহীন গতে। ছোটবেলার স্মৃতিটুকু আজও থেকে গেছে। ম্লান অনির্বাণ সলতের টিমটিমে আলোয়।

রবীনকাকু চলে যেতেই শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে মামি হেঁশেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল "কে গা?"

"আমাগো স্নেহময়ীর পোলা"

"একা?"

মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল “স্নেহময়ী আর সনাতন দুজনেই এদেশে পালাইয়া আইতাসিল। পেট্রাপোলে, যুদ্ধের গুলিতে, ওরা দুজনেই আর নাই। ওদের পোলাটি আমাগো লগেই থাকব”

মামির রক্তচক্ষু আজও ভোলেনি। মামার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেছিল “থাকব? তার মানে? এমনিতেই তো দিনান্তে পান্তাভাত জোটে না। উনি আবার লগে কইরা আরেকটা আপদ আইন্যা জোটাইলেন”

সেকথা মনে করতে চায় না। বাঘাযতীনের রিফিউজি কলোনির বেড়া দেওয়া নামমাত্র আশ্রয় না থাকলে, সে বানের জলে ভেসে যেত। তবুও একটা টালির চাল। আধপেটা থাকলেও, মুড়ি জুটত। মেঝের ছেঁড়া কাঁথাটায় শুতে না পারলে কী স্বপ্ন দেখতে পারত, অজানার পথ ধরে মসনদ গড়ার।

পাশের ঘরে এইচডি টিভি দেখছিল স্বর্ণালী। হঠাৎ ঘরে থেকে ওর গলা ‘মেডিটেশনস’ কার লেখা?”

চমকে উঠল অসীম। স্বর্ণালী এসব প্রশ্ন করছে কেন?

“হঠাৎ?” ঘর থেকে ছিটকনো আলোর দ্যুতির দিকে প্রশ্ন।

“কৌন বনেগা ক্রোড়পতিতে প্রশ্ন করছে। তাড়াতাড়ি বল” আলোর দ্যুতির মধ্যে অবয়বের কণ্ঠস্বর।

“মারকাস অরেলিয়াস”

হঠাৎ এত বছর পরে মেডিটেশনস নামটা শুনে চমকে উঠল। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলো মনে করিয়ে দিল ফেলে আসা অতীত। পড়ার খাতিরে পড়েছিল। তখন মানে বোঝেনি। কেবল পুথিপড়ার মতো মুখস্থ করা পরীক্ষার জন্য ‘ফর দেয়ার ইস ওয়ান ইউনিভার্স আউট অফ অল, ওয়ান গড থ্রু অল, ওয়ান সাবস্টেন্স অ্যান্ড ওয়ান ল্য, ওয়ান কমন রিসন অফ অল ইনটেলিজেন্ট ক্রিচার্স অ্যান্ড ওয়ান ট্রুথ’

আবার অন্ধকারে ফিরে তাকাল। রোমান দার্শনিক সম্রাট মারকাস অরেলিয়াস ১২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনেক সত্য বলেছিলেন। মনের টানাপড়েনের সঙ্গে কোথায় সামঞ্জস্য। ঠিক জানে না। ঝিঁঝির সিম্ফনি জানান দিচ্ছে একটা যোগসূত্র আছে। পুরাতন থেকে নতুনে। শব্দের সঙ্গে না-শোনা অর্কেস্ট্রার ব্যঞ্জনায়। কাজের তাগিদে সারা পৃথিবী বারবার ঘুরেছে। ছোটার উন্মাদনায় ভুলেই ছিল অন্তরকে পরখ করার। অবসর পায়নি।

এই মুহূর্তে বারান্দায় বসে সে কী সেই ধ্রুবতারা খুঁজছে? না কি, নিজেকে? রং পাল্টানো ধ্রুবতারাটা ঝিঁঝির কলতানে নেই। অনন্তেও নয়। আছে একাকী নীরবতায়। অস্তিত্বকে ফিরে দেখা, অবগুণ্ঠন সরিয়ে অন্তরের নগ্ন চেতনায়।

“একদম ঠিক বলেছ। তোমার মেমরি সাংঘাতিক। এখনও মনে রেখেছ!” পাশের ঘর থেকে স্বর্ণালীর গলা।

যেন স্বর্ণালীর প্রশংসাটা শুনতে পায়নি। অসীম তখনও ধ্রুবতারা খুঁজতে ব্যস্ত। সীমার মধ্যেই তার ঠিকানা। এতকাল সীমা আর অসীমের টানাপড়েনে সত্য সন্ধান। এযাবৎ ভাসছিল পৃথিবীর আকর্ষণে। বর্ণহীন চেতনায়।

তারাটাই আসল। চেতনাকে কী রূপে মানুষ দেখে সেটাই তারা রূপে কালস্রোত থেকে উদ্ধার করা মুক্তোর কণা। সহস্র ধূসরের মধ্যে জেগে থাকে একটাই রং।

সে রংটা কী?

দুই

ঝংকারটাই জীবন।

বিভিন্ন আকারে। বিভিন্ন পটের চিত্রকলায় ছড়িয়ে পড়ে স্পন্দন জাগায়। ওরা বোধহয় সেই চেনা ছবির কোনও অচেনা রূপ আঁকতে চাইছে লক্ষ্মণরেখার ঘেরাটোপে। কিংবা নিজের দেখাকে মনের মতো করে। বিউটি অ্যাট ইটস বেস্ট। সাতাশটা নক্ষত্রের মধ্যে কোনওটা। নাম জানা নেই, চেনা নেই। আবরণে ঢাকা রূপ তার ধোঁয়াশায় ঘেরা, অস্পষ্ট।

এমন তো কোনও কথা নেই, সৌন্দর্যটা প্রকৃতির অ-দেখার মধ্যেই লুকিয়ে? জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যেও তো তাকে খুঁজে নেওয়া যা। নাই-বা বাঁধা পড়ল লক্ষ্মণরেখায়। সে তো পুরাণের কথা। যে রেখার বাইরে পা বাড়ালেই রাবণের হাতছানি। মোহের স্বপ্নহানি। মহাবিশ্বের গূঢ় রহস্য ভেদ করেছিলেন বলেই তিনি বেদব্যাস। আজকের যুগ সেই রহস্যের ধারে-কাছে না পৌঁছতে পেরেও পৃথিবীর চৌহদ্দিতে স্বপ্নসৌধ গড়তে চাইছে। বাস্তব রামায়ণে আর সীমাবদ্ধ নেই। পুরাণ থেকে একবিংশ শতাব্দীতে অনেক বিবর্তন হয়েছে। আজকের দিনে রাবণ কে? সেটাই বোঝা গেল না। রাম-রাবণের ভেদাভেদটা যেমন আজ অস্পষ্ট, তেমনি সত্যমিথ্যের ব্যঞ্জনাও আপেক্ষিক। সীমা আর অসীমের ফারাকটাও ধূসর পরিমণ্ডলে আলোকের ব্যাপ্তির মতো ফোটন ক্লাউড সৃষ্টি করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে আর পুরাণ আঁকড়ে কী লাভ? যখন গ্লোবালাইজেশনের দানব যন্ত্রমানব কম্পিউটার, বিশ্বায়নে অস্তিত্বটাকে ছোট্ট প্রসেসারে বন্দি করতে চাইছে। ডবলিউ ডবলিউ ডবলিউ ডট কম। অনেকটা ডেমিয়েনের ৬৬৬-র মতো।

জীবনটা কী অতই সহজ?

স্বর্ণালী বি বনি বিউটি পার্লার থেকে বেরিয়ে অরুন্ধতীকে বলল “এবার?”

“টলি না বেঙ্গল ক্লাব” অরুন্ধতী ইতস্তত করছিল। খাওয়াটা প্রধান, না শামিয়ানার পাশে লনে বসে হাওয়া খাওয়াটা। অনেক কাজের ফাঁকে একটাই ছুটির দিন। অরুন্ধতী নষ্ট করতে চায় না। সারা সপ্তাহ কাজের ব্যাস্ততায় কেটে যায়। মাঝে এই একটা দিন। ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে নির্ভেজাল সময় কাটানো। এ তো লন্ডন নয়। ওয়েস্ট এন্ডে গেলে, সময় কাটানোর অনেক উপকরণ আছে। এই শহরে নেই। হয়ত আছে। অতটা ভাবার, দেখার সময় নেই। এখন সব কিছু ইনস্ট্যান্ট। জীবনটা নেসকাফে কিংবা ফাস্ট ফুড টেক-আওয়ের মতো হয়ে গেছে।

তখনও বিয়ে হয়নি। এলিনার হাত ধরে হারিয়ে যেত নাইটসব্রিজের হ্যারডসে, বা টটেনহাম কোর্ট রোডের সেলফ্রিজের প্রাচুর্যে। পসরার আতিশয্যে।

“ইটজ সো এক্সপেন্সিভ হিয়ার। ইভেন হোয়েন দ্য সেল ইজ অন” এলিনা অরুন্ধতীর হাত ধরে বাইরে আনতে চাইত।

“লেট মি স্টে এ লিটল লঙ্গার” প্রাচুর্য হাতের মুঠোয় না পেলেও, দুচোখ ভরে দেখায় পরিতৃপ্তি। প্রথম যৌবনে না-দেখার সাধ।

রয়েল ডল্টন থেকে এডিনবারা ক্রিস্টাল। মিস্টি দ্য রোসা থেকে স্যানেল হাতে স্প্রে করার সুগন্ধ। দেশি জাগতিক পূর্ণতা থেকে বিদেশি আকর্ষণে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটা আনাচে-কানাচে খুঁজে বেড়ানোর বীজ লুকিয়ে। মন দামি আসবাবে নিজেকে খুঁজছে। নিত্যনতুন সাজের বাহারে। হার ম্যাজেস্টি না হলেও মন সাজতে চাইছে কেন্সিংটন প্যালেসের মুকুটহীন সিংহাসনে।

“কাম অন ধুতি। উই ডু নট গো টু অ্যান্ডার্স শপ আনলেস দেয়ার ইজ এ সেল” এলিনা সেলফ্রিজের বাইরে জনবহুল টটেনহাম কোর্ট রোডের দিকে তাকিয়ে।

“ওয়েল ফর ইউ ইট মাস্ট বি লাইক এনি আদার কর্নার শপ। ট্যু মি ইট ইজ এ হলিডে” অরুন্ধতী প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর শিশু।

হলিডে মানে, বাবার ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে সোহো থেকে আমস্ট্রেডামের অরবাগমল-ভুরবাগমলে ঘোরা। লেক লুজার্ন, মাউন্ট টিটিলিস রোপওয়েয়ের শিখর থেকে পৃথিবীকে দেখার সুপ্ত আগ্রহ। হলিডে মানে ইনসব্রুকে অ্যালপ্সের সৌন্দর্যের শিখরচূড়া থেকে করফুর হলুদ বালির বিচে নীল-হলুদ বিকিনি পরে নীলাভ জলরাশির তরঙ্গে স্নান। যা পায়নি, যা দেখেনি, সেটাই জীবন। তাকে নানা রসে উপভোগ করার নতুন ছন্দ। যা মন চায় তাই বর্ণাঢ্য।

বয়স কম। দেহের খিদেও বেশি। মনের খিদের রসদ খুঁজছে রূপসজ্জায়। মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার থেকে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ডিজাইনার ব্যুটিকের বাহারে। না পেলেও, অবচেতনে পাওয়ার আশা।

“বাহুবলি” স্বর্ণালী কটকি শাড়িটা ঠিক করে বলল।

“তুই দেখছি আজগুবি স্বপ্নের ফ্যান?”

“ওই ট্যাঁস মহিলাদের রোজকার একঘেয়ে কচকচানি শোনার চেয়ে সিনেমা দেখা অনেক ভালো। নয় কী?”

অরুন্ধতী কালো স্ল্যাকসের ওপর নীল টপস ঠিক করে। ইটালিয়ান লেদারের পার্স খুলে এস্টিডা ল্যডারের মেকআপ কিট বার করে আয়নায় মুখ দেখল... ইশ, ব্রণর দাগগুলো এখনও স্পষ্ট।

স্বর্ণালী কাঁধ অবধি ছাড়ানো চুল ঘাড়ের পেছেনে ফেলে বলল “এসব বিউটি পার্লার করে কিসসু হবে না। খালি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাই যাবে। বুড়ো হচ্ছিস। বুড়ো হয়েই থাক”

যদিও ওরা কলেজ জীবনের বন্ধু, তবুও দৃষ্টির কিঞ্চিৎ ফারাক। ছোটবেলার পৃথিবীই বুৎপত্তি। স্বর্ণালীর মধ্যে সাবেকি বাঙালিয়ানার সংযম থাকলেও অরুন্ধতী জীবনের রেসকোর্সে দৌড়চ্ছে। হারতে চায় না। জীবন মানে চিরযৌবনা থাকার অঙ্ক। ছুটে চলার নিত্য নতুন মন্ত্র। মন্ত্রবাক্সের যন্ত্রণা থেকে বিচ্যুত করে প্রবহমান সময়কে ধরতে চাওয়ার সংকল্প।

অরুন্ধতী ব্যাগে আয়নাটা ঢুকিয়ে মুচকি হাসল “কেন বুড়ো হব? এখনও মাসিক বন্ধ হয়নি”

‘মাসিক’ শব্দটা শুনলে স্বর্ণালী কুঁকড়ে ওঠে। সেই এগারো বছরে যখন জামা ভেসে গেছিল, বুঝতে পারেনি। চুপিচুপি মাকে জানিয়েছিল। “সব-মেয়েরই হয়। আজ থেকে বড় হয়ে গেলি”

বড় হওয়ার কথাটা ভুলে গেছে। মেয়েকে বড় করাটাই এখন তার দায়িত্ব। অরুন্ধতীকে বলল “মেয়ে এখন বড় হচ্ছে”

“তোর মেয়ে বড় হতে পারে, আমার মন কিন্তু এখনও কলেজের দিনগুলোয় হারাতে চাইছে”

“যৌবনকে ব্রণ লুকিয়ে ধরে রাখবি?”

গাড়িতে বসে অরুন্ধতী বলল “ধরে রাখব কেন? এ কি ধরে রাখার! এ তো মুক্তোর মতো ছড়াবার আবেগ। যতক্ষণ যৌবন আছে ততক্ষণ আমি সম্পূর্ণ নারী। পাততাড়ি গোটাবার কোনও ইচ্ছেই নেই”

“আনন্দটা কোথায়, ঠিক বুঝলাম না। তুই বুঝে গেছিস। এটাই তোর সৌভাগ্য”

আনন্দ কী লেলিহান শিখায় নিজেকে সপে দেওয়া? না কি, মধ্যরাতে ক্লান্ত বিনিদ্র স্বামীর পাশে শুয়ে দিনগত পাপক্ষয়ের ঘেরাটোপ।

সৌম্য বহ্নি হলেও, জয়ন্ত পাপ-পুণ্যের সাথী। মালাবদল থেকে ফুলশয্যা, জীবনচক্রের অলিখিত কক্ষপথেই ঘোরাফেরা অরুন্ধতীর। কিংবা স্বর্ণালীর। অচৈতন্যের পথে ওদের বন্ধন। একই পথে হাঁটা। অফুরন্ত অবসরের কিছুটা ভাগ করে নেওয়া।

"যদি যৌবনকে মুক্তর মতো ছড়িয়ে সবাইকে, সঙ্গে নিজেকেও আনন্দ দিতে পারি, ক্ষতি কী? সুন্দরের জয় সর্বত্র"

বর্ণালীর কথা মনে হতেই স্বর্ণালী বলল "আয়নাটা বার কর"

ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখা আয়নাটা এগিয়ে দিল। স্বর্ণালী আয়নাটা নিয়ে মুখটা দেখল। গোলপানা গেরস্ত মুখ। অসীমের প্রাচুর্যের সঙ্গে বনেদিয়ানার জৌলুস পড়ে গেছে। বিদেশি ছোঁয়া নেই। আছে মধ্য-কলকাতার রক্ষণশীল ভেঙে পড়া ভাড়াবাড়িতে বড় হওয়ার ছাপ। সাবেকি রীতিতেই বিকাশ। নামগোত্রহীন অসীমের সঙ্গে জুটি বাঁধা। সামাজিক উত্তরণের ফাঁকে নিজেকে খোঁজার অবকাশ।

দিদি বর্ণালীর সৌন্দর্য স্বাভাবিক। বর্ণহীন হয়েও বর্ণালী। সৌন্দর্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আভরণহীন হয়েও স্নিগ্ধ রশ্মির শিখা। নাম-না-জানা ভবিতব্যের না-দেখা ধূসর চিত্রপট। সে দিদির মতো সুন্দরী নয়। তাই সব সময়ই না-পাওয়াটাকে ছুঁতে চেয়েছে।

একবার...

বারবার...

শতবার...

তাই অরুন্ধতীর সঙ্গে বি-বনিতে। মেদটা সুখী জীবনে কন্ট্রাসেপ্টিভের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সেটা লক্ষ করেছে। তাকে বাগে আনতে খাওয়ার সংযম। রোজ জিম থেকে জগিং। বাড়ির লনটা ছোট নয়। কয়েকবার পাক খেলেই কিলোমিটার সেরে ফেলা যায়। মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। ফুলগাছে জল। সকালে মন ভরিয়ে দেয়। সময় থাকলে বিউটি সেন্টারে মেদ কমানোর বাড়তি প্রচেষ্টা।

সেই দেখে অসীমের ঠাট্টা "তোমার পিএলসিসি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে কী করল? তোমাকে তো আগের মতোই দেখি"

"কী রকম?"

"সেভাবে কী কোনওদিন দেখেছিলাম না কী? মনে তো পড়ে না। তাহলে তো বর্ণালীকেই বিয়ে করতাম"

"ইশ। দিদির সঙ্গে আমার থ্রু দিয়েই পরিচয়। আমাকে ডিচ করা সম্ভব ছিল না। ইচ্ছে থাকলেও সে গুড়ে বালি"

রোজ দেখার মধ্যে কী বৈচিত্র্য? সাবেকিয়ানা? সাজানো সৌন্দর্যে না তাকিয়ে ভেতরটাকে পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস? স্বর্ণালীর গুলিয়ে যায়। নিরানন্দ পৃথিবীর আবর্তে এই ধোঁয়াশাও এক ধরনের আনন্দ।

অরুন্ধতী গাড়ির পেছনের সিটে "এই যে গাড়িতে ছুটছি, তাতেও তো আনন্দ"

শেষ জেনে কী হবে? শুরুই তো অজানা। জন্মের আগে কিংবা মৃত্যুর পরে। জানা জীবনের অজানায় ছোটাই মূলমন্ত্র। এখানেই চিন্তার শুরু। এখানেই চিন্তার ইতি।

অরুন্ধতী সেটাই খুঁজছে। নীল আকাশের তারা নয়। শুধুই জীবন, যাপনের মধ্যে। তারাদের থাকতে দাও অসীম মহাশূন্যে। আমাকে বাঁচতে দাও ছোট্ট গণ্ডির রঙিন ছন্দে। আমরা তো কোনওদিন ধ্রুবতারা হতে পারব না। নাই বা হলাম অরুন্ধতী, অনুরাধা, স্বাতী। থাকতে পারি একাকী চাওয়ার নিজস্ব ছন্দে। 'বাহুবলি' থেকে টলি ক্লাবের নৈশভোজে।

স্বর্ণালী আপত্তি জানিয়েছিল "তুলি বাড়িতে একা। রাত করা কী ঠিক হবে?"

"কাজের লোকের কমতি নেই তোর বাড়িতে। অসীমদাও তো ফিরে আসবে বিকেলের মধ্যে"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অরুন্ধতীর কথায় সায় দিয়েছিল। একটা দিনই তো। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার মধ্যে নিজের করে পাওয়া মুহূর্ত।

একটু নেশাগ্রস্ত স্বর্ণালী যখন বাড়ি ফিরল, অসীম বারান্দায়। আজকাল কাজের শেষে মোবাইল হাতে অসীম প্রায়শই বারন্দায় বসে তারা গোনে। মোবাইলেই ওর সাম্রাজ্য। 'চ্যাটার্জি গ্রুপ' চালায় ওর বোতামে।

"কোত্থেকে?"

"বাহুবললি দেখে টলি ক্লাব" স্বর্ণালী শাড়ি ছেড়ে ওয়ারড্রবে নাইটির সন্ধানে। অর্ধনগ্ন গিন্নির দিকে তাকিয়ে বলল "রাত তাহলে হয়েছে"

নাইটি পরে ফেসিয়াল ক্লিন্সিং লোশনের তুলোয় মুখ পরিষ্কার করতে করতে বলল "একদিন তো আমাদেরও রাত ছিল। আজ সুদিন এসেছে"

অসীম ঘরে ঢুকে বলল "এসেছে কী?"

মানেই বুঝল না স্বর্ণালী। আজকাল অসীমের অনেক কথাই বোঝে না। কেমন পালটে গেছে। অন্য জগতে ওর বিচরণ।

নাইটির গিট বেঁধে ঘুমন্ত তুলির দিকে তাকিয়ে সোফায় বসল "মানে?"

অসীম স্বর্ণালীর পাশে, স্থির দৃষ্টিতে একঝলক দেখে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে অন্ধকারে। অচৈতন্যকে, চেতনার মানে বোঝাতে গেলে মুহূর্তটাই মাটি। কী করে বোঝাবে ওকে? যার দুনিয়া পার্থিব গণ্ডির লক্ষ্মণরেখায় সীমাবদ্ধ। বর্ণালী হলে বুঝত। উত্তরটা এড়িয়ে বলল "কে খাওয়াল?"

"অরুন্ধতী। অবশ্য আরও অনেকে ছিল"

হলি-বলি-টলির পৃথিবী নিয়ে মাথাব্যথা নেই অসীমের। ওদের কাছে চিন্তা আশা করা বাতুলতা। ওদের পৃথিবীটা অর্থ আর ক্ষণিকের যশের বায়বীয় পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ। তবুও কিছু সময় দিতে হবে স্বর্ণালীকে। সব স্ত্রীই এটুকু আশা করে স্বামীর কাছে।

"ম্যাডামের কী খাওয়া হল?"

"বাকারডি উইথ কোক। বেলভেডিয়ার লাউঞ্জে কন্টিনেন্টাল। শামিয়ানার পাশের মাঠে বসে অরুন্ধতীর রবীন্দ্রসঙ্গীত"

"তুমি তো এক সময় গাইতে। ছেড়ে দিলে কেন?" পাইপ জ্বালাল।

"এখন ওসব ভালো লাগে না। করেই বা কী হবে?"

পাইপের ধোয়া ছেড়ে বলল "বর্ণালী কিন্তু এখনও চালিয়ে যাচ্ছে"

"দিদির সময় কাটানোর জন্য প্রয়োজন" থেমে বলল "আচ্ছা আমি কী মোটা হয়ে গেছি?"

স্বর্ণালীর প্রশ্নে অবাক অসীম "কে বলল?"

"সেদিন বাথরুমের আয়নায় দেখে মনে হল। এখানে-ওখানে চর্বি জমে যাচ্ছে"

"খাওয়া কমিয়ে দাও" নির্লিপ্ত অসীম।

বালিশে গা এলিয়ে অসীমের পাশে শুয়ে স্বর্ণালী বলল "যদি লাইপোসাকশন করাই, তোমার আপত্তি আছে?"

আকাশ থেকে পড়ল অসীম। বুঝতে পারে না, যখন তার এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই, তুলিও বড় হয়ে উঠছে, ওর সৌন্দর্যের প্রতি মোহের ভূত এখনও কেন? সে তো এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। সম্পর্কেও রেশ পড়েনি। কেন এ মোহ? কোন নতুনত্বের খোঁজে?

ওর দিকে তাকিয়ে বলল "অরুন্ধতী বলেছে বুঝি?"

"এ-মা, অরুন্ধতী বলতে যাবে কেন? ও আমার থেকে কত স্লিম। আমারই মনে হল"

অসীম এখনও বোঝে না, কার মনে কোথায় আলোড়ন? সে যদি নক্ষত্রের খোঁজে অবসর সময় অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাসিয়ে দিতে পারে, তবে স্বর্ণালীই বা কেন লক্ষ্মণরেখার বলয়ে সৌন্দর্য খুঁজবে না?

সবাই কিছু খুঁজছে - অসীম, স্বর্ণালী, বর্ণালী, মৃত্তিকা। সকলেই। অরুন্ধতীও। রূপ ক্যালিডিওস্কপের মতো মুহূর্তে রং বদলায়। তার বাহারে আসল রং চেনায় ভুল হয়ে যায়। সর্বক্ষণ।

তিন

মেয়েকে স্কুলে পাঠানো স্বর্ণালীর রোজকার কাজ। যদিও ড্রাইভারনিয়ে যায়। আগে জোগাড়যন্ত্র করতে হয়। এ বছর একটু হাল্কা। পরের বছর হাই স্কুল। মানে আবার স্কুলের পড়া কেঁচেগণ্ডূষ করতে হবে। তখন হলি-বলি-টলি সব বন্ধ হয়ে সন্ধেবেলা মেয়েকে পড়ানো। সিরিয়াল দেখাও বন্ধ হয়ে যাবে। অবকাশ আবার শশিভূষণ দে স্ট্রিটের ছোটবেলার পড়াশোনার নিত্য অভ্যাসে। বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই। তা সত্ত্বেও সময় করে উঠতে পারে না। কোথা দিয়ে প্রবহমান কালের মতো ছুটে যায় বুঝতেও পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এত কাজের ব্যস্ততায় অসীম কোত্থেকে সময় পায়?

কলেজ জীবনে আলাপ অন্তরঙ্গতায় বাঘাযতীনের ইতিহাস বারবার শোনা। ভণিতা ছাড়াই অকপটে নিজের অতীত প্রেয়সীকে বলা। সে যা, তাই। চিনে নাও নিজের মতো করে। সে কবেকার কথা। প্রথম বর্ষে প্রেসিডেন্সির করিডরে দেখা। আলাপটা অদ্ভুতভাবে। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে বই-শাড়ি সামালাতে হিমসিম। বই আছড়ে পড়ল করিডরে।

একজন সেগুলো তুলে দিয়ে বলল "এত বই একসঙ্গে পড়া যায়?"

বইগুলো জড়িয়ে বলল "লাইব্রেরি থেকে ইস্যু করে নিলাম। নইলে পাওয়া যাবে না। ওয়েটিং লিস্ট এক যুগ"

"আপনি তো কবিগুরুকেও হার মানিয়ে দেবেন"

"ধ্যাত। কোথায় আমি আর কোথায় রবীন্দ্রনাথ। এত বই পড়ব নাকি? যা ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে স্রেফ নোটস বানাব। পরে পরীক্ষার আগে ওটা মুখস্থ করেই মেরে দেব"

ভালো লেগেছিল ওর সহজ সারল্য। ভালো লেগেছিল গোলপানা মুখের অকপট স্বীকারোক্তি। ভালো লেগেছিল স্বর্ণালীকে।

"অসীম"

"স্বর্ণালী"

"ভালো লাগল আলাপ হয়ে" অসীম সিঁড়িতে পা দিয়ে বলেছিল "এত পড়াশোনা করে কী হবে? জানার কী শেষ আছে?"

তখনও অচেনা। মেয়েদের কৌতূহল তুষের আগুণের মতো। কে ছেলেটা? পরে জেনেছিল প্রেসিডেন্সির তুখোড় ছাত্র। কৌতূহল বেড়ে গেছিল। আলাপ করতে হবে। চিনতে হবে। ভালো করে জানতে হবে। প্রথম ভালোবাসা? একবার দেখেই চেনার প্রত্যাশা? অভিলাষের পারদ ওঠেনি। কৌতূহল প্রথম পদক্ষেপ।

শশিভূষণ দে স্ট্রিট থেকে প্রেসিডেন্সির দূরত্ব খুব বেশি নয়। বাড়ি, কলেজ, পড়া। বাবার ধমকে গানের রেওয়াজ। মাঝে-মধ্যে বর্ণালীর সঙ্গে অরুণা, পূরবী, ছবিঘর, প্রাচীতে সিনেমা। সেখানে পুরুষের অস্তিত্ব ছিল না। প্রেসিডেন্সিতে ঢোকার পর বহু ছেলেকে দূর থেকে দেখেছে। এই ছেলেটিই প্রথম, যাকে দেখে জানার স্পৃহা। তখনও বোঝেনি, যে তাকে বই তুলে দিয়েছিল, নামটাই শুধু অসীম নয়, সে সত্যিই অসীম। সীমার মধ্যে তাকে পাওয়া অসাধ্য। কলেজের প্রতিটা মেয়ে যার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। সীমার গণ্ডিতে বাঁধা তার মতো নগণ্য মধ্যবিত্ত মেয়ের কী মূল্য অসীমের কাছে? মূল্যটা এসেছিল ওর থেকেই, অনেকদিন পরে।

গেটের বাইরের বেরোবার মুখে কোনও ভণিতা না করেই অসীম বলেছিল "তুমি কী জানো আমি তোমায় ভালোবাসি?"

উত্তর দিতে পারেনি। মুখ লাজুক লাল। পড়ন্ত দিনের আলোয় মিশে শিহরণ জাগিয়েছিল।

"আমাকে?" বাকরুদ্ধ স্বর্ণালী পালিয়ে বেঁচেছিল।

পেয়েছিল অসীমকে। যেভাবে আর কেউ পায়নি। বন্ধুত্ব থেকে ভালোবাসা। কলেজ থেকে শশিভূষণ দে স্ট্রিটের রংচটা বাড়িতে। আজও অম্লান চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে। কোন নিয়মে? সদুত্তর জানা নেই। স্বাভাবিকভাবে ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন, সেলিব্রেটেড হিয়ার অন আর্থ। ঘর বাঁধা। অনুরাগের অবশ্যম্ভাবী ফসল তুলি। তখনও অসীম সহায় সম্বলহীন। মাদকতা। জানত না তার শেষ সার্থকতা। ভাগ্যের চাকাটা তখনও ঘুরছে। কোনদিকে ঠেকবে জানে না। হেড না টেল? প্রথমে টেলেই পড়েছিল। হঠাৎ অদৃশ্য জাদুকরের ম্যাজিক ওয়ানডের ছোঁয়ায় উল্টে হেড।

এই জীবন। যাদবপুরের ফ্ল্যাট থেকে আলিপুরের মসনদে যাত্রা মসৃণ ছিল না। দিনগুলো আজও ভোলেনি স্বর্ণালী। বাবুর্চি–আর্দালিদের আড়ম্বরে চেনা পৃথিবীতেও অদৃশ্য দেওয়াল। ওপারে কী লুকিয়ে কে জানে? দেওয়ালের ওপাশ দেখার সাহস হয়নি। চেষ্টাও করেনি। রক্ষণশীল বলয়ের মধ্যে বড় হওয়া। তার বাইরে ভাবতে পারে না। আর চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধারের স্ত্রী হওয়ার পর তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণও নেই।

শশিভূষণ দে স্ট্রিট থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের দূরত্ব বেশি নয়। দু-পা হাঁটলেই কলেজ। মাঝেমধ্যে কফি হাউসের আড্ডা। পুটিরামের সন্দেশ। এখন আর ওখানে যাওয়া হয় না। গেলে হয়ত জানতে পারত, পুটিরাম এখন আর চলে না। পাশে গড়ে উঠছে ফাস্ট ফুডের জিশান। যেমন পরিবর্তন হয়েছে ওর জীবনপথে।

"মিষ্টির নেশাই তোর সর্বনাশ" অরুন্ধতী ঠাট্টা করত।

নেশার লোভ এখনও সংবরণ করতে পারে না। রসিকতা এখন বাস্তবে। মেদের সম্ভারে। ডেসার্ট ইজ এ মাস্ট। এত বছর পরেও মিষ্টির মোহ ত্যাগ করতে পারেনি। মিষ্টি আর লাইপোসাকশন একসঙ্গে? অসীম মুচকি হাসে।

"বাঙালি হয়ে মিষ্টি খাব না তা-ও কী হয়? আমার তো ডায়াবেটিস নেই" তালপাতায় রসগোল্লাটা মুখে পুরে তরুণ হোটেলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলত "নে নে চল চল। অরুণা বেশি দূর নয়। ঠিক টাইমে পৌঁছে যাব"

পুটিরাম থেকে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক পেরিয়ে অরুণা। সিনেমার নামটা ভুলে গেছে, তবে নেশা আজও ছাড়তে পারেনি। দু–পা হাঁটলেই তো বাড়ি। অরুন্ধতীকে কদ্দুর যেতে হবে, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে।

অসীম ওদের সিনেমার চক্করে নেই। জানে সিনেমা দেখা হলে স্বর্ণালী ফিরে আসবে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে। তারপর ওরা দুজনে উদ্দেশ্যহীনভাবে কলেজ স্ট্রিট ধরে পাশাপাশি হাঁটবে। চাঁদ-তারা-সূর্য দেখার কথা হবে না। নক্ষত্রের গল্পও স্বপ্নের আঁতুড়ঘরে। অনর্থ বাক্যালাপ। হাসি-ঠাট্টা-তামাশা। নির্বাক পাশাপাশি চলা। এ অন্য ভালোলাগা। চাপা আনন্দের মিঠে সুর। উপস্থিতিই মূলমন্ত্র। ফাঁকে নতুন বন্ধনে নিবিড় স্বপ্ন। সেটাই টিমটিম করে জ্বালায় অনুভূতি। সেই নিবিড় স্বপ্নেও নক্ষত্রের দূরত্ব। দুই মেরুর দুই নক্ষত্র। উঠতি যৌবনের ছন্দে, মনের ক্যানভাসে একটা চেনা ছবি আঁকার চেষ্টায়। মানবমনের চিরকালীন স্বপ্ন। সেখানে দিয়া জ্বালাতে পারলেই সম্পূর্ণতা। মেয়ের জীবনের জাগতিক পাওয়া। চাওয়াকে পেলেই পাওয়া সম্পূর্ণ। হোক না পরিব্যাপ্তিতে বাঁধা। ক্ষতি কী? পরিচিত পৃথিবীর বদ্ধতায় শান্তি, মুক্তি। যা তার জানা-চেনা। জানাকে আপন করার মধ্যেই সার্থকতা।

তখন যৌবনের আবেগ ছিল। স্বপ্নের মণিহার পরে ময়ূরপঙ্খীতে ভাসতে কার না ভালো লাগে? আবেগের ছন্দ, পাশ কাটিয়েছিল চিন্তার ব্যাপ্তিকে। লাভ ইজ ব্লাইন্ড। আবেগের মাধ্যাকর্ষণে দুটি ভিন্ন নক্ষত্রের যুগলবন্দি চেনা অঙ্কের গণ্ডিতে। অঙ্কের ভেন ডায়াগ্রাম থিওরির মতো। ইন্টারসেকশন অফ সার্কেলস অ্যাট সার্টেন পয়েন্টস। রিলেশনশিপ বয়েলস ডাউন টু ইটস কনসেপ্ট?"

"কোথায়?" স্বর্ণালীর প্রশ্নে অসীম উদাসীন "যেখানে খুশি। আজকের কাজ শেষ"

সেই বয়েসেও অসীমের নিষ্ঠা ছিল। পূর্ব পরিকল্পিত অঙ্ক শেষ না করে খুশির অঙ্কে মন দিত না। পায়ের তলায় যে মাটি নেই। রিফিউজি। অস্তিত্ব করে নেওয়ার জন্য যা করণীয় তা করতেই হবে। পাছে পায়ের তলার মাটি না সরে যায়। তারপর প্রেম-ভাব-ভালোবাসা। স্বর্ণালীর মনে হয়েছিল, অসীম ছুটে চলা দুনিয়ার অন্য উল্কা। যার রূপে মেয়েরা মজে, যার আকর্ষণে স্বপ্নের বুনিয়াদ। সেখানে তার নাম লিখে ফেলতে পেরেছে। কম কী? রূপে, না মনের মানুষটাকে? সে কী নিজেও জানত? মধ্যবিত্ত জীবনে স্থির ভবিষ্যতের চেনা স্বপ্ন। বহু চেনা রূপ, রং, গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণ, জৌলুস। অতি পরিচিত রূপ। কাউকে আপন করে পাওয়ার উদগ্রীব স্পৃহা।

অসীম বলত "আধপেটা খেয়ে বড় হয়েছি। আমার তো কিছুই ছিল না। আজও নেই। একটা জায়গা করে নিতে হবে"

সহায়-সম্বলহীন পিতৃ-মাতৃহারা অনাদরে বড়-হওয়া অসীম পায়ের তলায় মাটি খুঁজছিল। তার সঙ্গে অনুভূতির আবেগ। কাউকে বিশ্বাস করে আঁকড়ে ধরা। কী করে স্বর্ণালী অনেক নক্ষত্রের মধ্যে জ্বলে উঠল, ঈশ্বরই বলতে পারেন। ভালো লাগত ওর অদম্য জেদ, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আত্মসচেতনতা। ভালো লাগত অসীমের দ্যুতিকে। অন্যান্য ছেলের থেকে বিচ্ছিন্ন নিজস্বতাকে।

"আজ আধপেটা। কাল বিরিয়ানিও জুটতে পারে। কে জানে?"

"তখন হয়ত খাবার মতো অবস্থা থাকবে না"

"তুমি কি না। এখন থেকেই ডায়াবেটিস, ব্লাড-প্রেশার নিয়ে চিন্তা। যদির কথা নদীতে"

"যদিটা নদীতেই মেশে। জীবনের নিয়ম। আমি কোন ছাড়?"

স্বর্ণালী অতদূর ভাবতে চায় না। জন্মালে মৃত্যু অনিবার্য। তারপর ভাবতে পারে না। ভেবে কী হবে? তাহলে তো বাঁচাই অর্থহীন। ও বাঁচতে চায় আর পাঁচজনের মতো। স্বাভাবিক নিয়মে। ধরে রাখতে চায় মুহূর্তের মাধুর্যকে। আশা আকাশচুম্বী নয়। আশার চেয়ে বেশি পেয়েছে। তাতেই খুশি। যা পায়নি? সবার জন্য নয়। অত ভেবে কী হবে? যে ভাবে চলছে, চলুক।

তুলি স্কুলে যাওয়ার জন্য জামা পরছিল। মাকে বলল "আমাকে কেন রোজ স্কুলে যেতে হয়? রবীন্দ্রনাথ তো স্কুলে যেতেন না। উনি কী কিছু কম জানতেন?"

স্বর্ণালী ঘাবড়ে গেল। কী বলবে? রবীন্দ্রনাথ আর তুলি এক? যদিও মনেপ্রাণে সব বাঙলিই চায় তাদের সন্তান যেন রবীন্দ্রনাথ হতে পারে। ক'জন পারে তাকে উপলব্ধি করতে? সবাই তো রবীন্দ্রনাথকে বিক্রি করে টু-পাইস কামাতে ব্যাস্ত। বুঝতে গেলে মালকড়ি আসবে না। উপলব্ধি আর বাণিজ্যের মধ্যে ব্যাপক দূরত্ব। স্বর্ণালীর কাছে রবীন্দ্রনাথ মানে বর্ণালীর পাশে বসে রবীন্দ্রসংগীত শেখা। শেখা হলেই উঠে পড়ত। রবীন্দ্রসংগীত তার বশে নয়।

বাবা ধমক দিত "দেখ, বর্ণা কেমন রোজ সকালে উঠে গলা সাধে। তুই সাধিস না কেন?"

"অত সকালে ওঠা পোষায় না"

যখন ঘুম ভাঙে, তখন কলেজে যাওয়ার হিড়িক। কলেজ শেষে অরুন্ধতীর সঙ্গে সিনেমা দেখে, অসীমের সঙ্গে মনের দু-কথা বলে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত। গান নিয়ে বসার সময় কোথায়? এখন রবীন্দ্রনাথ মানে দিশেহারা রিমেকের ধুমে বিলুপ্ত সৃজন সিনেমা, সিরিয়াল, মিউজিক চ্যানেলে। সেখানেই চর্বিতচর্বণ শোনা। মডার্ন কালচার। পাঁচমেশালিতে বাঙালিকে শেখাতে অপারগ কবিগুরু কালচার? 'অমিত' তুমি ব্যর্থ। ঘোলাজলে বিক্রি হওয়া রাব-ইন্ডিক ব্যবসার কাছে পরাজিত। শুনলেই রাব-ইন্ডিক। বুঝতে হলে তো অনেক পরে উপলব্ধি। সময় কোথায়? তাই 'প্যাকেজ রবীন্দ্রনাথ' এখন কবিগুরু। উনি না জন্মালে বাঙালি কী প্যাকেজ বিক্রি করত?

অবুঝ মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে স্কুলে পাঠতে হবে। তাই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে বলল "তুমি রবীন্দ্রনাথ নও"

"হতেও তো পারি" তুলি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

বর্তমান আগামীকে প্রশ্ন করছে। কে কবিগুরু হবে, কেউ বলতে পারে? স্বর্ণালীই বা কী করে বলবে? স্কুলে যাক চাই না যাক, তুমি রবীন্দ্রনাথ হবে না। অথবা অন্য কোনও মনীষী। সকলেই ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন প্রকারে, মানুষের ভাষায় বলে গেছেন। চিরন্তন সত্য উদ্ভাসনে। সত্যই জীবন মরণ। মানুষের অন্তরে কে পৌঁছতে পারে কে-ই বা তার ঠিকানা রাখে? যে পারে, সে-ও কী জানে? স্বীকৃতিটা ঈশ্বরের কৃপা। কখন, কোন সময়, কাকে আশীর্বাদ দেয়। বিগ্রহ নয়। অন্তরের ভাষা। সত্য সুন্দরের প্রত্যাশা। সেটাই কী জিজ্ঞাসা? কী উত্তর দেবে? সম্বল শুধু অতীতে হরেন মাস্টারের কাছে শেখা যেটুকু। রবিবার সকালে পুঁথির বিদ্যেটা আবার ঝালিয়ে নেওয়া। বর্তমান রংহীন পৃথিবীর মধ্যে রং খোঁজা।

লক্ষ্মণরেখাকে তুলির প্রশ্ন সঙ্কটে ফেলেছে।

তার আত্মজ বর্তমান। ভবিষ্যতের ডালি সাজায়নি। জীবন বয়ে গেছে আপন স্রোতে। তার মধ্যে দুই প্রজন্মের সঙ্গমকাল। পালটে গেছে সময়ের হাত ধরে। তার বিবর্তনে রং, রস, রূপ নতুন আকার ধারণ করেছে। প্রশ্নটা চিরকালের। ওরা, আমরা, না কারা? আমি, তুমি, ওরা, আমরা, কারা-র বাইরেও একটা পৃথিবী থাকতে পারে, ভাবার অবকাশ হয়নি। মেয়েকে ভোলানো ছাড়া পালটা যুক্তি বাতুলতা।

অত ভেবে কী হবে? এর থেকে বোকা বাক্সের সামনে বসে অবসর কাটানো নির্ঝঞ্ঝাট। চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। অর্থহীন। জটিলতায় লাভ কী? বাবা মায়েরা অতীতের কথা বলে। যতই প্রগতিশীল হোক না সমাজ, সংস্কারের ঘেরাটোপে বন্দি, অথবা দ্ব্যর্থ ব্যঞ্জনার সংমিশ্রণে। তার মধ্যেই পৃথিবী। চাওয়া-পাওয়া, দেওয়া-নেওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা। জীবনের গতি, দ্যুতি, প্রগতি। সামাজিক শান্তির মিথ্যে বলয়। সেখানেই জীবনের পরিতৃপ্তি। অথবা অবলুপ্তি থেকেই নশ্বরে পূর্ণতা।

তুলিও স্বপ্ন দেখে। গতানুগতিক চিন্তা থেকে আলাদা। সেই স্বপ্নই আগামীর বুনিয়াদ। মুখ গোমড়া করে স্কুলব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে বলল “বিচ্ছিরি। একদম ভালো লাগে না। তুমি দেখে নিও, একদিন রবিঠাকুর হয়ে দেখিয়ে দেব। স্কুলে যাওয়ার মানেই হয় না”

যার বাবা পয়সার অভাবে ল্যাম্পপোস্ট বা হ্যারিকেনের আলোতে স্কুলের গণ্ডি উতরেছে, তার মেয়ের নিজের গাড়িতে স্কুলে যেতেই কত না কষ্ট। এগিয়ে চলার স্পৃহা অনেক পাওয়ার মধ্যে টিমটিম করে জ্বলছে। অথবা ঝড়ো হাওয়ার দাপটে নিশানা খুঁজছে। বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতবেগে। শুধু দিকটাই অজানা। তবে কী ধ্রুবতারাটা সরে গেছে? না কি, তার রং পালটেছে? স্বর্ণালী তো রাহুর গ্রাসে বন্দি। তুলি ঠিকই বলেছিল। পুঁথিগত শিক্ষা মানুষ তৈরি করে না। আসল শিক্ষা করে। মনীষীরা তাই পূজনীয়। বিগ ব্যাং থেকে বর্তমানের নোঙরহীন মাঝ দরিয়ায়।

তুলি অতীতের কচকচানি শুনতে চায় না। ওরা আজকের প্রজন্ম।

নিজের ভাষায় শুনতে ভালোবাসে।

নিজের বোধে বোঝে।

নিজের চোখে দেখে।

মনের অনুভবকে বিচার করে।

বাবা সারাদিনের ক্লান্তির পর বাসে ঝুলে যখন বাড়ি ফিরে আলনায় শার্ট ঝোলাত, বর্ণালীকে গলা সাধতে দেখে বলত “গান করছিস ভালো কথা। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হবি না”

স্বর্ণালী কলঘর থেকে বেরিয়ে হকচকিয়ে গেল। বাবা যে কি না। বড় মেয়েকে লেখাপড়া করতে বলে। ছোট মেয়েকে রেওয়াজ করতে বলে। বুঝতে পারে না বিপরীতধর্মী হেঁয়ালিপনা। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় মানুষ হওয়ার মন্ত্র লেখাপড়া করে কেউকেটা হওয়ার। চেনা-জানা আকার। পাওয়ার অভিলাষ। সার্থক হওয়ার প্রচেষ্টা। আলোর রোশনাই বন্দি লক্ষ্মণরেখায়। চিরপরিচিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায়। সেখানেই রাবণের ভয়। কবে সযত্নে লালিত চিন্তাধারাকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অজ্ঞানের আঁধারই দিকহীন দর্শন। যেমন

টিমটিম করে জ্বলত শশিভূষণ দে স্ট্রিটের ঘরে ষাট ওয়াটের বালব। নীরবে অনেক কিছু বলতে চাইত। বোঝার অবকাশ হয়নি স্বর্ণালীর সেদিন।

একদিন বাবা ওদের দু-কামরার খাটে শুয়ে রবিবাসরীয় পড়ছিল। স্বর্ণালী চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল "আচ্ছা বাপি, তুমি দিদিকে খালি লেখাপড়া করতে বল। আর আমাকে গলা সাধতে বল কেন?"

খবরের কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে, বাবা বলেছিল "যেটা যার হবে সেটা জানা। যার জন্য সাধনা দরকার সেটাই বলি"

স্বর্ণালী বুঝত না, যার যেটা হওয়ার নয়, তা কী কখনও হয়? সাবেকি মন তার আশায় বাঁচে, স্বপ্ন দেখে। তার ঘোরেই কেটে যায় জীবন। ওর স্বপ্ন তত সুদূরপ্রসারী নয়। সে তার সীমিত পরিমাপে এগিয়ে যায় আপনভোলা ছন্দে। নিজের আনন্দে। অত হিসেব-নিকেশ বোঝে না।

বাবার কথায় জেদ চেপে গেছিল।

"গান হবে কি না জানি না। দেখো বাপি, পড়াশোনায় ভালো করব"

করেও ছিল। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট নিয়ে মাস্টার্সে উত্তীর্ণ। সাবেকি প্রথায় বিয়ে করেছিল অসীমকে। তখন কী জানত, এই ছাপোষা বিত্তহীন ছেলেটাই হয়ে উঠবে কলকাতার উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেদিন বোঝেনি। সাতাশটা নক্ষত্রের বাইরেও অন্য নক্ষত্র থাকতে পারে। মধ্যবিত্ত মন অত সুদূরে ভাবে না। স্বর্ণালীও নয়। বা বোঝেনি। এখন, না বুঝলেও অনুভব করতে পারছে ভাগ্যের ছক্কা। অসীম শুধু চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধারই নয়। চেনাজানা সীমার বাইরের অন্য নক্ষত্র। নাম জানা নেই। পরিচয়ও এই দশ বছরে সঠিক করে জানা হয়নি। এটুকু বোঝে, সে ওর জীবনের স্তম্ভ। যার আচ্ছাদনে, তার সাবলীল জীবন অনায়াসেই নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবে। মা কিংবা বাবা ভবিষ্যতের কথা না জেনেই নাম দিয়েছিল অসীম। ওপারের তাৎপর্যটা বোঝা স্বপ্নের অতীত। স্বর্ণালীরও নয়। এক অজ্ঞাতকুলশীল তরুণ যে কোনওদিন অসীমের খোঁজে হারিয়ে যাবে, বুঝতেও পারেনি।

জীবনের রং কতই না বদলায়!

চার

অরুন্ধতী সারাজীবন ধরেই চেয়েছিল অন্য কিছু একটা করতে। পরিমণ্ডলে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বাঁচতে। ধ্রুবতারা হতে পারবে না জেনেও, সাতাশটা নক্ষত্রের থেকে অন্যরকম। অন্য কিছু।

সোহমকে বলল "হবে না?"

সোহম অরুন্ধতীর প্রশ্ন শুনছিল না। তাকিয়েছিল ওর বোতাম খোলা গোলাপি টপসের ফাঁক দিয়ে বুকের খাঁজে। আরেকটা বোতাম যদি খুলে যেত... বহুদিনের সাধ। অরুন্ধতীকে আরও বেশি করে পরখ করতে পারত। সে শুধুই নক্ষত্র নয়, চাওয়ার বাহ্যিক প্রকাশও। অনেকের মধ্যে অনন্য।

কমিশনার অফ কাস্টমস অ্যান্ড একসাইজের বউ বলে নয়। মনের ধ্রুবতারাও নয়। ওর মধ্যে এমন মাদকতা, যা উদ্বেল করে দেয় বহু বাসনাকে। মহিলা সংস্পর্শে কম আসেনি। অরুন্ধতী যেন দূরের অদেখা নক্ষত্রের জাগতিক রূপ। তারার মোহময় আলো সামনে, পার্থিব আকারে। প্রত্যাশার আলোয়। দূরের নক্ষত্রকে তো ছোঁয়া যায় না। শুধুই দেখা যায়। যদি-বা ওকে একটু ছোঁয়া... খোঁজা–ছোঁয়ার অঙ্কটা ভেতরে চলতেই থাকে। হোক না আবছায়া সিল্যুট। অবয়বটাই সীমার মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত অংশ। সীমার বলয়ে ঘোরা অজান্তে রক্ষাকবচও। বাইরেটা অজানা।

আবার বলল "হবে না কেন? তুমি চাইলে না হয়ে পারে"

অরুন্ধতী ওর থেকে চোখ সরিয়ে বাইরের দিনশেষের ম্লান আলোর দিকে তাকিয়ে উদাসীন "চাইছি কবে থেকেই। পাচ্ছি কোথায়?"

ব্যবসায়িক দিক পাকা করতে সোহমের উত্তর "কিছু পেতে গেলে, কিছু দিতেও হয়। নয় কি?" আড় চোখে অরুন্ধতীকে দেখল।

ব্যবসাটা ভালোই বোঝে। চারটে টিভি চ্যানেল, তিনটে খবরের কাগজের মালিক। অরুন্ধতীর যে ওকে প্রয়োজন ভালোই বুঝে গেছে। দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ ইন দিস ওয়ার্ল্ড... সোহম বোঝাতে চাইছে।

অরুন্ধতী যে বোঝে না, তা নয় "কী বলতে চাও? আমি, না জয়ন্ত?"

বাইরে সন্ধ্যার প্রলেপ ক্রমশ গাঢ় হলেও, ঘরে নানান আশার আলো–আঁধারির লুকোচুরি। দর কষাকষি চলছে। আজকের দুনিয়ায় হিসেব ছাড়া কেউ এক পা এগোয় না। যুগটা বদলে গেছে। একবিংশ শতাব্দীতে মনের অঙ্ক থেকে হিসেবের অঙ্কের বেশি কদর। ইনস্ট্যান্ট সাকসেস। রথ দেখা কলা বেচার যুগ্ম ছন্দ প্রতিটা পদক্ষেপে। ক্ষুদ্র সীমার গণ্ডিতে। তার মধ্যেই বাঁচা-মরা। পরের ভবিতব্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মূর্খ, কোন পাগল বসে থাকবে ভাগ্যের চাকা ঘোরার আশায়। ভাগ্যকে বাক্সবন্দি করে মুঠোয় নিয়ে খেলা। তার চাবিকাঠি হাতেই। জানতে হবে কখন বা কী কৌশলে খুলতে হবে।

অরুন্ধতী সোফায় গা এলিয়ে। সোহম শিশু। একটু নয় খেলাই যাক শিশুটিকে নিয়ে। মন্দ কী?

ভডকার গ্লাসে আরেকটু স্প্রাইট ঢেলে বলল "লেবু আছে?"

সোহম সহাস্যে বলল "আলবাত মেমসাহেব। ছুরি আছে কি না জানি না। বস, দেখছি"

লেবুর খোঁজে সোহম হারিয়ে গেল কিচেনে। অরুন্ধতী বসে রইল লেবু তোলার ভডকার আসরে। ভডকায় লেবু সহজেই ডোবানো যায়। কিন্তু সহজেই কী লেবুর জল মেশানো যায়? অরুন্ধতী লেবুর মতোই ভাসতে চায় চলমান সমাজে ভডকার নেশায়। কাজের নেশায় বুদ, উন্মাদনার আশায়, ভিন্ন রসে জয়ন্তর বাইরে। অস্তিত্বের স্বপ্নে সোচ্চার নিজস্ব বেলাভূমিতে। যেখানে জীবনের নেশায় বুঁদ হওয়া যায়। ফ্যাশন আনলিমিটেডকে যে কোনও প্রকারে অগ্রগতির শিখরে নিয়ে যেতে হবে। মিস্টার সেনের প্রতি দায়বদ্ধতা।

অন্নদাতার প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য। রথ দেখতে গিয়ে কলা বেচতে পারলে মন্দ কী? ক'জনই বা পারে দুটোকে একসূত্রে বাঁধতে? ভারসাম্য হারিয়ে ভেসে যায় জোয়ারে। হারিয়ে যায় অতল গহ্বরে। অরুন্ধতী হারাতে চায় না সুদূরের নক্ষত্রখচিত আকাশে। বাঁচতে চায়, মাটির গন্ধ বুকে নিয়ে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, আপন মহিমায়। দিকগত তারতম্য।

তখনও আলিপুরের বেলভেডিয়ার রোডের বাংলো ছিল না। সদ্য আইএএস পাশ করা জয়ন্ত সাধারণ সরকারি চাকুরে। মেধাবী ছেলেটিকে বরমাল্য পরিয়েছিল বাবার তাগিদে, স্বর্ণালীর পাশে অসীমকে দেখে। তার স্ট্যাটাসের তুলনায় নেহাতই নগণ্য। সেই নগণ্য পরিবেশে মন টিকত না। হেঁসেলের রান্না নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। তাই বেশিরভাগ সময় পৈত্রিক বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাটেই। স্ট্যাটাসের সঙ্গীদের সঙ্গে বৈবাহিক জীবনের সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা। জয়ন্তর বাবা-মায়ের পরিচর্যার বিষয় নয়।

মিডল্টন স্ট্রিটের লরেটো থেকে উত্তীর্ণ। স্কুল ফেস্টে সেন্ট জেভিয়ার্স-এর ছেলেদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি। প্রেসিডেন্সিতে মেধাবী ছেলেদের পাশে। অজান্তেই চিন্তাধারার রূপান্তর। অন্য স্বপ্ন।

বাবা বলেছিল "প্রেসিডেন্সি কেন? লেডি ব্রেবোর্ণে পড়"

প্রেসিডেন্সির ছাপ থাকলে অন্য মর্যাদা। প্রেসিডেন্সি – দ্য হেরিটেজ অফ ক্যালকাটা। নাউ ইউনিভার্সিটি।

"না বাপি। আমি প্রেসিডেন্সিতেই পড়তে চাই"

বাবা আপত্তি করেনি। ছোটবেলা থকেই মেয়ে স্বাধীনচেতা। বাধা দিতে গেলে, কিংবা নিজের ওপিনিয়ন ফলালে, হিতে বিপরীত।

মেধাবী অসীমদাকে ভালো লাগত। দূর থেকে দেখত। স্ট্যান্ড করা ছেলেদের প্রতি অজ্ঞাতসারে কেন যে মেয়েদের দৃষ্টি, কোনও কেমিস্ট্রি বইতে লেখা কি না, জানা নেই। ফিসফিস কথা এলে, চোখ পড়ে যায়। সাহস হয়নি গিয়ে আলাপ করার। অসীমদার গম্ভীর উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা কাচের দেওয়াল। সেলফ্রিজের পসরার বাইরে অন্য এক পৃথিবী। তার স্বাদ অনেকে খুঁজে ফেরে সারা জীবন। সেলফ্রিজের দামি খেলনা হারিয়ে গেছে মূল্যহীনতায়। পাওয়া থেকে না-পাওয়ার আলো-আঁধারি কুহকে।

সঙ্গে স্বর্ণালীকে। বুঝে উঠতে পারে না, ওই গম্ভীর মানুষটার হৃদয়ে কীভাবে নাড়া দিল? ঈশ্বরের কেমিস্ট্রি। স্বর্ণালী বিজেতা। অরুন্ধতী পরাস্ত। প্রথম পরাজয়। কোথায় কখন কাকে ঈশ্বর বিজয়মুকুট পরাবে, কে জানে? অভ্যন্তরে অপার্থিব শক্তির বরমাল্য।

জেনেছিল জ্ঞানের যাদু। মহিলাদের সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র হলেও পুরুষদের শিক্ষাই হাতিয়ার। জ্ঞানের মোহে জয়ন্তর গলায় বরমাল্য। সার্থকতার সোপানে উঠতে গিয়ে আরেক পরাজয়। এই পরাজয়ের গ্লানি অবচেতনে ফল্গুধারা। তাকে লঙ্ঘন করতে মরিয়া। চুলোয় যাক জয়ন্ত, শিক্ষা, রুচি, বিবেক, সামাজিক সংস্কার, লক্ষ্মণরেখা। সি মাস্ট গেট ইট। অ্যাট এনি কস্ট। নাও, অর নেভার। তার উদ্ধত যৌবন অবহেলার নয়। সেটাই তার দ্যুতি। রূপান্তরিত করতে নেমেছে 'প্রগতিতে'। আগামীর রসে ভরপুর, জাগতিক নক্ষত্রের মতো, নতুন উদ্ভাসে। সেখানেই সার্থক প্রয়াস।

প্রথম আলাপ স্বর্ণালীর মাধ্যমেই "অসীম, আমার বন্ধু অরুন্ধতী"

"ও আচ্ছা" নির্লিপ্ত জবাব। নিছক ভদ্রতা।

কতজনকে আঁকুপাঁকু করতে দেখেছে। এই প্রথম কেউ পাত্তা দিল না। দুঃখে হলেও প্রকাশের অবকাশ ছিল না।

"শুনেছি স্ট্যান্ড করেছেন?" তাকিয়ে ওর দিকে।

"এক্সামিনার বোধহয় খাতাটা ঠিকভাবে দেখেনি" জবাবটা ভাবমূর্তির সঙ্গে মেলে না।

তখনও জয়ন্ত আসেনি। অসীমই অরুন্ধতীর কাছে টুয়েন্টি-টু ক্যারেট গোল্ড। তখনও মানে-জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-চাতুর্যে সোনার পরিমাপটা ভিন্ন ছিল। স্বপ্নটাও। আদর্শের মধ্যে শ্যাওলা ছিল না। তাই বাবা যখন জয়ন্তর সম্বন্ধ আনল, ও দোটানায়। অভিমানও হয়েছিল।

"ছেলে আইএএস। আজকের ভবিষ্যৎ। টাকাওয়ালা ঘরে বিয়ে দিয়ে কী হবে? বরং যাকে ধরে তুই ভবিষ্যৎ গড়তে পারবি, তাকেই বিয়ে কর"

আর্থিক প্রাচুর্যের কমতি ছিল না। বাবা তার একমাত্র নক্ষত্র অরুন্ধতীকে সঁপে দিয়েছিলেন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে। কুক্ষিগত ব্যবসায়িক দিক দিয়ে দেখেছিল ওর ভবিষ্যৎকে। ব্যবসার স্থিরতা অনিশ্চিত। শিক্ষার স্থিরতা বর্তমান থেকে চিরকালের।

প্রেসিডেন্সির পরিবেশ ওকে নতুন দিক দেখিয়েছিল। ছেলে বিচার সম্পত্তি দেখে নয়, শিক্ষা ও গুণে। সেটাই দিতে পারে নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের আশ্বাস। মন অসীমদার মোহে থাকলেও ওর পেছনে না ছুটে, নতুন পথে হাঁটতে হবে। স্বর্ণালীর হবুর স্বপ্ন নিয়ে সারাজীবন কাটানো যায় না। দোনামনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাপির কথায় সায় "তুমি যা বল তাই সই। তাই করব"

মধ্যবিত্ত জয়ন্ত হঠাৎ প্রাচুর্যে দাঁড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছিল, বিচক্ষণ অরুন্ধতীর বাবার ইঙ্গিত ছাড়াই। যাদের কিছু হয় না, সেসব বিখ্যাত বাবা-মায়েরা, মেয়ে-জামাইকে প্রতিষ্ঠার জন্য উঠেপড়ে লাগে। সুশিক্ষিত আইএএস অফিসারের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শ্বশুরের সাহায্য কেন লাগবে?

বিয়ের রাতে আবেগে অরুন্ধতীকে জড়িয়ে জয়ন্ত বলেছিল "এখানেই স্বর্গ" হারিয়ে গেছিল সপ্তমের নিখাদে।

অরুন্ধতীর শ্যামলা মুখশ্রী লম্বাটে হলেও উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অভিভূত। নবযৌবনা স্ত্রীর কাঙ্ক্ষিত স্তন। সব ছেলেরই স্বপ্ন। যখন স্বপ্ন নাগালে, তখন সব রঙিন। রঙের বাহারে বাইরের চটকই প্রধান। মানুষ গৌণ। পাওয়ার মোহে বোঝা হয়নি মানুষটাকেই।

বিয়ের আগে অরুন্ধতী যেটুকু জয়ন্তর সঙ্গে একাকী কাটানোর সুযোগ পেয়েছিল, ওকে বলেছিল "পছন্দ হয়েছে তো? না, বাবার কথায় রাজি হয়ে যাচ্ছেন?"

"এমা। ছিঃ ছিঃ। আপনাকে পছন্দ হবে না, এ হতে পারে?"

"তা কেন? সবার যে সবাইকে পছন্দ হবে, এ না-ও হতে পারে" শাড়ির আঁচল বাঁ-কাঁধে জড়িয়ে উত্তর।

পছন্দ অরুন্ধতীকে, না তার প্রখর দৃষ্টিকে, না তার পৈতৃক ঐশ্বর্যকে, না দেহের উপচে পড়া সম্ভারকে – সে ভাবার বয়স হয়নি। প্রথম স্ত্রীসান্নিধ্যের মাদকতায় বিচার করার সময় ছিল না। কামনায় সাজছিল মন। জয়ন্ত জানে না। মন বলছিল 'একে আমার চাই'। মনটাও দূরের নক্ষত্র। না-ই বা খবর রাখল। পাওয়া দোরগোড়ায় এলে কেউ ভাবে?

লাজুক, মুখ নিচু, মাথা নেড়ে বলেছিল "সত্যি পছন্দ হয়েছে"

অরুন্ধতী লক্ষ করছিল ওর চোখ মাটি থেকে বুকের ওপর। চোখে চোখ মেলাচ্ছে না। মুচকি হেসে বলেছিল "আগে বোধহয় কোনও মহিলার সঙ্গে কথা বলেননি"

মাথা নিচু, ফিসফিস করে বলেছিল "নাঃ"

প্রশ্ন করার সাহস হয়নি অরুন্ধতী কী ভাবছে? পাছে অন্য কিছু শুনতে হয়। ওর দৃষ্টির অস্পষ্টতা চোখ এড়ায়নি। অস্থিরতা চোখের কোণে। চাওয়ার ভাষা কোন মেয়েরই অজানা নয়। স্কুলে পড়ার সময় থেকে তার বিভিন্ন রূপ দেখেছে। কলেজে মানে বুঝেছে। নিজেকে দামি মনে হত দৃষ্টির চাওয়ার বৈচিত্র্যে। নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ ভিন্নরূপের চাহনিতে।

"চল না ইডেনে"

ত্রিদিবের কথায় মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল "ইডেনে কেন? কলেজ স্ট্রিট কী ক্ষতি করল?"

ত্রিদিব আমতা করে বলেছিলে "বড্ড ভিড়। মনের কথা বলার অবকাশ নেই"

মনের কথা রাস্তায়, চায়ের দোকানেও বলা যায়। চোখের চাহনিতে বোঝানো যায় "ঢপ মারছিস কেন? মনের কথা না দেহের কথা, সত্যি বল-তো?"

ব্যস! ভয়ে এমুখো হওয়ার সাহস হয়নি।

খেলাটা অন্যরকম। এক্কাদোক্কা নয়। কানা মাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ নয়। অরুন্ধতী না হয়ে যে কেউ হতে পারে। নিজেকে অতটা গৌণ ভাবতে পারে না। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ কাজ করে। ক্ষণিকের হলেও। ডিস্ক্রিশন ইজ দ্য বেটার পার্ট অফ ভ্যালার। সেই ডিস্ক্রিটলি পার্সোনাল মেয়ে কেন জয়ন্তকে পছন্দ করবে, প্রশ্ন উঠতেই পারে? সুপুরুষ নয়। সাদামাটা বাঙালি। চোখে পড়ার মতো আহামরি কিছু নয়। বিবাহিত জীবন আর যৌবনের চাহিদা আলাদা। ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস থেকে স্থায়িত্ব বাঞ্ছনীয়। মোহের বশে নয়। স্থায়িত্বের নিশ্চিত কুহকে জয়ন্তর প্রবেশ। মোহময় ক্ষণিকের স্বাদ আগে বহুবার পেয়েছে। আজকের দিনে কী যৌবনের চাওয়াটাকে বাসরঘরে বন্দি করে রাখা যায়? বারবার আত্মপ্রকাশ করে নানা রূপে, রঙে, আকারে। বয়ফ্রেন্ড শব্দটি চিরপরিচিত চাহিদার স্বীকৃত রূপ। নতুন ছাঁচে গড়া সামাজিক বলয়ে সম্পর্কহীন সম্পর্ক। খাওয়া, পরা, আচ্ছাদনের মতো আরেক সত্য। মুখোশ পরাতে পারলেই সমাজ বিবর্তনের নতুন আকার নেবে।

দেবমাল্য একদিন অরুন্ধতীর নাভিতে হাত দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে ঠাট্টা করে বলেছিল "বলতে পারিস এই রাখ-ঢাক গুড়গুড় কেন? সবাই তো জানে। কিন্তু ঘোমটা তুলে খ্যামটা নাচাতেই আমার ভীষণ আপত্তি"

অরুন্ধতী তার নাভির ওপর খেলে যাওয়া হাতে আলতো করে হাতটা বুলিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিল "তবে কি আমাদের এই অন্দরমহলের দৃশ্যটা লাইভ টেলিকাস্ট করতে বলিস? তাহলে তো আর আমাদের এ সমাজে ঘুরে বেড়াতে হবে না"

বাঁ হাতে ধরা সিগারেটের ধোঁয়াটা মুখ থেকে হাওয়ায় ছুড়ে বলেছিল "হলে কী হত বল-তো?"

দেবমাল্য অরুন্ধতীকে জড়িয়ে বলেছিল "কী হবে ওসব ভেবে? যার খুশি মশলা খুঁজতে দে। যেভাবে চলছে চলুক। তুই আমায় বিয়ে করছিস না। আমিও তোকে নয়। ইকুয়েশন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। স্বর্গটা এখানেই। এই মুহূর্ত। বেশিদূর খোঁজার কী দরকার? রেশ টানলেই সর্বনাশ। খাওয়া, পরা, মাথা গোঁজার মতো, সেক্সও প্রয়োজন"

সিগারেটের বাটটা বেডসাইড টেবিলের অ্যাসট্রেতে গুঁজে অরুন্ধতী বিছানায় পা ঝুলিয়ে। অন্তর্বাস সালোয়ার পরতে গিয়ে বলেছিল "স্বপ্নটা তারার দিকে তাকাবার মধ্যে নয়। তারাকে মাটিতে আনার। নিজের করে পাওয়ার"

পুরো পাওয়াটাই পার্থিব গণ্ডিতে বন্দি। না–পাওয়াটা অপার্থিব দুঃস্বপ্ন। বাস্তব আর স্বপ্নের দুনিয়া যেন ভিন্ন মণ্ডলের। চাওয়াই জীবন। স্বপ্নটাকে বাস্তবে আনাতেই সার্থকতা। বাকিটা কল্পনার ধোঁয়াশা। যা দেখা যায় না, তাকে বোঝার প্রয়োজন নেই। কেবল অসন্তোষ বাড়ানো ছাড়া। গাঙচিলের মতো খোলা আকাশে ভেসে বেড়িয়ে রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, ছন্দে আবদ্ধ জীবনকে ভোগ করার মধ্যেই বাঁচার মাধুর্য। বয়ফ্রেন্ডের দায়িত্বহীনতার বাইরে সামাজিক প্রলেপ। যা খুশি কর, সমাজ ফিরেও তাকাবে না।

তাই দেবমাল্যর অসাক্ষরিত বাঁধভাঙা উত্তেজনা থেকে জয়ন্তর সাক্ষরিত স্পর্শ। নান রঙের নক্ষত্রের মধ্যে আরেক নতুন রং। স্পর্শটা যারই হোক না কেন, তা পুরুষের।

স্পর্শটা ভালো লাগছিল। পুরুষের হাতের স্পর্শ, কোন মহিলার ভালো না লাগে? মুখে লাজ, মনে আশ। নেই মামার থেকে কানা মামা অনেক ভালো। সিঁথির সিঁদুর লক্ষ্মণরেখার মতো। তার মধ্যে আপাত পরাধীনতা হলেও, অনেক বেশি স্বাধীনতা। সামাজিক দৃষ্টির বাইরে, লোকচক্ষুর আড়ালে। সহজে চোখে পড়ে না। শিখণ্ডীর মতো। স্বামী থাকলেই সমাজের নৈতিক দায়িত্বভার লুপ্ত। দৃষ্টিটা অন্য দিকে ঘোরানো যায়। মনের আশের কী শেষ আছে? মধ্যরাতের অন্ধকারে যাই হোক। সামিজিক স্বীকৃতিতে বাইরের চোখে পর্দা।

জয়ন্তকে সঁপে বলল "যদি তোমার স্বর্গ আমাকে পেলে হয়, আমার স্বর্গ কী তুমি দিতে পারবে না?"

জয়ন্ত আরও নিবিড় হয়ে বলেছিল "তোমাকে তারার জগতে পৌঁছে দেব। তারা হয়ে জন্মেছে। তারা হয়ে বাঁচবে"

নিজেই জানত না, তারার ঠিকানা। তবুও বউ-এর মন ভোলাতে অনেক কথাই বলতে হয়। কাছে পেতে অনেক কিছুই করতে হয়।

“সত্যি দেবে?”

“দেব... দেব... দেব। তিন সত্যি”

কত প্রতিজ্ঞা যে বদ্ধ কক্ষে হারিয়ে যায়, তার হিসেব কী কেউ রাখে? মুহূর্তের পাওয়ার নেশায়, অলক্ষ্যে ব্যবসায়িক অঙ্ক প্রতিক্ষণ জাগতিক নিয়মে। সেটাই সাংসারিক মাপকাঠি। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার অবারিত ব্যাপ্তি। যে নক্ষত্রই হোক। পাওয়ার আশায় সেটাই ধ্রুবতারা। উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলে ওঠার জীবন্ত নিয়ম।

সোহমের সঙ্গে সেই নিয়মের খেলা খেলতেই অরুন্ধতী।

“পেয়েছি” সোহম দু-আঙুলের হলুদ লেবুটাকে নেড়ে বলল “ছুরিও”

লেবুটা চিপে ভডকায় মিশিয়ে, অরুন্ধতী বলল “স্ট্রিঞ্জেন্ট টেস্টই আমার বেশি ভালো লাগে”

ভডকার টেস্টে আগ্রহ না থাকলেও, ওর অন্যান্য সব কিছুর প্রতি আগ্রহ চোখের দিকে তাকালেই স্পষ্ট। পাশের সোফায় বসে হুইস্কির গ্লাসে বরফ ঢেলে বলল “এবার স্টেটসে বং-সং স্পন্সর করছি। ফেরার সময় সবার আনইন্টারাপ্টেড ক্লিয়ারেন্স চাই”

অরুন্ধতী এমন মওকার অপেক্ষায় ছিল। এই মুহূর্তে সেটা ছাড়াও যে বাড়তি কিছু প্রত্যাশা করছে, না বোঝার কারণ নেই। দৃষ্টিটা ছোটবেলা থেকে বড়ই চেনা। শুধু চাহনির ধরণটা ভিন্ন। দেহের সঙ্গে ব্যবসায়িক অঙ্কও। রথ দেখা থেকে কলা বেচা। মন্দ কী! এক ঢিলে দু পাখি।

“সেখানে ফ্যাশন আনলিমিটেডকে হাইলাইট করতে হবে”

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক। হাতটা অরুন্ধতীর পেছনের সোফার ব্যাক-রেস্টে। সোহমের হাতের দিকে তির্যক দেখে বলল “তাহলে, হবে তো?”

করতে তো হবেই। এখন দর কষাকষির সময় নয় “নিশ্চয়ই”

এখন প্রশ্ন নয়।

এখন জীবন চাই।

অরুন্ধতীকে চাই।

পাঁচ

বসন্তটা যেন আসব করেও শীতের আঙিনায় স্তব্ধ। শীতের মিঠে আমেজের রেশ তখনও হারিয়ে যায়নি ফাগুয়ার নেশায়। রং আছে সন্ধের রঙিন মাদকতার তৃষায়। কিছু পাওয়ার আশায়।

সন্ধেবেলার পার্টির রঙের আলো ঝলমল বাহার হারিয়ে গেছে সুরহীন মূর্ছনায়। সীমার গণ্ডিতে এক্কাদোক্কা খেলায় রেখাটা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। শেষে চলনরহিত দুই পায়ের বৃত্তে আটকাবে। তারপর সরল বলিরেখা শূন্যে দুটি মেরুর মধ্যে অবস্থান করবে অজানার খোঁজে। তাই মানুষের ধর্ম। খোঁজাটা ভিন্ন। ভিন্ন রূপে, ভিন্ন রসে, ভিন্ন ছন্দে।

অসীম চক্রব্যূহের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে ঠেকেছে। পায়ের মধ্যের অংশ শূন্যে ভাসমান। মনের দোটানা সঙ্গম ঘটাতে চাইছে বর্ণাঢ্য ও বর্ণহীন দ্বৈত চিত্রমালার অকল্পিত সংযোগে। সীমা-অসীমের মধ্যবর্তী ক্ষীণ সন্ধিতে।

"আরেকটু থাকবেন স্যার"

"কেন? সব তো হয়ে গেল। তোমরা ফুর্তি কর। আমি যাই"

কথা না বাড়িয়ে আইটিসি সোনারের ব্যাঙ্কয়েট থকে বেরিয়ে লিফটের দিকে পা বাড়াল। মল্লিকা, দেবলীনা এগোতে এসে বলল "আরেকটু থেকে গেলে ভালো লাগত"

কথা না বাড়িয়ে টাই-এর নট আলগা করে বলল "এনজয়। আই হ্যাভ টু গো" বলতে পারল না, এ লং লং ওয়ে, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নাইটস দ্যট আর স্টিল গে, টু দ্য কোয়ায়েট সলিচুড অফ দ্য আনফ্যাদমড রিদম, হোয়ার দ্য হার্ট বিটস ইটস টিউন ইন সাইলেন্স, নিউ কোয়েশ্চেনস ফ্যাদম দ্য নোন স্ট্র্যাটা অফ এক্সিস্টেন্স।

মার্সিডিজ বেঞ্জের দরজা বন্ধ করে মেয়ে দুটোকে বলল "গুড নাইট"

বাইপাসের অন্ধকারে ফিকে হওয়া গাড়ির পেছনের আলোটা জানান দিল, রোশনাইয়ের দুনিয়াকে ফেলে অসীম ছুটছে সামনে। গাড়ি চলেছে আলো-অন্ধকারে রং-বেরঙের খেলায়, কলকাতার আকাশে সন্ধ্যাতারার মেলায়। পুব থেকে পশ্চিমে, সোনার থেকে আলিপুরে। পদে পদে ট্র্যাফিক জ্যাম নতুন ছাঁচে সাজা মহানগরীকে স্তব্ধ করতে চাইছে ছন্দহীনতায়। উত্তরণের পথে বিরাম। বাস্তব থেকে জীবনে। হেলিপ্যাড থাকলে ভার লাঘব হত। যা মুকেশ আম্বানি পারে, অসীম পারে না। চায়ও না মুকেশ আম্বানি হতে। হওয়া সম্ভব নয়। এক জেনারেশনে এর বেশি হওয়া মানে, বেপথে হাঁটা। সে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি।

দু-মুঠো অন্নের তাগিদে বড় হওয়া। সীমার সীমিত পৃথিবীতে আজও কেন খুঁজছে, নিজেই জান না। সীমার বন্ধনের বাইরে, স্বপ্নচ্যুত বাস্তবের অন্য অস্তিত্বের ব্যঞ্জনাকে। অসীমের ধোঁয়াশা ছন্দে নয়। অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে।

বাঘাযতীনের টিমটিমে আলো থেকে আইটিসি সোনারের দূরত্ব বেশি না হলেও, অতিক্রম করতে বহুবছর কেটে গেছে। অনেক ঝঞ্ঝা, অনেক চোরাবালি টপকে মোহনায়। বিপুল মহাসাগরে ভাসার তীব্র বাসনায়। কেন যে তাড়া করে বেড়ায়, আজও জানে না। মায়ের মুখটা আবছায়া অতীত। বাবার মুখাগ্নির দৃশ্যটাও ফেলে আসা গীত। রাজানগরের ভিটেমাটির কিছু অস্পষ্ট টুকরো ছবি এখনও রোমাঞ্চকর। মায়ের হাতের নলেন গুড়ের পায়েস। বাবার লুঙ্গিপরা খালি গায়ে দাওয়ায় বসে হুঁকো টানা। কত স্মৃতি! এখনও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি। ক্ষণিকের হলেও অনুভবে মধুর ছিল সে জীবন। ঝড়ো হাওয়া সব ওলট পালট করে, ছুড়ে দিল বলয়ের বাইরে। এত সাকসেসের পরে মনে হয় আজও শূন্যে। একা একা চলা। নিজেকে চিনে পায়ে পা মিলিয়ে এক্কাদোক্কা খেলা।

বনগাঁ থেকে কী করে বাঘাযতীনের মামাবাড়ির ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিল মনে নেই। তবে রবিনকাকুকে ভুলতে পারে না। সে যদি মামার হাতে তুলে না দিত, কী যে হত? জানে না। গৃহিণী মামি বিনাপয়সার ভৃত্যকে অভাবের সংসারে ঠাই দিয়েছিলেন, গতর না খাটিয়ে সংসার টানার স্বপ্নে। প্রলয়ের মধ্যে ক্ষীণ নোঙর।

"স্কুল থেকে আইসসা বাসনগুলি মাইজ্জা দিবি"

স্কুলে যাওয়ার আগেই দিনের ফাই ফরমাস। ফিরে খিদেতে পেট জ্বলছে। সাহস করে বলতে পারেনি "মামি, একটু মুড়ি দিবা?"

বাসন মাজা, বাজার করা, মামার হুঁকোর তামাক কিনে হ্যারিকেনের আলোটা জ্বালাতেই মামি ঝাঁঝিয়ে উঠত "ক্যারসিনের পয়সা লাগে না? তর মামার কী টাকার গাস আসে?"

ঘর থেকে রাস্তা। কর্পোরেশন অতটা অকরুণ হয়নি। মাঠের ধারে পুকুরপাড়ের টিমটিম ল্যাম্পপোস্টের আলো তখনও নেভেনি। সেই মৃদু আলোয় কালকের পড়া মুখস্থ। পেটে খিদের জ্বালা। বুকে স্বপ্ন। বাঘাযতীন থেকে গড়ের মাঠের টাটা সেন্টার না-দেখা গেলেও, তার শক্ত দেওয়াল তার ভাঙা বুকে মসনদ গড়তে চাইছে। ভাঙার মধ্যে গড়ার আশা। বাস্তব থেকে নতুন স্বপ্নের প্রয়াস। না-পাওয়া থেকেই পাওয়ার হাতছানি। একটা স্বপ্ন! স্বপ্নের রং যে ধ্রুবতারার রঙিন একনিষ্ঠতায় এত তাড়াতাড়ি পালটায়, সেদিন জানত না।

আজ বোঝে। তাই খোঁজে।

ইস্টার্ন বাইপাসের বাঁ দিকের মাঠে তাকিয়ে অসীমের মনে হল, এখানে এমার গ্রুপ বা ডিএলএফ আরেকটা মসনদ গড়লে কী হরিপুরি বা হবে? চ্যাটার্জি গ্রুপের আরেকটা স্তম্ভ? এরকম তো কত মসনদ গড়ছে, ভাঙছে, আবার গড়েছে, যুগ-যুগান্ত ধরে। তাতে কী পৃথিবীর রং পালটেছে? আত্মতুষ্টি ছাড়া! মসনদ না থাকলেও তা কল্পনা করা যায়। আর তাই বাস্তবে রূপ দেওয়াও কঠিন নয়। ইট-সুরকির এই মায়াজালে সবাই বাঁধা। সেই জাল ছেড়ে বেরোনোই স্বপ্ন?

মোবাইলটা বেজে উঠল "ওখানেই খাবে? না বাড়িতে?"

"বাড়ি আসছি। রাস্তায়"

পাশের ধুধু অন্ধকারে তাকিয়ে মনে পড়ল সোনার বাংলার ঢালাও ব্যাঙ্কয়েট ফেলে বাড়ির ভাতে-ভাত কত মধুর। কদ্দিন দু-মুঠো মুড়ির জন্য কাঙালের মতো বসে থেকেছে। যদি কেউ দেয়। ভিক্ষা নয়, খুধা নিবারণের প্রতীক্ষা। মুখ ফুটে চাইতে পারেনি। দূর থেকে মৃত্তিকার চোখ এড়ায়নি। অনুকম্পা, করুণা নয় - অনুভব। পিঠোপিঠি বয়স। মায়ের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে মাঝেমধ্যে পরোটা আলুর দম এনে দিত। তৃপ্তিটা আজও স্মৃতিতে। আনন্দের ভোগটা আজও মুখে। সোনার বাংলার বাহারি খাবার আকৃষ্ট করে না। সহায় সম্বলহীন অসীমের জীবনে মৃত্তিকাই প্রথম মাতৃরূপ। চেষ্টা করেও আর প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

আজও বেলগাছিয়ার মিল্ক কলোনির সরকারি আবাসনে অনাড়ম্বর অবিবাহিত জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। কেন যে বিয়ে করল না, জানে না। কেন যে তার সাহায্য নিতে অনীহা, বোধগম্যের বাইরে। সেখানেই প্রশ্ন। তাহলে কী হিসেবের বাইরে আরও কিছু আছে? যা অজানা। মৃত্তিকার জানা। কোনওদিন প্রকাশ করেনি।

"আইতাসি। রান্না কইরা রাখিস"

আজও অসীম ওখানে যায়। মার্সিডিজ বেঞ্জে নয়। মারুতি অলটো নিয়ে। পড়ন্ত বিকেলে নীল চলতে-ওঠা দরজার পাশে সাদা কলিং বেল টেপে। আটপৌরে ক্লান্ত মৃত্তিকার রবিবার দুপুরের ঘুম ভাঙিয়ে "আলু পরোটা খাইতে আইলাম"

মৃত্তিকা ঘুম ভাঙা চোখে বলে "তর ছোটবেলার সাধ এখনও মেটেনি দেখসি?"

"পোলাও কাবাব বিরিয়ানির মধ্যে স্বাদ নাই রে। স্বাদ পইড়া আসে তোর বাঘাযতীনের আলু পরোটার মধ্যে" বেতের মোড়ায় বসে অসীম চেয়ে থাকে কাঠের কপাট-খোলা জানলার বাইরে। যেখানে বাচ্চারা ফুটবল খেলে, ঠিক ছোটবেলার বাঘাযতীন কলোনির মতো। যেমন অন্য বাচ্চাদের দেখে একদিন খেলার স্বপ্ন

দেখত। আজও হয়ত এরকম জানলার কপাট খুলে চেয়ে থাকে কোনও যুবতী। বিশেষ ছেলের বুকভরা কান্না আর চোখ ঠিকরানো দ্যুতির দিকে। চাহিদা নিয়ে নয়। মনেকে ছুঁয়ে যেতে। যেমন ছোটবেলায় মৃত্তিকা চেয়ে থাকত পুকুরপাড়ে অসীমের দিকে। মনটা উদাস হয়ে যেত। আহা রে! বেচারাকে কী কেউ কিছু খেতে দিয়েছে?

একদিন সাহস সঞ্চয় করে কাগজে মোড়া ঠোঙাটা পুকুরপাড়ে বসা অসীমকে দিয়ে বলত "নে"

"ওইটা কী?"

"অত প্রশ্ন কইর‍্যা কী হইব? সারাদিন তো কিসসু খাওয়া হয় নাই"

সেই প্রথম অসীম দেখেছিল ওকে। গোলাপি-সবুজ ডোরাকাটা ফ্রক। শ্যামলা মুখশ্রী। হারানো মাকে দেখছে অন্য রূপে। বুকভরা স্নেহময়ী।

প্যাকেটে আলু পরোটা দেখে বলল "হঠাৎ দয়া। আমারে তো কেউ দয়া করে না"

পুকুরপাড়ে অর্থহীন জীবনের আঙিনায় বসে মৃত্তিকা বলেছিল "দয়া মায়া ভক্তি। সর্বশক্তি"

সেদিন বোঝেনি। খুধার্ত, চেয়ে থাকে পরোটার দিকে। যার কপালে মুড়ি জোটে না, পরোটা স্বপ্নেরও অতীত। তবু স্বপ্ন যখন সামনে, ফেলেতে চায়নি। পরোটা গৌণ মমতার স্পর্শে। খেতে খেতে বলেছিল "তোর নাম কী?"

"মৃত্তিকা"

মেয়েটি অসীমের পাশে বসল "তোর?"

"অসীম"

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" আগামী স্বপ্ন যে এখানেও দোটানায় ফেলবে, বোঝেনি।

"বুঝলাম না"

"রবীন্দ্রনাথ না বুঝলে, বুঝবি কী করে?"

সারাদিনের ক্লান্তির পর রবীন্দ্রনাথের নাম শোনা থাকলেও, মর্ম বোঝার ক্ষমতা ছিল না। কালকের পড়া বাকি। অনেক মনীষী পারে। অসীম মনীষী নয়। আজ বহুকাল পরে সেও তাই নিয়ে ভাবছে। তাই অন্ধকারে ঝিঁঝিপোকার ঐকতান শোনার প্রচেষ্টা।

গাড়ি ড্রাইভ-ইনে ঢুকতেই, অতীত মিশে গেল বর্তমানের প্রাসাদে।

"রুটি না ভাত?"

স্যুটটা ওয়ারড্রবে ঝুলিয়ে স্বর্ণালীর দিকে ফিরে বলল "রুটি"

রুটি মাংস এগিয়ে স্বর্ণালী বলল "তোমার আজকাল বিরিয়ানি পোলাও পেটে সয় না"

পেটে মনে অনেক কিছুই সয় না। তবুও করে যেতে হয়। সংসার রথের ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখতে। মাঝেমধ্যে জল খেতে দিলে, ঘোড়াটা আরেকটু বেশি ছোটে।

রুটিটা ছিঁড়ে বলল "আজকাল ফাইভ-স্টার হোটেলের খাওয়াতে স্বাদ পাই না"

"কোনও কিছুতেই স্বাদ পাও না। আমার সব রান্নাই ভালো বলে উড়িয়ে দাও"

"ভালো হলে খারাপ বলব কেন?"

"সব সময়ই ভালো হয়? মন জোগানো কথা। আমি বুঝি না?"

কথাটা প্রাসঙ্গিক ভাবে বলল, না হাওয়ায় ছুড়ে দিল, বোঝা গেল না। আক্ষেপটা ফুটে উঠল। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খাওয়ায় মন সংযোগ করল।

মৃত্তিকার মিল্ক কলোনির পৃথিবীটা যেমন এক জগতের আভাস দেয়, স্বর্ণালীর আকাশে ছোড়া প্রশ্নও অন্য চেনা পৃথিবীর আবর্তে। চিনেও অচেনার সন্ধানে। এই আবর্তের বৈচিত্রহীনতার বেষ্টনীতে মন ডানা-কাটা পাখির মতো ঝাপটাতে থাকে। খোঁজে নাম-না-জানা রাগ। প্রাণ খোঁজে মৃত্তিকার স্পর্শ। হিসেবের বাইরে।

একটা সমীকরণ চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে। দেখা পৃথিবী থেকে না-দেখার ধোঁয়াশায়। রাগটা চেনা হয়েও অচেনা।

সেই অচেনার সুর কোথাও লুকিয়ে আছে।

অন্য কোথাও...

অন্য কোনওখানে।

ছয়

তুলি, পরিচারকদের তদারকি, সিরিয়াল, স্বামী-কন্যা নিয়ে মাঝে মধ্যে রেস্টুরেন্টে খাওয়া – ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট বাঙালি গৃহবধূর স্বাভাবিক পরিণতি। সুস্থ জীবনের সদ্গতি। কেন যে বাবা-মায়েরা মেয়েদের লেখাপড়ায় পারদর্শী করার জন্য তৎপর, কে জানে? মানুষ হওয়ার জন্য, না শ্রেষ্ঠা বিবাহযোগ্যা হতে? সত্যের অবান্তর কারণ খোঁজা বৃথা। মধ্যবিত্ত চাকুরে বাবাদের মেয়ের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণ কেউ খোঁজে না। সংসারের এটাই নিয়ম।

এতেই বাঙালির শান্তি। এতেই মুক্তি। এতেই তৃপ্তি।

"মা... মি, আমার পেনসিলের বাক্সটা কথায়?"

"টেবিলে ছিল"

"পাচ্ছি না। দেখ না কোথায়"

সত্যি তো। বাক্সটা টেবিলে নেই। নিশ্চয়ই ওটা অন্য কোথাও নিয়ে খেলেছে। তারপর ভুলে গেছে। যা ভোলা মন তুলির।

"এই তো খাটের তলায়" বাক্সটা তুলির হাতে দিয়ে বলল "বড় হচ্ছ। নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখতে শেখ"

মায়ের এই অতিরিক্ত গোছানো স্বভাব সব ওলটপালট করে দেয়। সব ঠিকঠাক রাখাই জীবনের উদ্দেশ্য। অগোছালো হলে ক্ষতি কী?

"কী হবে গুছিয়ে? আবার যখন ওলটপালট হয়ে যাবে"

মেয়েটা আজকাল কথার পিঠে কথা শিখেছে। স্বর্ণালীর মনে হল, চাওয়ার আগেই অনেক কিছু পেয়ে গেছে। বুঝতেও পারল না জীবনের কত গূঢ় তত্ত্ব অজান্তেই বলেছে।

শশিভূষণ দে স্ট্রিটের পুরনো আমলের ভাড়া বাড়িতেও স্বর্ণালী সবকিছু গুছিয়ে রাখত। হারিয়ে গেলে দ্বিতীয়টা না-ও পেতে পারে। তাই, যা পেয়েছে, আগলে রাখার চেষ্টা। প্রথা ছেড়ে বেরোবার ভয়। মধ্যবিত্ত মানসিকতার একমাত্র আশ্রয়।

কড়া স্বরে বলল "হারালে সেকেন্ডটা কিনে দেব না। একথা মনে রেখো"

"বাপি দেবে" তুলির পালটা জবাব।

বাবার আদরে মেয়েটা বাঁদর হচ্ছে। অসীম যেটুকু সময় বাড়িতে, মেয়েকে প্রশ্রয় দেয় বৈকি। একমাত্র মেয়ে, বাবা আদর দেবে না, তো কে দেবে?

"বাপি দেবে না। আমি বলে দেব। দিলেই তুমি আবার হারাবে"

তুলি চুপ। বেশি বলতে গেলে মা খেঁকিয়ে উঠবে।

পাওয়ার মধ্যেই হারানোর প্রশ্ন। নইলে নয়। এই পাওয়া- হারানোর মধ্যেই জীবনটা কীভাবে যেন কেটে যায়। ব্যালেন্স শিট মেলে না। শুধু আশা নিয়ে বাঁচা। স্বর্ণালী কী কখনও আশা করেছিল আলিপুরের মসনদে পৌঁছবে? করেনি বলেই পৌঁছেছে। কুহকিনীর পেছনে ছোটা।

বর্ণালী, স্বর্ণালীর রংপেন্সিল খেলা দেখে বলেছিল "দেখিস তুই একদিন রঙের বাহারে ময়ূরের মতো নাচবি"

দিদির আশীর্বাদ পাখনা মেলে নাচিয়েছে ওর ভাগ্যকে। যাদবপুরের ফ্ল্যাট থেকে আলিপুরের মসনদ। যখন অসীমের ছোট ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবসা চ্যাটার্জি গ্রুপে। স্বর্ণালীর ময়ূরের মতো পেখম মেলা

জীবনের আলো ধূসর বর্ণালীর বর্ণহীন আভরণে। এখন একটাই স্বপ্ন। সম্বিতের হাত ধরে নিজের টলমল জীবনের সম্বিত খুঁজে নেওয়া। কী সুন্দর দেখতেই না ছিল বর্ণালী। মানস কামনার দেবী প্রতিমা। নিটোল ফর্সা মুখ। কোমর পর্যন্ত এলানো চুল। যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। বীণা বাজাত কত পুরুষের হৃদয়ে। শশিভূষণ দে স্ট্রিটের গলি দিয়ে ঢাকাই শাড়ি পড়ে যখন হেঁটে যেত, সবাই তাকাত। স্বর্ণালীর থেকে ভালো কেউ জানত না। জানত না বর্ণালীও। আগ্রহ ছিল না। ঈশ্বরের দানকে আশীর্বাদ রূপেই গ্রহণ করেছিল। যা নিজের নয়, তা নিয়ে বড়াইয়ের কারণ নেই। বছর পাঁচেকের তফাত। মায়ের মতো আগলে রাখত বোনকে।

"তুই এই শাড়িটা পর" ভালো শাড়ি পেলে, স্বর্ণালীকে এগিয়ে দিত।

"শাড়িটা তোকে দিয়েছে"

"আমার শাড়ির শখ নেই। তুই পরলে কত ভালো মানাবে"

স্বর্ণালীকে সাজাতেই ওর আনন্দ। দেওয়াতেই পরিতৃপ্তি। আজ মনে হয়, কিছু মানুষ শুধু দিতেই আসে, নিতে নয়। যারা পাওয়ার আশা নিয়ে আসে তারা কি পায় জানে না। যারা দেওয়ার স্বপ্নে ভাসে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে পাগল। পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বপ্নরাজ্যে তাদের বিচরণ। স্বর্ণালী পাগল কিংবা কক্ষপথের বাইরের জীব নয়। সে আজ চ্যাটার্জি গ্রুপের মালকিন। কখনও ভাবেনি অসীম মালিক কি না। অলিখিত সাম্রাজ্যটা অসীম তাকে নিঃশব্দে দান করেছে, নিঃস্বার্থে।

একদিন সাহস করে বলেছিল "আবার বিয়ে কর। দেখিস সম্বিত মেনে নেবে"

সম্বিতের মানা না-মানার থেকেও বর্ণালীর বর্ণহীন জীবনে আবার দিয়া জ্বালাতে মন সায় দেয়নি। অন্ধকারেই শান্তি। অন্ধকারেই তৃপ্তি। আলোর রোশনাই মায়া। সেই মায়ার জালে জড়াতে চায়নি অন্য কাউকে। নিজের দুর্ভাগ্যকে ভাসাতে চায়নি কারও সুখের অভিসারে।

"না রে। আর নয়"

"কেন?"

"বাবা তো সাধ করেই বিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা যখন টিকল না... কপালটাই খারাপ। এই পোড়া কপালের সঙ্গে আর কারোকে জড়াতে চাই না"

"জীবনে দুর্ঘটনা আসতেই পারে। তা বলে থেমে গেলে চলে?"

"না রে। আর ইচ্ছে করে না"

বিয়েতে অরুচি, না পুরুষ সংসর্গে অনীহা, না তার আর সম্বিতের মাঝে অন্য কারোকে আনার সংশয়, স্বর্ণালী বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয়, বর্ণালী ভুল করছে। নিজেকে ছন্নছাড়া করে দিচ্ছে। জীবনটা ভোগের, ত্যাগের নয়।

বর্ণালী বরাবরই ঘরকুনো। নিয়ম মেনেই বিয়ে করেছিল, যেদিন বাবা পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে মনের মতো পাত্র খুঁজে এনেছিল।

"বিজিতকে তোর পছন্দ হয়েছে?"

"হ্যাঁ বাবা" আলতো উত্তর। বাবা যখন পছন্দ করেছে, তার আর কী বলার?

"তাহলে লাগিয়ে দিই। বাড়ির প্রথম মেয়ে" বাবা শার্টটা আলনায় ঝুলিয়ে বলেছিল।

মধ্যবিত্ত সাধ-আহ্লাদের মধ্যেই জাঁকজমক করে বিয়েটা হয়েছিল। যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ার পাত্র। কিছুদিনের মধ্যেই উত্তরণের পথে বিদেশে পাড়ি বর্ণালীকে নিয়ে। সেখানেই সম্বিতের জন্ম। অ্যামেরিকান বাই বার্থ।

তখন সম্বিতের কতই বা বয়স? ছয়-সাত বোধহয়। বিজিত বর্ণালীকে বলেছিল "চল নায়াগ্রা ফলসটা ঘুরে আসি"

বর্ণালী উচ্ছ্বসিত। এর আগে নায়াগ্রা ফলস যায়নি। মনে আছে, ৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার। অ্যামেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। তার জীবনের কালো কালিতে লেখা স্বাধীনতার সেই দিনটা। শুধু অ্যামেরিকান স্বাধীনতা দিবস নয়। আজ মনে হয়, তার ইহজীবন থেকে মুক্তিরও দিন। তাকে আর বন্ধনের নাগপাশে বাঁধতে চায়নি।

বিজিতকে বলেছিল "শুক্রবারটা তাহলে ছুটি নিয়ে নাও" পুরো উইকেন্ডটাই ওরা নায়াগ্রা ফলসে কাটাতে পারবে।

"কোথা দিয়ে যাবে? শিকাগো না টরেন্টো থেকে?" বর্ণালীর প্রশ্নে সম্বিতকে কোলে নিয়ে বিজিত "শিকাগো থেকে। কানাডায় এখন প্রচণ্ড ঠান্ডা"

সম্বিত বলেছিল "হাউ লাভলি। আই অ্যাম এক্সাইটেড অ্যাট দ্য থট"

সম্বিত কেন? ওরা তিনজনেই এক্সাইটেড। নায়াগ্রা ফলসের কথা এত শুনেছে। ওটা না দেখলে অ্যামেরিকা দেখা অসম্পূর্ণ। বৃহস্পতিবার সকালে সবার আগে সাওয়ারে ঢুকে পড়ল বর্ণালী। যাওয়ার আগে অনেক কাজ বাকি। বিজিত স্বাভাবিকভাবে সেগুলো ভুলে যায়। সম্বিত স্বপ্নের আনন্দে ভাসছে।

"ক্যামেরাটা নিয়েছ?" বিজিত বাইরের ঘর থেকে হাঁকল "আমার হ্যান্ডব্যাগে ওটা নিয়ে নাও"

"উফঃ! অত চিৎকার করার কিছু নেই। যাওয়ার আগে সবকিছু ঠিক করে নেব। লেট মি হ্যাভ মাই বাথ ফার্স্ট" বর্ণালী বিজিতের ফোপরদালালিতে বিরক্ত।

"মম... ক্যান আই ক্যারি মাই বাইক প্লিজ?"

বর্ণালী উত্তর দিল না। ততক্ষণে সাওয়ারে।

দুঘণ্টার ফ্লাইট ওদের শিকাগো থেকে বাফেলো পৌঁছে দিল।

বিজিত বর্ণালীকে বলল "উই হ্যাভ লস্ট টু আওয়ার্স"

নিউ ইয়র্ক শিকাগো থেকে একঘণ্টা আগে।

বর্ণালীর হাতে চাপ দিয়ে বিজিত বলেছিল "হাউ অ্যাম আই গোয়িং টু টেক কেয়ার অফ দ্য জেট ল্যাগ?"

যখন শিকাগোতে পৌঁছল, তখন দুপুর আড়াইটে। বিজিত হার্টজ কার রেন্টাল থেকে গাড়ির চাবিটা নিতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে বর্ণালী বলল "হোয়াই ডোন্ট ইউ গেট এ কার উইথ জিপিএস?"

"দে ডোন্ট হ্যাভ ইট রাইট নাও। বাচ্চার মতো করো না। হোটেলটা এখান থেকে বেশি দূর নয়"

সম্বিত গাড়ির পেছনের সিটে বসে বলল "ড্যাড আই অ্যাম হাংরি। ক্যান আই হ্যাভ সাম নাট-নাগেটস প্লী... জ...?"

"ইয়েস। বাট নো সোডা" বিজিত ড্রাইভিং হুইলে বসে বলল।

"ডু ইউ রিমেম্বার হোয়াট ইউ প্রমিসড?"

"হোয়াট?"

"তোমার মাতৃভাষা কী?"

"বাংলা"

"আমরা ছুটিতে বাংলায় কথা বলি। নয় কী?" বর্ণালী সিটবেল্ট লাগিয়ে বিজিতের পাশের সিটে।

পরের দিন সম্বিত আরও উৎফুল্ল। কাল রাতে ড্যাড কথা দিয়েছে হেলিকপ্টারে চড়াবে নায়াগ্রা ফলসের ওপর। এর আগে কখনও হেলিকপ্টার চড়েনি। মনে মনে একটা রোমাঞ্চ। বর্ণালীর খুব ইচ্ছে ছিল না। অমন উঁচুতে। ভয় ভয় করে। সেকথা সম্বিতকে বোঝানো যাবে না।

সকাল এগারোটা। ওরা তিনজনে হেলিপ্যাডের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আগে ওজন করিয়ে কপ্টারে ঢুকতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে কমলা রঙের পাখিটা আকাশে হারিয়ে গেল। কোথায় হেলিপ্যাডটা ফেলে এসেছে, ঘুরে দেখতেও পেল না। সম্বিত পেছনে মায়ের পাশে বসে। বাঁ হাতটা মুঠো করে ডান হাতটা মায়ের হাতে জড়িয়ে দুরুদুরু বুকে সামনে তাকিয়ে। বিজিত পাইলটের পাশে, হাসছে।

"আমরা স্বর্গের কাছাকাছি!" কপ্টারটা ফলসের ওপর ঘুরপাক খেতেই বিজিতের দীর্ঘশ্বাস। অনেকদিনের স্বপ্ন। আজ কাছ থেকে পাওয়া। ছোটবেলা থেকে কত পড়েছে। সেই স্বপ্নের স্বর্গ আজ চোখের সামনে।

নীল আকাশের বর্ণচ্ছটায় জলপ্রপাতের ঘনঘটা। মুহূর্ত নির্বাক। চোখ জুড়নো বর্ণময় বর্ণালীর দুচোখের হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টির দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে বিজিত "জলের রংটা কী?"

বিজিতের কথা টেনে বর্ণালী বলল "সাদা? না গ্রে? না কি, নীল?"

"নীল" সম্বিত বাবা মায়ের কথায় যোগ দিয়ে সরব "দেখ দেখ আমি বাংলা বলছি"

বিজিত জবাব দিল না। ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে কন্টিনিউয়াস মোডে ধুপ-ধাপ ক্লিক করতে লাগল। যত ছবি তুলে রাখা যায়। ছোটবেলা থেকেই বিজিতের ফটোগ্রাফির নেশা। কলকাতার ভিখারি থেকে বর্ষাস্নাত এসপ্ল্যানেডের মেট্রো চত্বরের ছবি, আজও বাক্সবন্দি কলকাতার বাড়িতে। তখন ডিজিট্যাল ক্যামেরা ছিল না। অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে একটা নিকন এসএলআর কিনেছিল। এই মুহূর্তে সেকথা মনে করতে চায় না। যুগ পালটে গেছে। বর্ণালী তখনও জীবনে আসেনি। এখন আরেক পৃথিবী। তবুও ছেলেবেলার অভ্যাসটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যাপ্তির মধ্যে নতুন সুর খুঁজছিল। আনন্দের সুর। ভালোলাগার সুর। বিদেশে নিজেকে নতুন করে পাওয়ার সুর। কেবলই মনে হচ্ছিল ছবি যথেষ্ট নয়। আরও... আরও কিছু... ভালোলাগার পরিমাপটা সরগম থেকে নিখাদে, পেখম মেলে ভাসতে চাইছে। আরও... আরও... আরও...

বিবরণহীন সৌন্দর্যের নীলিমায় হারিয়ে যেতে বিজিতের হঠাৎ মনে হল 'যদি এই মুহূর্তে আমি কপ্টার থেকে ঝাঁপ দিই, ও কী আমায় চুমু খাবে? যদি দুহাত মেলে ভেসে বেড়াই, তবে কী বাধা বন্ধনহীন পাখিদের মতো শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারব? যদি আর ফেরত না যাই, তবে কী আমায় গ্রহণ করবে?"

"আর ইউ অল রাইট?" পাইলটের কথায় বিজিত স্বপ্ন থেকে বাস্তবের সৌন্দর্যের মখমলে "উই আর নাও গোয়িং ডাউন"

"ওককে ওককে থ্যঙ্কস" বিজিতের স্পষ্ট আওয়াজ।

সম্বিত ভুলতে পারছে না কপ্টার রাইডের কথা। কত প্রশ্ন। বর্ণালীর উত্তর দিতে নাভিশ্বাস। এবার বিশ্রাম দরকার।

"চলো আমরা হোটেলে যাই" বিজিতকে বলেছিল "স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নিই"

"তোমরা জিরিয়ে নাও। আমি আরও কয়েকটা ছবি তুলে আসি। ফেরার পরে আমরা ফায়ারওয়ার্কস দেখতে যাব"

বর্ণালী মাথা নেড়ে গা এলিয়ে দিয়েছিল। চারটে নাগাদ বিজিত বেরিয়ে পড়েছিল। এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। ঘরে শুয়ে সময় নষ্ট করতে মন চাইছে না। ভেতরে চাপা উত্তেজনা।

অরগ্যাজমিক নীল তাকে হাতছানি দিচ্ছে... আবার। বিজিত ফলসের জলের দিকে এগিয়ে চলল। যতটা এগোনো যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ফলসের রেইলস তরুণীর হাইমেনের মতো তাকে থামিয়ে না দেয়।

...মাথাটা ঘুরতে লাগল। পা দুটো কেঁপে উঠল। একটা অস্বস্তিতে যেন মাটিটা হারিয়ে যাচ্ছে ...এটা কী প্রকৃতির আমন্ত্রণ? না কি, হৃদয়ের কম্পন? বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে গেছে প্রশস্ত কপাল। বিজিত ক্যামেরার লেন্স ওয়াইপার দিয়ে কপাল মুছল। সারা জীবনের স্বপ্নের ছবিটা ধরে রাখতে চায়। আঙুলগুলো কেঁপে উঠছে শাটারের মৃদুমন্দ তরঙ্গে। কানে ভেসে আসছে হাজার তবলার বিরামহীন লহরা। হৃদয় কেঁপে উঠছে নিঃশব্দ আলোড়নে।

মুহূর্তের জন্য...

কোথায় মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরেছে। দেহটা রেলিং-এর ওপর শূন্যে ভাসছে... যেন এপার-ওপারের মাঝে দাঁড়িয়ে শুনছে চেনা পৃথিবীর না-চেনা আলো-আঁধারের রাগ। ক্যামেরাটা হাত থেকে কালো নুড়ির মতো ফসকে পড়ল। আর দেখা গেল না... বিজিতের কানে দূর থেকে ভেসে আসছে হাজারও মানুষের কোলাহল।

নীল মিশে গেল ধূসর থেকে অন্ধকারে...

সাত

অরুন্ধতী মধ্যরাতের জ্বলজ্বল করা নক্ষত্রের মতো মহুয়ার নেশা ছেড়ে অবশেষে ঘরে ফিরল। অন্ধকারে, আলোভরা উল্লাস থেকে মধ্যরাতের একাকী ঘরের নির্জনতায়। নিরালা আশ্রয়ে।

কত লোক। কত সেলিব্রিটি। কে নেই সেখানে? মন্ত্রী আমলা, চিত্রতারকা, সঙ্গীত শিল্পী। মিডিয়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের ছড়াছড়ি। সস্ত্রীক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা সৌজন্য বিনিময় সারছে। দেশের কেউকেটারা সান্ধ্য সাজে ভরিয়ে দিয়েছে। ফোয়ারা বইছে হুল্লোড়ের। হায়াতের প্রাঙ্গণ ফ্যাশন আনলিমিটেডের অ্যানুয়াল এক্সট্রাভেগেঞ্জা।

ব্যুটিকের সাদা ডিজাইনার কাফতানে ঝলমল করছে শ্রাভস্কি ক্রিস্টালের কাজ। আলোর রোশনাইয়ের ঝিলিকে ঠিকরে দিচ্ছে তার ঔজ্জ্বল্য। পুরুষের কামনায় এক স্বতন্ত্র নক্ষত্র নিজ মহিমায় বিচরণ করছে।

"ম্যাডাম ইউ লুক লাভলি ইন দিস গরজিয়াস ড্রেস" জড়ানো গলায় কাছে আসতে চাইছিল মিঃ খাস্তগির।

এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও পারেনি অরুন্ধতী। ফ্যাশন আনলিমিটেডের প্রমোশনল ডিস্ট্রিবিউটারকে অ্যাভয়েড করলে কোম্পানির পক্ষে খুব সুখকর হবে না, মিঃ সেনের থেকেও অরুন্ধতী ভালো বোঝে। বস পূর্ণেন্দু সেন তাকে ক্ষমা করবে না। বরং খাস্তগিরকে একটু প্রশ্রয় দিলে আরও ফুলেফেঁপে উঠতে পারে ফ্যাশন আনলিমিটেড।

খাস্তগিরের কাছে ঘেঁসে বলল "বিউটি লায়েস ইন দ্য আইস অফ দ্য বিহোল্ডার। আই মাইট বি অ্যান ওল্ড হ্যাগার্ড স্টিল বিউটিফুল ইন ইওর আইস" ঘুরে বেড়ানো বিউটিদের দিকে ফিরে বলল "এদের সদ্গতি করে দিন। দে অল হ্যাভ চার্ম অফ দেয়ার ওউন। ওনলি ইউ নিড আইস ট্যু সি"

"আমার কী লাভ?"

"লাভ লোকসানের হিসেব পরে। আফটার অল, অল বয়েলস ডাউন ট্যু মানি। ট্রাই ইট। বেট, ইউ ওন্ট বি এ লুজার"

"মানি, কিছু কী কম আছে ম্যাডাম?" কানের কাছে মুখটা এনে বলল "নেই শুধু হানি"

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ছোটবেলা থেকেই শুনেছে। কলেজ জীবনে বুঝেছে। উপভোগ করেছে। বিয়ের পর ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে। জয়ন্তকে নিয়ে নয়। জয়ন্ত আর পাঁচটা সেলেব্রিটির মতো শিখণ্ডী মাত্র। আসল তো অভ্যন্তরের খেলা। তার লীলামহাত্ম্য অরুন্ধতী ভালোই জানে। যা জয়ন্ত পারে না, অরুন্ধতী পারে।

"আমার মতো ফসিলে প্রেমরস পাবেন? বিউটিদের মধু অনেক ভালো নয় কি?"

খাস্তগির এক তরুণীর আধখোলা স্তনের দিকে তাকিয়ে বলল "দে লুক লাইক মাই ডটার্স। আই স্টিল বিলিভ ওল্ড ইজ গোল্ড"

বুঝতে পারছে। খাস্তগির বয়সকে অস্বীকার করতে পারছে না। তবুও আকাঙ্ক্ষাটা তুষের আগুনের মতো ধিকধিক করে জ্বলছে। ফিরতে চাইছে চৌহদ্দির মাঝে। চেনা লক্ষ্মণরেখায়। বয়সের দোরগোড়ায়। বলয়ের বাইরে বেরলেই অকুল সাগর। সেই সাগরে ডুবে যাওয়ার ভয়।

স্ক্যাম!

অরুন্ধতীর হাসি পেল। ঘোমটার তলায় খ্যামটা নাচার মধ্যেও সীমাবদ্ধতা। বুদ্ধি যখন খ্যাতির নেশায় বুঁদ, ভয় তো হবেই। পা ফসকালেই মহাশূন্য। তখন শুধু পলিটিক্যাল আশ্রয়। অস্তিত্বকে আরও সঙ্কটে ফেলা। কোনটা শ্রেয়? প্রেয়টা সবার জানা। শ্রেয়টাকে খুঁজতেই গোলমাল। মৃদু হেসে বলল "আমি কী ওল্ড?"

"ওল্ড হবে কেন? তুমি টুয়েন্টিফোর ক্যারেট গোল্ড" পাছায় হাত বুলিয়ে নিল।

রঙিন জলের মাদকতায় নিতম্বের ছোঁয়া। প্রত্যাশার পারদ হুহু করে বাড়ে। মধ্যরাতে ক্ষান্তমণিও অপরূপা। সুন্দরীর ভূষণ ত্যাগে, উদ্দীপনায় হারিয়ে যায়। তারপর? অঘোর ঘুমে নতুন স্বপ্ন। যা আজ, কাল হয়ে যাবে অতীত। কলিযুগে কালান্তরের খেলা। যদ্দিন না সত্যযুগ মুছে দেবে এই অবক্ষয়ই মাদকতা। অকর্মণ্যতায় নিষ্ক্রিয় পৌরুষ।

এসব কথা অরুন্ধতী রঙিন জলের বালতিতে ফেলে দেয়। ছকের এক্কাদোক্কার অঙ্ক জানা। লক্ষপূরণের একমাত্র নিশানা। সেই জন্যেই অপরূপ বেশ। আসল চাবিকাঠি। না-পাওয়া সন্দেশ।

খাস্তগিরের গায়ে ঢলে বলল “আহঃ কী যে করেন এত লোকের মধ্যে”

স্যুট ঠিক করে বলল “তোমার জন্য ড্রিঙ্ক নিয়ে আসি?”

সম্মতি জানাল অরুন্ধতী। খাস্তগির সরে যেতেই হারিয়ে গেল ফ্যাশন আনলিমিটেডের তরুণীদের মধ্যে। এরাই তো ভোগ্য পৃথিবীর আকর্ষণ। অরুন্ধতী তাদের উচ্চ অভিলাষার বাহ্যিক বিকিরণ। এদের দীপ্তির আলোকে জ্বালাতে হবে অদেখা নক্ষত্রের আলোকিত কিরণ। ফুটবে নতুন দিশা। মাধ্যাকর্ষণের বলয়ে নক্ষত্রকে চিনতে, খেলতে হবে শুশুকের মতো। খেলাটা পেশা না নেশা, সময় হয়নি বিচারের। পেশার নেশায় বুঁদ অসংরক্ষিত জীবনের অনেকটা অংশ অদেখা নক্ষত্রের খোঁজে।

দূরে প্রতীক দাঁড়িয়ে। প্রতীক চৌধুরী। মধ্যচল্লিশ। ভারিক্কি হলেও কাঁচাপাকা চুলের অভ্যন্তরে এক সময় কত মহিলার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে, আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। তরুণীদের ভিড় থেকে সরে, প্রতীকের কাছে গিয়ে বলল “হায় প্রতীক”

“আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং হোয়ার ইউ আর?” অরুন্ধতীর সাজের বাহারে চোখ। হাই-হিল চটি ঠিক করার অছিলায়, হাঁটু গাড়তেই ওর স্তনের মধ্যবর্তী গহ্বরে চেয়ে বুক কেঁপে উঠল।

হাত বাড়াল ওর দিকে “ক্যান আই হেল্প ইউ?”

প্রতীকের হাতে ভর দিয়ে উঠে বলল “থ্যাঙ্কস”

“হোয়ার ইজ ইওর ড্রিঙ্ক?”

প্রতীকের হুইস্কির গ্লাসে তাকাল “সামওয়ান হ্যাজ গন ট্যু গেট ইট”

“এনিওয়ান হ্যান্ডসম?” মুচকি হাসল।

“উইশ ইট ওয়াজ। আনফরচুনেটলি ইট ইজ ওয়ান অফ দোজ গ্র্যান্ড ড্যাডস” দেখে নিল, খাস্তগির কাছেপিঠে কি না। নাঃ, নেই। নেশার ঘোরে ড্রিঙ্ক আনতে ভুলেই গেছে। ভুললেই ভালো। কাবাব মে হাড্ডি।

প্রতীক বলল “লেটস সিট ডাউন। কথা আছে”

অরুন্ধতীর মনে হয় ভারতের এতবড় টাইকুন মিঃ সেনের ক্ষুদ্র পার্টিতে কেন? ওর প্রধান কার্যালয়, বাসস্থান মুম্বাই-দিল্লি। শুনেছে হ্যাম্পস্টেড আর জেনেভাতেও দুটো ফ্ল্যাট। কেয়াতলার পৈতৃক বাড়ি দেখভাল করতে মাঝেমধ্যে আসতে হয়। পরিচয়টা অনেকদিনের হলেও, দেখা হয় না। এরকম পার্টি ছাড়া।

ব্যবসায়ের উৎস বাবা। তখন কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাবার স্ট্রোকের পর, ওর হাতে আসতে পশ্চিম বাংলা অতিক্রম করে সারা ভারতে। দু-দুবার বিয়েও করছিল। দুটোই টেকেনি। এখন বিয়ে নামক মূর্খতায় জড়াতে চায় না। মেয়ে দুটো বড় হয়ে গেছে। একজন স্টেটসে, অন্যজন ব্যাঙ্গালুরুতে। নতুন মা এনে ওদের জীবন বিষাক্ত করতে চায় না। খোরপোষের অঙ্ক বাড়িয়েও লাভ নেই। বিয়ে মানে, কষ্টার্জিত অর্থের অপচয়।

অরুন্ধতী সিগারেট ধরিয়ে সোফার দিকে “লেটস সিট হিয়ার”

প্রাইভেট ব্যাঙ্কয়েট। নইলে রামদাসের ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ত। কর্তৃপক্ষের কাছে আগেই জেনে নিয়েছিল।

“মেয়েরা কেমন আছে?”

“বড়টা সিলিকন ভ্যালিতে। ছোটটা মাস্টার্স শেষ করেছে। বলছে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে জয়েন করবে। হিরোইন হতে চেয়েছিল। বললাম হিরোইনদের মেয়াদ অল্প। নাউ সি হ্যাজ ডিসাইডেড অন ফিল্ম ডিরেকশন”

অরুন্ধতী মাথা নাড়ল "দ্যটস গুড। তুমি তাহলে ঝাড়া হাত-পা"

"সেটাই প্রবলেম। কুডণ্ট কেয়ার অ্যাবাউট মানি। বাট এভ্রি নাইট আই নিড নিউ হানি"

"হু ইজ ইওর পিক টুনাইট?"

"হোয়াই নট ইউ?"

প্রতীকের কম্প্যানি এনজয় করলেও আজকের দিন অভিসারের নয় "আই অ্যাম ফ্যাগড আউট টুডে। ইভেন্টটা একা হাতে অর্গানাইজ করতে হয়েছে। ওন্ট বি ফান টুনাইট" থেমে বলল "সাম আদার ডে"

"অ্যাজ ইউ প্লিজ। সিমস ইওর বার-ম্যান হ্যাজ ভ্যানিসড। লেট মি গেট ইউ এ ড্রিংক। হোয়াট উড ইউ প্রেফার?"

"হ্যং অন" পাশের বেয়ারাকে ইঙ্গিত করল "জিন উইথ টনিক"

প্রতীকের নিবিড় হয়ে বলল "তোমার মোবাইল নম্বরটা পালটায়নি তো?"

"নাঃ। পুরনোটাই আছে"

প্রথম যৌবনে দেহের চাহিদাই মুখ্য ছিল। এখন মিডল এজ ক্রাইসিসের দোরগোড়ায়। তখন কামনা ছাড়িয়ে যেত যুক্তির বন্যা। এখন শুধু বাসনা নয়। অলিখিত আরেক অঙ্ক। আবেগ নেই। কিছু বলতে যাচ্ছিল। থেমে গেল। ফ্যাশন আনলিমিটেডের প্রিয়দর্শিনী সুচরিতা ঝুঁকে বলল "সেন স্যার ডাকছে"

উঠে পড়ল অরুন্ধতী "বসের কল। সি ইউ সামটাইম লেটার"

মিঃ পূর্ণেন্দু সেন কড়া মানুষ। ব্যবসার বাইরে কিছুই চেনে না। ফ্যাশন আনলিমিটেডের মেয়েদের সঙ্গে স্বপ্ন মেশাতে ভায়াগ্রা লাগে কি না, অরুন্ধতী জানে না। প্রফেশনাল চৌহদ্দির মধ্যে সম্পর্কটা সীমাবদ্ধ। তার কাছে বস শুধুই 'সেন স্যার'।

"মিঃ খাস্তগিরকে একটু দেখ"

একটা পঙক্তি। না-বলা কথাকে বোঝায়। বিজনেস ইজ মোর ইম্পরট্যান্ট দ্যান প্লেজার। অতএব খাস্তগিরের হাতের স্পর্শ নিতে হবে। পাছায় হাত বোলানো সহ্য করতে হবে। একটু বেশি ঢলাঢলিও করতে হবে ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে। কদ্দুরে লক্ষ্মণরেখা, জানা নেই। কাজটা উসুল করতে যতটা। এর নাম চাকরি। এর নাম দুনিয়াদারি।

খাস্তগির এক তরুণীর বুকের খাঁজে নিবিষ্ট। মেয়েটা কী বলে চলেছে খেয়াল নেই। বুঝতে পারছে সবই। ইচ্ছেটাও প্রকট। এই প্রৌঢ় ভামগুলোর খিদে মেটে না। মেয়ের বয়সি ছেড়ে নাতনিতেও আপত্তি নেই। দুনিয়াটা এই প্রলোভনে চলছে বলেই কোটি টাকা হাওয়ায়। নইলে এই গ্ল্যামার ব্যবসাগুলোর হাল যে কী হত স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। অ্যাডাম ইভের ভেদাভেদ সৃষ্টিকর্তা রচনা না করলে মনুষ্য জাতিই বিলীন হয়ে যেত। ব্যবসার বুনিয়াদ গৌণ। তাকে এগোতে হলে প্রসার আবশ্যক। তাতে কেউ যদি স্বেচ্ছায় বলি হতে চায়, তার ব্যাপার। সব সন্দেশের ছাঁচই চায় স্টার হতে। ইঁদুর দৌড়ে এগিয়ে থাকতে। হাসল অরুন্ধতী। তাকাক। যদি স্বপ্নের চাবিকাঠি পেয়ে যায়... স্বর্গের দরজাটা কাঁটায় ভরা মাঝরাতেই টের পাবে। কপাল থাকলে গ্যারান্টিড উত্থানের স্পন্সরশিপ পেয়েও যেতে পারে। ফ্যাশন আনলিমিটেডের পক্ষে শুভ। ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলল "মিঃ খাস্তগির, হ্যাভ আই কাম অ্যাট দ্য রং টাইম?"

"না... না... না... একেবারেই নয়"

ম্যাডামকে দেখে তরুণীটি সরে দাঁড়াল। প্রায় নেশাগ্রস্ত খাস্তগিরকে বাগিয়ে এনেছিল। রাতে একটু ঢলাঢলি করলেই কেল্লা ফতে। নেশায় বেশি কিছু করার ক্ষমতা নেই, ভালোভাবেই জানে। স্বপ্নের সেতু পার হতে গেলে নুড়ি ফেলতে ফ্যাশন আনলিমিটেডের যে কোনও মেয়েই প্রস্তুত। এখন হওয়ার নয়। ম্যাডাম মাঝখানে।

আজকালকার উঠতি মেয়েগুলো চিত্রতারকাদের পেছনে সময় নষ্ট করে না। এরাও ফাইনান্সারের হাতে বন্দি। পলিটিক্যাল নেতাদের থেকেও দূরে। খাঁই বড্ড বেশি। ওরাও ফাইনান্সারের টাকায় বলিয়ান।

মিডলম্যান ত্যাগ করে স্ট্রেট ট্যু দ্য কি-পার্সন। "আসি" বলে সরে পড়ল মেয়েটি। খাস্তগির মেয়েটির অর্ধ-উন্মোচিত বুক থেকে ঢুলুঢুলু চোখ ফেরাল অরুন্ধতীর দিকে।

"আপনি যে বললেন ড্রিঙ্ক নিয়ে আসবেন?"

"ইশ!" জিভ কাটল খাস্তগির "দাঁড়াও আনছি"

খাস্তগিরের হাতে চাপ দিল "ডোন্ট ওয়ারি। বলে দিচ্ছি। ওরা নিয়ে আসবে। লেটস রিল্যাক্স অন দ্যাট সোফা। কথা আছে"

জিন উইথ টনিকে চুমুক। খাস্তগিরের কাঁধের ওপর বুক ঠেকিয়ে বলল "আমাদের ফ্যাশন আনলিমিটেডের প্রত্যেকটা মেয়েকে মুম্বাইতে প্লেসমেন্টের সুযোগ করে দেবেন?"

"তুমি বললে না দিয়ে পারি?" চোখে অরুন্ধতীর নেশা।

"টুমরো দেন। উই সাইন দ্য এগ্রিমেন্ট" স্তন ফের কাঁধে।

"হোয়াট?!" বিস্ময়ে ফিরে তাকাল।

খাস্তগির ইতস্তত করছিল। ঘুঘু ব্যবসাদার। পার্সেন্টেজের কথা বলার ইচ্ছে। সেকথা আঁচ করে অরুন্ধতী আগেই বলল "১০% ফর ইওর কম্প্যানি। অ্যান্ড ২% ফর ইউ। উইল দ্যাট বি ফাইন?"

অন্য সময় হলে খাস্তগির দরাদরি করত। এখন করলে স্তনের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবে। হুইস্কির নেশাটা ছ্যাঁক করে মাথায়। ধুস, এখন এসব হিসেব-নিকেশ চলে? রোমান্সে ছাড় দিতেই হয়। নইলে রোম্যান্টিক নক্ষত্রটা জ্বলবে না।

মাথা নাড়ল "ফাইন। অ্যাজ ইউ সে ম্যাডাম" আরেক পেগ গলায়। হতাশ হয়ে বলল "ইউ স্প্যয়েল্ট মাই কম্প্যানি টুনাইট। আই উইল বি অ্যালোন"

"হোয়াই? আই অ্যাম দেয়ার"

"আর ইউ? থট ইউ ডেসার্টেড মি ফর দোজ চিকস"

"হাউ ক্যান আই? সো দ্য ডিল ইজ ফাইনাল। ইউ আরেন্ট অ্যাসিওরিং মি ফলসলি। আর ইউ?"

"নো... নো... নো। নট অ্যাট অল। বললাম তো, পাক্কা। কালকে কন্ট্র্যাক্ট পেপার পাঠিয়ে দিও। আই উইল সাইন ইট। লেটস নট স্প্যয়েল দ্য ফান টুনাইট"

"এই তো প্রথম ড্রিঙ্ক। দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং। ইজন্ট ইট?"

খুব ভালো করেই জানে আরও কয়েক পেগ খাওয়ালে, চলতেও পারবে না। ফান তো দূরের কথা। কিছু করতেই হবে না। দারোয়ানের হাতে বাড়ি পর্যন্ত ছাড়লেই কাজ খতম। তাই হল। খাস্তগিরকে বাড়ির লোকের হাতে ছেড়ে যখন বাড়ি ফিরল, রাত একটা। ক্লান্ত। ডিজাইনার ড্রেসটা ড্রেসিং টেবিলে ছুড়ে সাওয়ারে। জয়ন্ত নেই। বাথ সোপ গায় মেখে স্বপ্নের তারা গোনা।

পূর্ণেন্দু সেন কন্ট্র্যাক্ট পেলে খুশি হবে। সেটা প্রধান চিন্তা নয়। মধ্যরাতে বস্ত্রহীন একাকী নিজেকে খোঁজা। তারাগুলোর মধ্যে ধ্রুবতারাটা অস্পষ্ট হলেও, মিটিমিটি করে জ্বলছে। তার অস্তিত্বকে নতুন রঙে সাজাচ্ছে। ছোটবেলা থেকে এর মোহেই ছুটেছে। কোলাহল হারিয়ে গেছে। বস্ত্রহীন অবয়বটাও বাথ সোপের ফেনায় ঢাকা। ক্লান্তির মধ্যে একটাই দ্বন্দ্ব। লক্ষ্মণরেখা কোথায়, কত দূরে? ধ্রুবতারাই বা কোথায়?

উষ্ণ জলের মিঠে আমেজে, নেশা রঙিন। সাদা পায়রাটাকে খুঁজছে... বুকে অজানা রাগ। চেনা-জানা ছন্দের বাইরে। সামনের না-জানা অসীমেও নয়। কী সেই রাগ?

আট

বর্ণালী সাদার্ন এভিনিউর ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে বলল "দেরি হল যে অসীমদা?"

অসীম স্যুটটা সোফায় বিছিয়ে টাই-এর নট আলগা করে বলল "অ্যাকাউন্টস মেলাচ্ছিলাম"

বর্ণালী হাউজকোট ঠিক করে সোফার পেছনে "আমার তো সে সবের বালাই নেই। কোন অ্যাকাউন্টসই মেলেনি। মিলবেও না"

"মেলাতে চাওনি"

"মেলাতে চাইলেই কী মেলানো যায়? যায় না। তোমার জন্য চা আনি" কিচেনে হারিয়ে গেল।

বিজিত নায়াগ্রা ফলস থেকে ফেরেনি। আলো-আঁধারির হাতছানির ডাকে হারিয়ে গেছে অসীম মহাশূন্যে। শূন্যতা না পূর্ণতার অন্তিম গ্রাসে। মহাকালের পাতায় নগণ্য মানুষের তিরোধান। মহাশূন্য থেকে এই সীমার অ্যাকাউন্টসের যোগসূত্রের বলিরেখা অসীম খুঁজে বেড়াচ্ছে। জড়তা থেকে বেরনোর প্রাবল্য। একঘেয়েমির মধ্যে নতুন দ্যুতি। জীবনের তাৎপর্যটা সেখানেই। চেনা রঙের বাইরে অজানা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অবচেতনের নতুন আলো?

পাশের ঘর থেকে অসীমদার "চিনি আরও কমিয়ে দিয়েছি"

কমানোর মধ্যেই পৃথিবীর মাধুর্য। জড়ানো, আঁকড়ে ধরার মোহ। মায়া। কিংবা তার ছায়া। ছায়াকে কায়ায় পরিণত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কায়া-মায়ার অলিখিত মেলবন্ধন। দুই দুনিয়ার যোগসূত্রের নতুন আভরণ। সেই আভরণ, আলোড়ন তুলেছিল বর্ণালীর হৃদয়ে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত। আলোড়নের সূত্র খুঁজত। বোঝেনি। জানেনি। পায়নি। চাওয়াকে ভাসিয়ে এসেছে অ্যামেরিকার মহাসাগরে।

চা এগিয়ে বলল "তোমার কী ডায়াবেটিস হয়েছে?"

"না তো"

"যেভাবে চিনি কমিয়ে দিচ্ছ, ভয় করে"

"এই ইনকাম ব্র্যাকেটে কেউ না খেয়ে মরে না। খেয়েই মরে"

"জীবন মৃত্যু কী আমাদের হাতে? ভেবে কী হবে?"

বিজিত নায়াগ্রা ফলস থেকে ফেরেনি। কোনদিনও আসবে না। তার স্মৃতি আঁকড়ে আজও বসে। নতুন ঘরসংসার করলে ভুলে যেতে পারত। সে পথে এগোয়নি। বিজিতের স্মৃতিটুকু তার অসীমের অনন্ত। নিজের জীবনটুকু বাস্তবের জীবন্ত। বাস্তবকে অনন্তের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অসীম বর্ণালীকে বলল "আমার জীবনে ধ্রুবতারার রং বারবার পাল্টেছে। ফ্লুইডিটি, দাই নেম ইজ লাইফ। তোমাকে দেখি স্ট্যাটিক"

বর্ণালী চিনিটা নেড়ে বলল "স্ট্যাটিক। কী বলছ অসীমদা? সম্বিত বড় হচ্ছে"

সম্বিত নয়। তুলিও বড় হচ্ছে। স্বর্ণালী তাতেই খুশি। তাতেই আনন্দ। ওটাই ওর পৃথিবী।

কলেজ জীবনে স্বর্ণালীকে ভালোবেসেছিল। সেই সূত্রেই ওদের বাড়ি যাওয়া-আসা। বর্ণালীর সঙ্গে আলাপ।

কিম-ওয়াতে চাউমিন মুখে স্বর্ণালী স্বপ্নবিভোর "আমার কথা মিলিয়ে নিও। তুমি একদিন অনেক বড় হবে"

অসীম বুঝত না, ভবিষ্যদ্বাণী, না স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ। স্বপ্ন দেখার অবকাশ ছিল না, তাকে বাস্তবে আনার অদম্য আকাঙ্ক্ষাটুকু ছাড়া।

আবেগে বলেছিল "তুমি পাশে থাকলে নিশ্চয়ই পারব"

লাল সালওয়ারের বোতাম ঠিক করে বলেছিল "তোমার মধ্যে একটা জেদ আছে। তোমার কী বৃষ রাশি?"

মাথা নেড়েছিল। ভালো লাগত ওর জেদকে। সহায় সম্বলহীন তরুণের মনের জোর ছাড়া আর কী-ই বা থাকতে পারে? মৃত্তিকার অনুকম্পা স্কুলজীবনে খাওয়ার অভাব মেটালেও স্বর্ণালীর উপস্থিতি আকাঙ্ক্ষাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

চাউমিনের শেষ মাংসের টুকরোটা মুখে পুরে বলেছিল "স্বপ্নকে বাস্তবে আনতে অবলম্বন চাই। তুমি পাশে, আমাকে এগোতেই হবে"

সেই মুহূর্তে, ওর ভাবনাই বেশি আকর্ষণীয় ছিল। শালিকে দেখা লুচি আলুর-দমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

"আরও দুটো লুচি দিই?"

প্লেটটা ঠেলে বলেছিল "মাথা খারাপ, পেট ভরে গেছে"

"রসগোল্লাও আছে। খাবে না?"

"নাঃ, আর খেতে পারব না" হাত ধুয়ে মুখ মুছে নিয়েছিল।

"পুটিরামের..." বর্ণালী নাছোড়বান্দা।

"গাঙ্গুরাম হোক আর পুটিরাম। পেটে জায়গা নেই"

খিদের আশা মৃত্তিকাই মিটিয়ে দিয়েছিল। কেন যে মেয়েটা আজও সংসার করল না, বুঝে উঠতে পারে না। বন্ধনহীন থেকেই কি সারাজীবন মুক্তির স্পর্শটুকু নিয়ে যেতে চায়? শ্যামলা, মন্দ ছিল না। ফ্রক থেকে শাড়িতে উঠতে দেখেছে। তখনও চাহিদাটা মনের কোণে কোনওভাবেই বাসা বাঁধেনি! কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ইউপিএসসি দিয়ে চাকরি। বাঘাযতীন থেকে মিল্ক কলোনি, ব্যাস। মাঝে কতগুলো বছর। মাসিমা–মেসমশাইয়ের শেষযাত্রা থেকে সবেতেই অসীম জড়িয়ে। শুধু জড়াতে পারেনি আনন্দযজ্ঞে।

"তুই বিয়া করতাসিস না ক্যান?"

"আমি বিয়া করলে, তর কী লাভ? বিয়া করনের ইচ্ছা নাই"

রক্ষণশীলতায় কী মৃত্তিকার যৌবনের আবেগ বাঁধা? না কি, লুকিয়ে কাউকে ভালোবেসেছিল? না পেয়ে, ওমুখো হয়নি। কয়েকবার মনে হয়েছে, মৃত্তিকা হয়ত তাকেই ভালোবাসত। ছোটবেলার অনুকম্পা বৃহত্তর আকারে গ্রাস করতে পারে, কল্পনারও অতীত। মানুষের মন হিসেবের পরিকাঠামোয় বন্দি থাকতে পারে না। ভেসে বেড়ায়। অথচ স্থান–কাল–পাত্র চেনা অঙ্কে আবদ্ধ রাখতে চায়। পার্থিব বলয়ের মধ্যেও আরেকটা জীবন স্বপ্ন দেখে। পরলোকের মায়া নয়। ইহলোকের ছায়া। কায়ার আড়ালে নিভৃত আলো।

"সবাইরেই করতে হয়"

"ক্যান? পুরুষ সারা মাইয়াদের কী জীবন নাই?"

সম্পূর্ণতা কোথায় যদি সে জানত। অথবা পৃথিবীর কোনও মানুষ। কঠিন প্রশ্ন। মৃত্তিকার যাপনের উত্তর অজানা।

"বেশ। বিয়া নয় না করিস আলু পরেটা তো খাওয়াইতে পারিস"

শাড়ির আচল কাঁধে ফেলে হেঁসেলে। অসীম বেতের মোড়ায় বসে চ্যাটার্জি সাম্রাজ্যের বাইরে আরেক বাস্তবে। সীমার অপেক্ষায়।

হয়ত মৃত্তিকাই ঠিক। জাগতিক বলয়ের বাইরে আরও কিছু আছে। শুধুই মহাশূন্য নয়। মাঝে বেশ কয়েকটা মানসিক স্তর। সেটাই জীবন, আসল পৃথিবী। কী বোকাই না ছিল। এখনও। রাবীন্দ্রিক শর্তে কত সহজেই ইহলোক-পরলোকের মাঝে দাঁড়ি টানতে পারত। সেটাই কী শেষ চেতনা? জাগতিক উত্তরণের স্তর এখনও বোঝা হল না। মানবসত্তা আর মানবচেতনার গূঢ় ব্যবচ্ছেদ করার মনোবৃত্তি ছিল না বলেই 'আসল' সংজ্ঞার অসঙ্গতি লক্ষ করেনি। মৃত্তিকার পথে সেই 'আসল ছায়ালোকে' ওর কায়ার প্রতি কখনও আসক্তি অনুভব করেনি। পেটের সঙ্গে মনের অলিখিত সংযোগ। ছোটবেলার লুচি আলুরদমের আবেগকে কখনও জুড়তে পারেনি। ভাবেওনি। তাই 'তুই' কখনও 'তুমি' তে রূপান্তরিত হয়নি। নিছক বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

"ক্যান এইখানে পইরা আসস? তর একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা কইরা দিতাসি খাড়া"

লুচি-মাংসের প্লেট টেবিলে নামিয়ে মৃত্তিকা বলেছিল "আগে লুচি আলুর দম খাইতাম, এখন মাংস খাই। এছাড়া কি খাওনের আসে কও?"

যার চাওয়া নেই, তাকে কী দেবে? অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে। পৃথিবীতে কিছু লোক দিতেই আসে, নিতে নয়। অফিসে ঢুকলেই সকাল থেকেই চাওয়ার বন্যা। স্বর্ণালীরও কত দাবি। তুলি তো করবেই। জন্মগত অধিকার। কিন্তু এর কোনও দাবি নেই। চাওয়া নেই। পাওয়ার আশাও বোধহয় নেই। উত্তরণের পথে অনেক শিখেছে, হেরেছে, জিতেছে। জেনেছে এর বাইরেও একটা পরিমণ্ডল আছে। মৃত্তিকার সহজ সরল কথায় তারই ইঙ্গিত।

"বেশ। তুই ভালোই আসস। বাসে ঝুইল্লা অফিস কইর‍্যা, টিভি দেইখা, আমার লেইগ্যা রান্না কইরা কটায়ে দিলি আর আমি তর হাতের লুচিমাংস খাওনের লেইগ্যা আইয়া পড়ি"

"তরে ওইটুকু খাওয়ানের ক্ষমতা আসে"

মাংস মুখে ফেলে বলল "ঝালটা বেশি হইসে"

"বাবুর আজকাল রুচি অরুচি" বলতে পারল না 'আগে যা দিতাম, চাইট্টা-পুইট্টা খাইতি। এখনত খুত ধরনের কিসু নাই' ও দুঃখ পাবে।

এখানেই বর্ণালীর সঙ্গে মৃত্তিকার তফাত। মৃত্তিকা জীবনের দিক দেখে। বর্ণালী অন্য দিক। টিভি দেখে না। বর্ণালী ব্যান্ড শোনে না। ভালোবাসে গান, সাহিত্য, ভাস্কর্য।

"পাবলো নেরুদার লেখা পড়েছ?"

চায়ের কাপ নিয়ে ওপাশের সোফায় বর্ণালী। হাল্কা হলুদ হাউসকোটে। কোনওদিনও বেশি প্রসাধন লাগাতে দেখেনি। সৌন্দর্যে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। কলেজ জীবনে ভালো করে দেখেনি ওকে। সম্পর্কটা ঘরোয়া আতিথেয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মনে হচ্ছে ঝিঁঝি পোকার কলরবে বর্ণালীর শব্দ। ইদানীং এই শব্দের অর্থের খোঁজে বর্ণালীর ফ্ল্যাটে বিচরণ। স্বর্ণালী তার জীবনের তারা। ধ্রুবতারা নয়। তার ভালোবাসার জাগতিক ব্যাপ্তি। ছাপা শাড়ি পরা বর্ণালী সংসারের ঘেরাটোপে নির্বাক অস্তিত্ব। এতকাল সেভাবে দেখার প্রয়োজন মনে হয়নি। এখন মনে হয়, অজানা নক্ষত্রের আলো। অন্ধকারে জ্বলছে।

প্লেটটা তুলে বলেছিল "কিছুই তো খেলে না"

শশিভূষণ দে স্ট্রিটের খসা প্লাস্টারের দেওয়াল সংলগ্ন বেসিনের তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে অসীম বলেছিল "আর কত খাব?"

কথাগুলো এই মুহূর্তে বুকে থাপ্পড় মারছে। খাওয়ার কী কোনও শেষ আছে? খিদের মাপকাঠিটা দিন দিন পালটে যাচ্ছে। ব্যাখ্যাটাও। তখন পেটের খিদে ছিল। এখন মনের। খিদেটা থেকেই গেছে।

"না পড়িনি"

"পাওলো কোয়েলো?"

"নাঃ"

"কত কিছু জীবনে করনি। আমার মতো ঝাড়া হাত-পা হলে সময় পেতে" বিজিতের পর বিয়ে না-করার প্রত্যুত্তর।

একটা ফোন স্বর্ণালীকে। পরের ফ্লাইটে নিউ ইয়র্ক। সেই প্রথম বর্ণালীকে কাছ থেকে দেখা। কর্তব্যের বাইরে রক্তমাংসের বিবর্ণতা। শালি হিসেবে কলেজ জীবন থেকেই দেখে আসছে। নিউ ইয়র্কে বসে সে আবার দেখল তাকে। চোখের জলের বন্যা। আভরণহীন বিবর্ণ আবরণে। স্তব্ধ মৌনতার সাগর। নায়াগ্রা ফলসের জলপ্রবাহে পুঞ্জিভূত নির্বাক চোখের জলে।

"অত ভেঙে পড়ছ কেন? আমরা তো আছি" অসীম সম্বিতকে কোলে তুলে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

“কত দিন? ক’মিনিট? ক’সেকেন্ড?” বর্ণালীর শূন্যতা মোহনা খুঁজছে “তোমরা তো সবসময় থাকবে না। একা হয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ একা। চিরকালের জন্য”

সেদিন জবাব দিতে পারেনি। নিভে যাওয়া প্রদীপকে আলোকিত করা যায় না। বর্ণহীন অশ্রুসাগরকে ভাষার মায়াবী মোহে ভোলানো যায় না। চেষ্টাও করেনি। সেদিনের অসীম পার্থিব গণ্ডিটুকুই জানত।

“এখানেই একা থেকে যাবে?”

“না অসীমদা। ওর হাত ধরেই এখানে আসা। ও-ই যখন নেই, বিদেশ বিভূঁইয়ে পড়ে থাকব কেন?”

“তোমার চাকরি?”

“লেখাপড়া শিখেছি। ওখানে কিছু একটা জুটিয়ে নেব। তাছাড়া সম্বিতকেও তো মানুষ করতে হবে”

“সুযোগটা এখানে অনেক বেশি”

“সুযোগ থাকলেও, জনবল কম। না অসীমদা, কলকাতাতেই ফেরত যাব”

সম্বিতের হাত ধরে কিছুদিন আগেই কেনা বিজিতের সাদার্ন এভিনিউর ফ্ল্যাটে পদার্পণ। আবার নতুন করে শুরু। শূন্যতা থেকে আরেক জীবন।

“জীবনের অনেকটা পড়ে আছে। বিয়ে করে নাও”

“না অসীমদা”

“কেন?”

জবাব দেয়নি বর্ণালী। অনেক কথার জবাব যেমন মানুষটার গভীরে ঢাকা পড়ে থাকে, ওর এই নিঃসঙ্গ জীবনের ইতিহাসও তেমনি ধোঁয়াশায় ঢাকা। সেখানেই ও অনন্যা। অসীমের বর্তমান ধোঁয়াশার বিস্তৃত বালুচর। স্ত্রী-কন্যা সমৃদ্ধ চ্যাটার্জি গ্রুপের বাইরে ও ভাবতেই পারে না। তবুও... বর্ণালী যখন চায়...

আজ বহু বছর পরে তার উত্তর। চেতনার আলোকে।

অসীম শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা রেখে বলল “হ্যাঁ, জীবনে অনেক কিছুই করা হয়নি। এবার করতে হবে”

“যেমন সাহিত্য...”

“কিংবা তোমার গান” সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলল “চিরকাল পেটের তাগিদে ছুটেছি। সময় হয়নি মনের দিকে তাকাবার”

বর্ণালী মুচকি হাসল “সময় হয়নি, না, মন চায়নি?”

ওর হাসিটা নিটোল। সেটিং দাঁতের ফাঁকে আগে চোখে পড়েনি। বয়স হলেও বর্ণালী অপরূপা। হলুদ হাউসকোটে দারুণ লাগছে।

তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। স্বর্ণালীকে একদিন হলুদ কাফতান পরা দেখে অসীম জিজ্ঞেস করেছিল “এটা কবে কিনলে?”

“দিদি দিয়েছে”

সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে ভীষণ সুন্দর লাগছিল। আজ মনে হচ্ছে বর্ণালীকে ওই কাফতানটায় না-জানি আরও কত সুন্দর লাগত। বর্ণালীর ফর্সা গোলপানা মুখে সাবেকিয়ানা। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির ছাপ। এই বয়সে মেদ বাড়লেও, খারাপ লাগে না। চোখের মধ্যে তীক্ষ্ণতা না থাকলেও, নমনীয়তা। পাখির নীড়ের মতো না হলেও শান্ত স্নিগ্ধ। তার মধ্যে খোঁজা যেতে পারে জ্ঞান-গঞ্জের ঠিকানা। হাসির সঙ্গে টোল। ভরিয়ে দেয় মন।

“তুমিই ঠিক। মন ছিল না”

বর্ণালী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল “মিসেস রায়চৌধুরী?”

“বলছি”

“অরবিন্দ সেবা কেন্দ্রে আসবেন?”

“কেন, কী হয়েছে?” চিন্তায় ভ্রূ কোঁচকাল।

“আপনি সম্বিতের মা?”

“হ্যাঁ”

“সম্বিতকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে”

সোফা থেকে লাফিয়ে উঠল। উৎকণ্ঠায় বুক কাঁপছে। অসীমের দিকে তাকাল। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছে কিছু হয়েছে।

“ওখানে কেন?” বর্ণালীর কথা অস্পষ্ট।

“হেড ইনজুরি”

“আসছি। কোথায় ভর্তি?” হাত কাঁপছে।

“আইসিইউতে”

ফোনটা কেটে দিল। অসীম আঁচ করেছে “কী হয়েছে?”

“সম্বিত আইসিইউতে। অরবিন্দ সেবা কেন্দ্রে। দাঁড়াও, চেঞ্জ করে আসি”

বর্ণালী চেঞ্জ করতে গেছে। স্বর্ণালীকে ফোন “সম্বিত অরবিন্দ সেবা কেন্দ্রের আইসিইউতে ভর্তি। চলে এস”

অসীমের মার্সিডিজ বেঞ্জ অরবিন্দ সেবা কেন্দ্রে পৌঁছল পনেরো মিনিটের মধ্যে।

কী হয়েছে সম্বিতের?

নয়

অরুন্ধতী জয়ন্তর পাশে, ফ্ল্যাটের দরজায় অভ্যর্থনা করল “আসুন অসীমদা। আয় স্বর্ণালী”

অনেকদিন ধরেই ভাবছিল স্বর্ণালী–অসীমদাকে ডাকবে। ধান্দার চক্করে হয়ে ওঠেনি। সেদিন খাস্তগিরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টির ফলে কন্ট্র্যাক্ট এক্সিকিউটেড। অরুন্ধতীর প্রমোশন ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। জয়ন্তের সাহায্যে ক্লিয়ারেন্স পাওয়ানোয় সোহমের কমিশন। লক্ষ্মীর বাড়ন্তে জয়ন্ত খুশি। ওকে দেখে স্বর্ণালী অবাক। কলেজ জীবনের পর এমন বেশে দেখেনি। আটপৌরে ঢাকাই শাড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর।

অসীম স্মিত হেসে বলল “মহারানি আজ এ কোন বেশে?”

“অনেকদিন পরি না। আপনি তো ওপার বাংলার। ঢাকাই শাড়ি পছন্দ করেন। আপনার জন্য”

কলেজ জীবনে বললে জীবনটাই অন্যরকম হত। স্বর্ণালীর বদলে সে হয়ত চ্যাটার্জি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিসের আধা মালিকন হতে পারত। মেনিমুখো জয়ন্তর পাশে নিজেকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে হত না। সোহমের সঙ্গে নিভৃত কক্ষে ভডকায় লেবু চিপতেও নয়। যদির কথা নদীতে। অতীত রোমন্থন বাতুলতা। সামনের পথ, শুধু এগোবার।

সোফায় গা এলিয়ে অসীম বলল “ভালোই লাগছে দেখতে”

বর্ণালী ঢাকাই পছন্দ করে। প্রতি পুজোয় অসীমরা ওকে ঢাকাই শাড়ি দেয়। স্বর্ণালীর ঢাকাইটা আলিপুরের বিশাল ক্লোজেটে বন্ধ থাকলেও, বর্ণালীকে মাঝেমধ্যে সদ্ব্যবহার করতে দেখেছে। বর্ণালী ছাড়া কাউকে সচরাচর ঢাকাই পরতে দেখে না। তাই বর্ণালী প্লাস ঢাকাই ইকুয়েশনের বাইরে কাউকে পরতে দেখলে অজান্তেই চোখ পড়ে যায়। অরুন্ধতী না হয়ে অন্য কেউও হতে পারত। তফাত শুধু একটাই। একজন আড়ম্বর ছাড়া। অন্যরা সাজসজ্জায় সরব। অসীমের ভালোলাগা অরুন্ধতীর চোখ এড়ায়নি। তাই কী সাজ?

হঠাৎ অসীমের কলেজ জীবনের কথা মনে পড়ল। স্বর্ণালী আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর অনুভব করত অরুন্ধতীর আসক্তি। প্রকাশ না করলেও চাহনিতে স্পষ্ট। সেই আসক্তি কী এতদিনেও মুছে যায়নি? মধ্যবয়সে আবার প্রকট। নতুন রূপে, নতুন ছন্দে।

“সরি, গত উইকে আসতে পারিনি। শালির ছেলে হঠাৎ হেড ইনজুরি নিয়ে অরবিন্দ সেবা কেন্দ্রে”

অরুন্ধতী ফ্রিজ থেকে খাবার বার করে বলল “এনিথিং সিরিয়াস?”

“না। ফুটবল খলতে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল। টুয়েন্টিফোর আওয়ার্স অবজারভেশনের জন্য ভর্তি ছিল। হি ইজ ফাইন নাউ”

অসীমের উল্টো দিকে বসা জয়ন্ত বলল “মানে এখন নিশ্চিন্ত”

স্বর্ণালী অরুন্ধতীর পাশে। মুখ ঘুরিয়ে বলল “নিশ্চিন্ত বলে কথা। দিদির তো ছেলে অন্ত প্রাণ। ওর তো আর কেউ নেই”

অরুন্ধতীর বুঝতে অসুবিধা হল না স্বর্ণালী দিদির নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। সঙ্গী না থাকলে, অপত্যস্নেহই মুখ্য। চেনা পৃথিবীর চিরাচরিত অঙ্ক।

অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করল “কী খাবেন? গ্লেনমর‍্যাঙ্গি চলবে?”

মাথা নাড়ল। ভেটে পাওয়া। জয়ন্ত বোতল বার করে বলল “অনু, স্ন্যাক্স রেডি কর। আইস কিউবগুলো বার করছি” উঠে ফ্রিজের দিকে। অরুন্ধতী আর স্বর্ণালী কিচেনে ঢুকে পড়ল স্ন্যাক্সের আয়োজনে।

স্মৃতিটা বিস্মৃতির আড়ালে গেলেও বর্ণালীর বর্ণহীনতা, বিজিতের মৃত্যুর পর সম্বিতকে বড় করার স্পৃহা, ওর প্রাণের স্পন্দন। অ-দেখা, অ-চেনা নক্ষত্রের খোঁজ। বাঁচার ছন্দ। নিজের জন্য না হলেও, অন্য কারও জন্যে। ঝংকারটা কোথায় অসীম জানে না। সাকসেসের শিখরে অসীম সেটাই ঝিঁঝিপোকার ক্যাকোফনির মধ্যে খুঁজছে একাকী, নির্জনতায়।

"জল মেশাব? না, অন দ্য রকস?" জয়ন্তর প্রশ্নে তাকাল অসীম।

"অন দ্য রকস"

কক্টেল সসেজ টেবিলে রেখে স্বর্ণালী বলল "বেশি খেও না" সব বউ যেমন স্বামীদের বলে।

গ্লাস ঠেকিয়ে "চিয়ার্স"

জয়ন্ত হুইস্কির ব্যাপারে পারদর্শী নয়। তবু ফোকটে যখন স্কচ পাওয়া গেছে, না খেলে মান থাকে না। স্ট্যাটাসে উঠতে গেলে একটু আধটু সেবন করতেই হয়। হাই সোসাইটি বলে কথা। মধ্যবিত্ত ভেতো বাঙালির খেটেখুটে জাতে ওঠা। অফিস, বাড়ির বাইরে জয়ন্তর পৃথিবী নেই। একা বসে সুরাপানেও মজা নেই। অরুন্ধতী বেশিরভাগ সময়ই বাইরে। সন্ধেবেলা টিভিতে খবর, মাঝেমধ্যে বিয়ার, এই পর্যন্ত। হুইস্কি খেলে মাথা টলমল করে। ভরসা পায় না। অসীমকে সঙ্গ না দিলে মান থকবে না।

স্বর্ণালী ভ্যলুভেন্ট টেবিলে রেখে বলল "হোয়াই দিস পার্টি?"

বোকার মতো জয়ন্ত হাসল "আমার আপলিফটমেন্ট"

"প্রমোশন পেয়েছ নাকি জয়ন্তদা। তুই জানাসনি"

"ওই আর কী" অরুন্ধতী ভ্রু কোঁচকাল। জয়ন্তর বুঝতে অসুবিধা হল না, বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে।

'আপলিফটমেন্ট' কথাটা আপেক্ষিক, অসীম ভালোভাবেই জানে। বিভিন্ন ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ব্যঞ্জনা আছে। জয়ন্ত কী অর্থে বলেছে বোধগম্য হল না। অরুন্ধতীর ভ্রু কোঁচকানো চোখ এড়ায়নি।

"ফর আওয়ার ওয়েল বিইং" সম্মতিতে মাথা নাড়ল অরুন্ধতী।

অসীমের মনে পড়ে না মৃত্তিকাকে কখনও ঢাকাইতে দেখেছে। আগে ফ্রক পরত। যৌবনে পা দিয়ে শাড়ি। সে-ও সুতির। বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে তাঁতের শাড়ি। প্রথমবারের রোজগার থেকে মৃত্তিকার জন্য ঢাকাই শাড়ি কিনেছিল।

"এত দাম দিয়া আমার জন্যে শাড়ি আনলি ক্যান? আমারে কী এসব মানায়?"

বোঝাতে পারেনি মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত, মমতার স্পর্শ, ওর প্রথম নৈবেদ্য। শাড়িটা নিয়েছিল বটে। পরতে দেখেনি। অসীমের দানে কেন যে অনীহা বোঝেনি। না-পাওয়ার সুপ্ত অভিমান? ও তো মাতৃত্বের রূপ। সহমর্মী।

সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে। মৃত্তিকা একদিন বলেছিল "সিনেমায় যাবি?"

"না রে। আমারে বড় হইতে হইব"

বৃত্তির টাকায় বাঘাযতীনের কলোনি থেকে হিন্দু হস্টেল। মৃত্তিকা বহুবার এসেছে। আর কখনও সিনেমা দেখার কথা বলেনি। অসীম স্বর্ণালীর প্রেমে পড়ার পর নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল। পাছে স্বর্ণালী ভুল বোঝে। বিয়েতে পরম আদরে স্বর্ণালীকে সাজিয়েছিল। যেমন ননদ নতুন কনেকে সাজায়।

অরুন্ধতী ফ্রায়েড প্রন্স টেবিলে রেখে বলল "কী খাবি স্বর্ণালী? ভডকা?"

"উইথ টমেটো জুস। ব্লাডি মেরি"

গ্লাস সাজিয়ে বলল "আমার বাকার্ডি"

সাদা রামের নেশা অন্য জায়গায়। রঙিন গ্লাসে নয়। জয়ন্তর নেশাও টিভিতে সীমাবদ্ধ নয়। সবাই নেশার পেছনে ছুটছে। এই ছোটার মধ্যে যে যার মতো করে নক্ষত্রের ঠিকানা খুঁজতে চাইছে, আলো আঁধারির ধোঁয়াশায়। অসীম বাকার্ডির সঙ্গে আটপৌরে শাড়িকে মেলাতে পারছিল না। বর্ণালীর নিষ্পাপ চেহারায় মানায়।

যত বাহার করেই পরুক না কেন, ছন্দ মেলে না। শাড়ির বাহার কী পারসোনালিটিকে আড়াল করতে পারে? অবয়বের সঙ্গে শাড়ির কতটা সাদৃশ্য জানে না। চলন-বলনের সঙ্গে তো বটেই।

"ইউ লুক গরজিয়াস"

"সত্যি অসীমদা?"

অসীমের পাশে দাঁড়িয়ে ছোটবেলার শিহরণ। স্বর্ণালী না এলে জীবনটা অন্যরকম হত। মনকে অস্বীকার করা যায় না। অনেকবার মনে হয়েছে স্বর্ণালী অসীমের বিবাহিত স্ত্রী হলেও দুজনের গোত্র ভিন্ন। নিজের মানসিকতার সঙ্গে বেশি মিল। বন্ধনের মধ্যেও ছন্দহীনতা। কোথায় বোঝেনি। ধারণাটাকে নির্মূল করে দিয়েছে। যাতে আত্মবিশ্বাস নড়ে না যায়। লরেটোর অন্যান্য মেয়েদের থেকে স্বতন্ত্র, এগিয়ে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে অন্যদের ছাপিয়ে বিজয়িনী।

অসীম লজ্জা পেল। সামনে জয়ন্ত বসে। কী মনে করবে। স্বর্ণালীর এসবে ভ্রুক্ষেপ নেই। কলেজ জীবন থেকেই নিশ্চিন্ত। যে মেয়েই ওর দিকে ঢলাঢলি করুক, ও তারই আছে, থাকবে।

তার জীবনের সত্যিকারের সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা একজনেরই। চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধার নয়। প্রেসিডেন্সির মেধাবী ছাত্র অসীম চ্যাটার্জির "সেই কলেজ জীবন থেকে চেনা। এত বছর পরেও কম্প্লিমেন্টস পাব ভাবিনি"

"ওর সব কিছুই আগেকার মতো। শুধু পুরবি-অরুণার মতো টিভির সামনে বসাতে পারলাম না। এটাই দুঃখ" স্বর্ণালী টিপ্পনী কাটল।

ভল্যুভেন্টটা এগিয়ে বলল "অসীমদা নিন। আপনি তো কিছুই নিচ্ছেন না"

মুখে পুরে গ্লেনমর‍্যাঙ্গিতে চুমুক "বেশ নিলাম। তোমরা খালি সার্ভ করছ"

অরুন্ধতী খাওয়া নিয়ে ভাবছে না। এখনও দুলছে চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্বে। কী চেয়েছিল? বিনিময় কী পেল? অন্তরঙ্গতা বিয়ের সাতপাকে আবদ্ধ নয়। ওটা সামাজিক পরিচয়। মন ওর বাইরে ভেসে বেড়ায় দূর-বহুদূরে। দৃশ্যমান অথচ অগম্য হরাইজনের মতো। ছুঁতে গিয়েও ছোঁয়া যায় না। ধরতে গিয়েও যাকে ধরা যায় না। পেতে চাইলেও পাওয়া যায় না। সেখানেই না-পাওয়ার টান। অন্তরঙ্গতা চেয়েছিল অসীমের সঙ্গে। বিনিময়ে একাকিত্ব। জয়ন্তর প্রবেশ। মেধায় সমকক্ষ হলেও, আর কোন দিকে যোগ্য নয়।

স্বর্ণালী কক্টেল স্যসেজ ঘুরিয়ে গেল। যেন ওই নেমতন্ন করেছে। বন্ধুত্বটা এতই ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গতায় খাদ নেই।

অসীম জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করল "কাজ কেমন চলছে?"

"আমাদের আবার কাজ। সরকারি চাকুরের গতানুগতিক জীবন"

অরুন্ধতী আড়চোখে জয়ন্তর দিকে তাকাল। আবার না বেফাঁস কিছু বলে। ভালোই জানে ও যে কোনও প্রকারে গতানুগতিকতার বাইরে বেরতে চাইছে। জয়ন্ত জানে, না বেরলে, আজকের সমাজে মূল্যহীন। মূল্যটা বহির্বিশ্বে না হলেও অন্তত অরুন্ধতীর কাছে প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনের স্বাদ টুবলুর জন্মের পর থেকেই ক্ষীণ। বাঁচার অন্য বাতাবরণ নেই। অরুন্ধতীকে চাই। বিকল পৌরুষের অন্য গতি নেই। কার চাওয়া যে কী, কে জানে? মৃত্তিকা চাওয়া ছাড়াই বেঁচে। সেই ছোটবেলায় পুকুরপাড়ে গান শোনাতঃ

'ওই জানালার কাছে বসে আছি করতলে রাখি মাথা

তার কোলে ফুল রয়েছে পড়ে সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা...'

গলার মাধুর্য না থাকলেও অবসরে ওর গান শুনতে ভালোই লাগত। তাকে ভোলার মধ্যেই বাঁচার স্ফুলিঙ্গ। অবচেতনের ধ্রুবতারা। মৃত্তিকা যেন ধোঁয়াশায়। চলেছে পার্থিব জীবনের মধ্যগগনে। অসীম বুঝতে পারে না সব কিছু হাতের মুঠোয় থাকতে, কেন নিরাশা? না কি, মেকির আড়ালে জীবনের সত্য? সত্যের ধোঁয়াশায় বাঁচতে চায় মিথ্যেকে দূরে সরিয়ে। আলুর দম, কষা মাংস লুচি উপলক্ষ। অসীম বোধহয় মৃত্তিকার মধ্যে ওর অতীতকে খোঁজে। হয়ত ভবিষ্যৎকেও। রঙিন দেশলাই কাঠি লুকিয়ে ওই অনাড়ম্বর মহিলার মধ্যে।

"মরণরে ভয় পাস না?"

"জন্মাইলে মরতে হইব। সকলেরই জানা। ভয় পাওনের কী আসে? মরণ আইলে আইব। অর থাইক্যা পালাইয়া কোথায় যামু?"

মৃত্তিকার মতো যদি সবাই বলতে পারত। যত বন্ধন তত মৃত্যুভয়। বন্ধনহীন মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়তে পারলে মৃত্যু মাথা নত করে। তবে জীবনের অমৃত কোথায়? বাকার্ডির নেশায়? প্রগতির নামে ছোটা অগতির চোরাবালিতে? কখন মিশে যাবে অন্তহীন গহ্বরে। সেই খাদে ডুবতে চায় না মৃত্তিকা। সাধারণভাবে বাঁচতে চায়, গোলকধাঁধার বাইরে। জীবনের আসল কবিতা হয়ে। না-পাওয়ার মধ্যে পাওয়ার ছন্দ। আকারের মধ্যে নিরাকারের আনন্দ। তবে কী মৃত্তিকা নিরাকারের জীবন্ত প্রতীক?

অসীমের প্রশংসা মনে ধরেছে অরুন্ধতীর। এত বছর পর এই প্রথম। মনে হল এই মুহূর্তে চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধার সামনে বসে নেই। বসে আছে, তার জীবনের প্রথম ব্যর্থতার সফল নায়ক।

না-পাওয়ার অবগুণ্ঠনে নিঃশব্দ চেতনা। এলোমেলো করা একাকিত্বের নিভৃত উত্তরণে তাকে রুদ্ধ করা প্রেসিডেন্সির তারুণ্য।

দশ

“কাজটা একটু কঠিন” জয়ন্ত ফাইল থেকে মুখ তুলে মুচকি হাসল।

সোহম বুঝেছে, যতই সে অরুন্ধতীর সঙ্গে ঢলাঢলি করুক, এ বান্দা সহজে গলবার নয়। কঠিন, মানে মালকড়ি ছাড়ো। গভর্নমেন্ট অফিসারদের বুলি। ভেবেছিল অরুন্ধতীকে ভডকা খাইয়ে বাজিমাত করবে। এখন দেখছে এ আরেক ছুপা রুস্তম। দেখে মনে হয় গোবেচারা, কিছুই বোঝে না। ভাজা মাছটিও উলটে খেতে পারে না। তালে জ্ঞানে অতিমাত্রায় হুঁশিয়ার।

শালা বউটাকে পটিয়েও, লোকটাকে বাগে আনতে পারছে না। অরুন্ধতীর কাছ থেকে ওর সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছিল। মনে হয়েছিল সাদাসিধে। স্টেটসের বং সং-এর ক্লিয়ারেন্স করে দিয়েছিল যৎসামান্য মূল্যে। ফ্যাশন আনলিমিটেড যথেষ্ট এক্সপোজার পেয়েছে সম্মেলনে। এবারের কাজটা আরেকটু জটিল। মিডিয়া সাম্রাজ্যের আধুনিক যন্ত্রপাতি ইমপোর্টের ক্লিয়ারেন্স। কোটি টাকার মাল। অরুন্ধতীকে ভিড়িয়ে লাভ নেই। ওর ফয়দাও নেই। আগ্রহী হবে না। জয়ন্তর সঙ্গেই খেলতে হবে। মেয়ে হলে অন্য চক্কর চালানো যেত। একে দিয়ে যাবে না, মেয়েছেলের চক্কর ছাড়া। মনে হচ্ছে অর্থনাশ ছাড়া গতি নেই।

তবুও তির ছুড়ল “জানি কাজটা কঠিন। আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়”

যদি আপাত গোবেচারাকে তোল্লাই দিয়ে কিছু হয়। মনে মনে হাসল। আইএএস অফিসারকে টুপি পরাবার চেষ্টা করছে। বিস্ময়কর। এ রঙ্গে কত খেলাই না খেলতে হয়। সোহম কাঁচা খেলোয়াড় নয়, সিজনড ঘুঘু। কতদিন ধরে খেলছে।

জয়ন্তর মুখ নিচু কাঁচুমাচু “সহজ হলে তো করেই দিতাম। এতবার বলতে হত?” আইএএস অফিসার ঘুষের দরাদরি করছে। এ না হলে কলিকাল!

সেও বোধহয় কোনও নক্ষত্রের খোঁজে। ক্ষমতা থাকুক চাই না থাকুক – সবাই ছুটতে চায়। একটিবারও থেমে পৃথিবীকে দেখতে চায় না। সবাই কোনও একটা ধ্রুবতারার খোঁজে।

“তবুও... আপনি চাইলে কি না করতে পারেন” অনুনয়, অনুরোধ।

যদি অরুন্ধতীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানত, দর নিয়ে ভাবত। অরুন্ধতী তো ওকে বলেনি। এসব ব্যক্তিগত সন্ধ্যার কথা তো বলার নয়।

মুরগি যাতে হাত ফসকে না যায়, ফাইলের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল “ঠিক আছে। চারদিন পর আসুন। দেখি, ম্যানেজ করতে পারি কি না”

সোহমকে যেতে দেখে ফাইল থেকে মুখ তুলে কলিং বেল টিপল “হরি, এক কাপ চা দে তো” পার্সোনাল আর্দালি চা করতে গেল।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছাত্রের ক্ষমতার বাইরে স্বর্গ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কোনও কালেই ছিল না। চাকরি পেয়েছিল নিজের কৃতিত্বে। ফুলশয্যার রাতে, অরুন্ধতীর নরম বুকে হাত বুলিয়ে ভেবেছিল এখানেই স্বর্গ, মর্ত্য, জীবন। নিবিড় করে পেয়েছিল ওকে। পরে কালেভদ্রে। এখন সেসব গেছে। চাওয়াটা আধুরা থেকে গেছে। পাওয়া হয়ে ওঠেনি। একবার রাতে সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল “আমারও তো তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে করে”

সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে উলটো মুখ ফিরিয়ে অরুন্ধতী নির্বিকার “ভী... ষ... ণ ঘুম পেয়েছে”

চাওয়া, না-পাওয়ার দোটানার গড্ডালিকায় অরুন্ধতীর সমকক্ষ হওয়ার সাধ। ফ্যাশন আনলিমিটেডকে দেখে, আরেক পৃথিবীর হাতছানি। জীবন শুধু চাকরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বাইরেও দুনিয়া আছে।

ভালোই বুঝিয়ে দিয়েছিল সহধর্মিণী। সহধর্মিণীকে সহমর্মিনী করতে গেলে, চেনা পথের বাইরে হাঁটতে হবে। মুখচোরা জয়ন্তর আর কী শক্তি?

“স্যার, যদি একটু দেখেন। ফাইলটা অনেকদিন ধরে আটকে”

“এখানে এসব কথা বলা সম্ভব নয়। অন্য কোথাও...”

দারুওয়ালা আধো বাংলায় বলেছিল “সন্ধেবেলা ফ্রি?”

ডায়েরি দেখে বলেছিল “আজ তেমন কোনও কাজ নেই” মনে পড়ল অরুন্ধতী সকালে বলে গেছে “ফিরতে রাত হবে। আমার জন্য অপেক্ষা করে থেকো না”

একা টিভির কচকচানি শুনে কী হবে? দারুওয়ালা চড়িয়ে খাওয়া লোক। জয়ন্তকে ইতস্তত করতে দেখে বলেছিল “মেরে সাথ হায়াতমে ডিনার কর লেনা। উধারই বাতচিত হোগা”

ফোকটে ডিনার নয়, সঙ্গে খামে মোড়া ভেটও। স্যুটের পকেটে টাকা পুরে বুঝেছিল সহধর্মিণীকে সহমর্মিনী করতে গেলে, এ পথে পা বাড়ানো ছাড়া গতি নেই।

ডিনার শেষে উঠে বলেছিল “কাম হো জায়েগা”

বাড়ি এসে গুনেছিল। একবার নয়, চার-চারবার। নগদ কুড়ি হাজার কড়কড়ে নোট। ভুল দেখছে না তো? বলা যায় না। পুলিশের খোঁচরও হতে পারে। সব সময়ই ভয়। একটা ফাইল নড়ালেই যদি কুড়ি হাজার, মন্দ কী? একটু এপাশ-ওপাশ করলেই নক্ষত্রটা কী খুব দূর? গভর্নমেন্ট কোয়াটার্সে থাকলেও, ওর নামে কিছুদিনেই আরও দুটো ফ্ল্যাটবাড়ি। অরুন্ধতী অবশ্য জানে না। ঠিক করেছিল সময় বুঝে অরুন্ধতীকে একটা উপহার দেবে। আজকের যুগে প্রোমোটাররা সহায়ক। ৩৩% হোয়াইট। ৬৭% পার্সেন্ট ব্ল্যাক। ৯০% ব্ল্যাক হলে আরও ভালো। হিসাবটা পরিষ্কার। ব্যাঙ্কের লোণে ৩৩%। খাতায় কলমে পরিষ্কার। বাকি ৬৬% দারুওয়ালা, সোহমদের মতো ইচ্ছুকদের সহায়তায়। নক্ষত্রের রঙটা ক্রমশ চিনতে পারছিল। ধূসর থেকে আকারে।

রাত ক’টা জানে না। পর্দা ঢাকা ঘরের আলোয়, বাইরে পূর্ণিমার আলোর রোশনাইতে ভরে গেছে কি না জানে না। সেখানে হাজারও নক্ষত্র। কোনটা ধ্রুবতারা, তাও জানা নেই। আলমারিতে নোটগুলো ঢুকিয়ে চাবি লাগাতে যাবে, হঠাৎ অরুন্ধতী ঢুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল “উফঃ”

“কী হল?”

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, শাড়িটা ড্রেসিং টেবিলে ছুড়ে ফেলল। ব্লাউজের বোতাম আলগা করে বাথরুমের দিকে।

“কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে”

“কেন? লটারির টিকিট কেটেছ বুঝি?”

ততক্ষণে আলমারির চাবিটা খুলে টাকার বান্ডেল বার করল।

ওদিকে চেয়ে অরুন্ধতী বলল “লটারি কোথায় লাগল?”

“টাকার কী জাত আছে?”

ব্রায়ের হুকটা শিথিল। ওটাও জামাকাপড়ের স্তূপে। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে টাকার বান্ডিলে। ভুলেই গেছে ওপরাংশ বেআব্রু। জয়ন্তর দৃষ্টি টাকার বান্ডিল ছাপিয়ে ওর স্তনে। কতদিন নিওন আলোয় স্তন দেখেনি। টাকার সঙ্গে অ্যাডিশনাল বোনাস।

“কোত্থেকে পেলে?”

“একটা ফাইল পাস করার জন্য”

“এসব একদম ভালো লাগে না। আমাদের কী টাকার অভাব? এভাবে কামালে একদিন ফাঁসবে”

থমকাল। কোথায় ভেবেছিল টাকা দেখলে দর বাড়বে, বদলে বিড়ম্বনা।

“টাকাই সব, নয় কি?” সাফাইয়ের চেষ্টা।

"তোমার টাকা নিয়ে স্বর্গ নরক যেখানেই যাও, আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমাকে জড়িও না"

সায়ার দড়ি শিথিল করতে ওটাও মাটিতে "টাকা চিবিয়ে খাও। ঘেমো গাটা সাওয়ারে চুবাই"

টাকা পড়ে খাটে। ওর ভরাট নিতম্বের দিকে অপলক চেয়ে। বউকে কতদিন পর বিবস্ত্র দেখছে। আজকাল ছোঁয়া দূরের কথা, দেখাও মেলে না।

চুল মুছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল "এই হারামের টাকা নিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছ? তুমি ব্যাতিক্রমী পুরুষ? পৌরুষটা টাকার মধ্যে নেই। পৌরুষটা ডান্ডায়, পার্সোনালিটিতে। তোমার মধ্যে দেখলাম না"

অরুন্ধতীর নির্লিপ্ততাতে বিমর্ষ। উচ্চবিত্ত অরুন্ধতীর টাকার প্রতি নিস্পৃহতা। জন্মগত পারসোনালিটি পালটাবে কী করে? সাফল্যকে তুলে ধরে যদি বা কাছাকাছি আসা যায়। সেখানেও ঔদাসীন্য। কীসে ওর মন ভরবে? মনের গহ্বরে আজও পৌঁছতে পারল না। দেহের ধারেপাশে তো নয়ই।

তোয়ালেটা বুকে ফেলে মুখটা ক্লিন্সিং লোশন দিয়ে মুছতে লাগল। জয়ন্তর চোখ কোথায় হুঁশ নেই। যতই ফেসিয়াল করুক না কেন, প্রথম যৌবনের ব্রণর দাগগুলো বর্তমান। বুঝতে পারছে জয়ন্ত অপেক্ষায়। আজ তার চাই। ওর এই অবনতিতে হতাশ। মোহ, উত্তেজনা নেই। স্ত্রীর পরিচয়টাও ধূসর। মড হতে পারে, নীতিহীন নয়। ওর উত্তেজনার পারদ নিম্নগামী হলেও, জয়ন্তর সঙ্কুচিত নিম্নাঙ্গ ক্রমশ শহিদ মিনার। একটাই স্লোগান না-পাওয়ার বর্ষপূর্তিতে। নক্ষত্রটা কালো রাতের অন্ধকারে ধোঁয়াশা। জয়ন্তকে চেনাতে গেলে আগে নিজেকেই চিনতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও গতি নেই। অরুন্ধতী জীবন্ত নক্ষত্র।

দিন চারেক পরে সোহম উপস্থিত। জয়ন্ত ফাইল থেকে মুখ তুলে বলল "মনে হয় ম্যানেজ করতে পারব। তবে কাজটা শক্ত, বুঝতেই পারছেন" গলা নামিয়ে ফিসফিস "বেশি লাগবে"

আন্দাজ করেছিল। খেলা অজানা নয় 'কত?' বলতে গিয়েও থেমে গেল। এটা অফিস। এখানে দেওয়ালেরও কান আছে।

"অফিসের পর অন্য কোথাও..."

জয়ন্ত হিসেব করল। এমনিতেই অরুন্ধতী প্রায়শই বাড়ি থাকে না। বান্ধবী জোটাবার ক্ষমতা ওর নেই। ঘরে বসে টিভি, মাঝেমধ্যে বিয়ার গেলা ছাড়া বিশেষ কিছুই করার থাকে না। সামাজিক দিক দিয়েও অ্যাক্টিভ নয়। সন্ধেটা সোহমের সঙ্গে লেনদেনে কাটালে, মন্দ কী? অরুন্ধতী দূরের নক্ষত্রের মতো অধরা হলেও, টাকা তো ধরা দিয়েছে। সেটাই গতি, প্রগতি। অরুন্ধতী যে চোখেই দেখুক।

"কোথায়, কটায়?"

"আপনি যেখানে চান। নিরিবিলি হলে ভালো হয়"

"তাজ বেঙ্গল?"

"সুখ। ঠিক সাড়ে সাতটায়" ওখানকার অ্যারাবিক খাবার মুখে লেগে।

সোহম উঠে পড়ল "তার আগে ফোনে কথা বলে নেব"

মানে পরিষ্কার। টাকার অঙ্কটা জেনে নেব। টাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। পড়াশোনা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। না পারল প্রেম করতে, না কেউকেটা হতে। খবরের কাগজ থেকে সম্বন্ধ করে স্বাস্থ্যবতী উচ্চ-মধ্যবিত্ত বিদুষী অরুন্ধতীকে ঘরে আনা ছাড়া। টুবলুর জন্ম পর্যন্ত অরুন্ধতীকে ঘরবন্দি করতে পেরেছে, সেটাই যথেষ্ট। বছর পেরতেই বুঝেছে, এ শুধু সামাজিক স্ট্যাম্প। বিয়ের ঘেরাটোপে কাউকে কী বেঁধে রাখা যায়?

যে প্রান্তেই অরুন্ধতী চড়ে বেড়াক, ঘর ভাঙেনি। আজকালের মেয়েরা বুদ্ধিমতী। মন আর ঘরকে একই জোয়ারে ভাসাবার চেষ্টা করে না। ঘরে যদি নিরীহ অর্বাচীন লাইসেন্সড স্বামী থাকে, ঘর ভেঙে কী লাভ?

তার থেকে সাজানো থাক নিভৃত বাসর লোকচক্ষুর আড়ালে। রঙের ফোয়ারায় ভাসুক অজানা নক্ষত্রের খোঁজে। ঘর পড়ে থাক ঘরে। বাহির ডানা মেলুক বাসনায়। সেখানেই অজানা নিরাকারের সাকার আস্তানা।

সুন্দরী রিসেপশনিস্ট জয়ন্তকে সুখে পৌঁছে নিমেষে উধাও। সোহম না আসা পর্যন্ত মেয়েটির সঙ্গে পচালে মন্দ হত না। সারা জীবনেই পারেনি। এখন হঠাৎ এই চাতুর্য আসবে কোত্থেকে? সোহম দেরি করেনি। ডট ৭ ৩০। হাতে ব্রিফ কেস। জয়ন্ত ফোনে অঙ্কটা বেশি হেঁকেছে। কী আর করা। কাজ নামাতে গেলে মাল খসাতে হবে। এর ফসল অর্থ দিয়ে নয়, তাবৎ লেবু নিংড়ে উসুল করবে। মিডিয়ার এক্সপ্যানশন করতে গেলে ইকুইপমেন্টগুলো দরকার। লাভরে অঙ্কটা পাবলিসিটি কাঙাল পাবলিকের কাছ থেকে সুদে আসলে তুলে নেবে। ক্লিয়ারেন্সটা চাই।

ব্রিফ কেস টেবিলে রেখে বলল “পুরো টাকাই আছে। কী খাবেন?”

“হোয়াইট ওয়াইন হলে ভালো হত”

বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে বলল “কবে আশা করতে পারি?”

“ওয়ান উইক”

“তাড়াতাড়ি হবে না?”

“চেষ্টা করব। বললাম না, ডিফিকাল্টি আছে। মিনিমাম চারদিন লাগবেই। গভর্নমেন্ট অফিসে অর্ডার দিলেও এত তাড়াতাড়ি ফাইল নড়ে?”

“বেশ। কাজটা যেন হয়ে যায় স্যার”

খাওয়ার শেষে ব্রিফ কেস নিয়ে গাড়ির দিকে “বললাম তো। চিন্তার কারণ নেই। হয়ে যাবে”

ঘরে ঢুকেই বাইরের জামাকাপড় খুলে ফেলার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস অরুন্ধতীর। রোজকার মতো সেই করতে উদ্যত হলে, ওর দিকে গয়নার বাক্স এগিয়ে জয়ন্ত বলল “তোমার জন্য”

মুখ না ফিরিয়ে বলল “রেখে দাও। পরে দেখব”

জয়ন্ত নাছোড়বান্দা “চেঞ্জ করার আগে একবার খুলে দেখ”

নির্লিপ্ত অরুন্ধতী বাক্সটা খুলে চমকে উঠল। প্ল্যাটিনামের ওপর খোদাই করা ডায়মন্ড সেট। প্রচুর দাম হবে।

“তোমার জন্য কিনেছি। পছন্দ হয়েছে?”

ভ্যাবাচেকা খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে হার-দুলের দিকে। তার স্বপ্নেরও অতীত। অন্যের মতো গয়নার শখ থাকলেও, টাকার উৎসর কথা ভেবে অনীহা। ভালোলাগার চেয়ে দামামা বাজাচ্ছে হারামের গিফটের বিষকামড়।

আগুনে ঘি ঢেলে জয়ন্ত বলল “বললে না তো, পছন্দ কি না? তুমি ভাব, কিছু করতে পারি না। তুমি ফ্যাশন আনলিমিটেডে যা করতে পারনি, আমি পেরেছি” কথায় অহংকার মাখানো শ্লেষ।

দপ করে জ্বলে উঠল অরুন্ধতী। ক্লীবলিঙ্গের এত দেমাক! মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই মনে হল, কলিযুগে সততার কোনও গুরুত্ব নেই। মিছেই তাকে বিচার করছে। আজকে উত্তরণের মাপকাঠি টাকা। সেই টাকার মালা পরে অস্তিত্বহীন সত্তা দক্ষতার বড়াই করছে। এই কী সেই জয়ন্ত যে বিয়ের সময় ভাজা মাছটি উলটে খেতে পারত না? জয়ন্তর পরিবর্তনটা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। প্রস্ফুটনের নেশায় তারার খোঁজে মেতে। মাতুক। এ ছাড়া কিছু করার ক্ষমতা নেই বিয়ের কিছুদিনে বুঝে গেছে। অরুন্ধতীকে উত্তেজিত করতেও অক্ষম। স্বামী বলে কথা। একটু প্রশ্রয় দিতেই হয়। সেই ঔদার্যে টুবলুর আগমন। হ্যাংলার মতো চেয়ে থাকে। ইচ্ছে না থাকলেও অনেক সময় ‘না’ বলতে পারে না। নয় দেহ নিয়ে খেলবে। এই তো? আগে রেশ কদাচিৎ থাকলেও এখন বিলুপ্ত। সারাদিনের খাটনির পর এই স্বাদহীন দায়বদ্ধতা পোষায় না।

বাক্সটা ড্রেসিং টেবিলে নামিয়ে জামাকাপড় সমেত বাথরুমে। ওর সামনে বিবস্ত্র হতেও অরুচি। স্খলনের শেষধাপে জয়ন্ত। দ্য লেস থট, দ্য বেটার। জয়ন্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল। অরুন্ধতীকে বাথরুমে ঢুকতে দেখে

থেমে গেল। এখানেও কী পরাজিত?

বাথটব ভর্তি করতে কল চালিয়ে, মুখ থেকে সন্ধের প্রলেপ মুছতে ভাবছিল আজকে সততা নিলামের ভোগ্য সামগ্রী। কে বাদ? রথী-মহারথী থেকে সমাজের দিকপালরা। তারাই পূজ্য, বরেণ্য, বর্তমানের ধ্রুবতারা। জয়ন্তই বা ইঁদুর দৌড়ে বাদ কেন? বরং সে-ই অনেক পিছিয়ে। নিছক ফ্যাশন আনলিমিটেডের বেতনভুক কর্মচারী। সে হিরের মায়ায় না মজলেও, সারা দুনিয়া যে মজবে, সন্দেহাতীত। রাগ হচ্ছে ওর ওপর, নিজের সততার ওপর। অপদার্থ স্বামীটা তার থেকে অনেক দূর এগিয়ে। সময়ের রথে সে পিছিয়ে পড়েছে। জয়ন্ত পড়ে থাক আর্থিক উন্মাদনায়। অরুন্ধতী বাঁচতে চায় সীমাবদ্ধতার তারায়।

কাল প্রতীকের সঙ্গে ডিনার। নিশিযাপন, সম্ভোগটাও। বিপত্নীক প্রতীকের সঙ্গে অন্য সঙ্গমের স্বপ্ন দেখছে। দুই তারামণ্ডল থেকে ঠিকরে বেরনো স্ফুলিঙ্গ। মধ্যাকর্ষণের বাইরে ছিটকে যাওয়া নতুন দিশা। যার সন্ধান এখনও পর্যন্ত অজানা। হয়ত এই যুগলবন্দির মধ্যেই নতুন আলোর নিশানা।

এগার

মৃত্তিকার ফ্ল্যাটের সামনে এত লোক কেন? গোটা বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনি আছড়ে পড়েছে। ছোট্ট হাউজিং-এ বিরাট জনসংগম।

কলকাতার স্ক্যাইস্ক্র্যপারে পাশের মানুষও অজানা। লিফটের পাশে দেখা হলে, মুচকি হেসে, 'হ্যালো'। কথা না বাড়িয়ে বোতাম টিপে দেয়। আকাশচুম্বী অট্টালিকায় মানুষগুলো নিজেদের নাগপাশে বন্দি। বাসনার মায়াজালে, জীবনকে ভোগ করছে নিজ ছন্দে। দ্বন্দ্বহীন মনগড়া জৈবিক আলোকে। আলোকটা কোথায়, তা কী জানে? জীবনটা জন্ম থেকে মৃত্যুর সরলরেখায় আবদ্ধ। তারপর? জানা নেই। জানার কী দরকার আছে? জীবন মানে কিছু করে দেখানো। সার্থকতার চূড়ায় অন্যদের বাহবা। চলার পথে উত্থান পতনের মোকাবিলা। সাফল্যের মানে নিজের কেপেবিলিটি। ব্যর্থতা ঈশ্বরের অভিশাপ। তাতেই তৃপ্তি।

এই মধ্যবিত্ত মিল্ক কলোনিতে সেকেলে 'পাড়া' কনসেপ্ট। অর্থ নেই, হৃদয় আছে। চলতে ওঠা ঘরের নিঃসঙ্গতায় পাড়াটাই গোটা পরিবার। অর্থের ঔজ্জ্বল্য না থাকতে পারে, নিম্ন মধ্যবিত্ত হৃদয় আছে। মানুষষের স্বীকৃতি আছে। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। এই ছোট্ট পৃথিবীর পরিব্যাপ্তিতে নিজেকে পায়। যেমন পেয়েছিল বাঘাযতীনের রিফিউজি ছাউনিতে। প্রগতিশীলতা থেকে দূরে নিশ্চিন্ত বলয়ে। এই দুনিয়াকেই জানে। বাইরে পা বাড়াতেই ভয়। সেখানে ভার আছে, ধার নেই। জীবন আছে, মানুষ নেই। অস্তিত্ব আছে, প্রাণ নেই। প্রৌঢ়ত্বে মনে হয়নি একা। মিনিমাসি থেকে ছুটকি, তরুণ থেকে পদা – সবার কাছেই পরিবারের অঙ্গ। তার একাকী জীবনে বাঁচার সঙ্গ।

এরা থাকতেও, অসীমের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, দ্ব্যর্থক। বাঘাযতীনের আধপেটা ছেলেটার জন্য ফ্রকে গুঁজে লুচি আলুর-দমের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ছিল। এখনও। ছেলেটা তাকে সব দিতে চেয়েছিল। একটা ইশারায় বিশ্বকে লুটিয়ে দিত তার পায়ের তলায়। কিন্তু সে কিছুই নেয়নি। শুধু দিয়ে গেছে। পাওয়ার আশায় নয়, দেওয়ার আনন্দে। কোনওদিনও কিছুই চায়নি। দেওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। নিতে সবাই পারে। দিতে পারে কজন? চাইতে গেলে দেওয়ার আনন্দটাই মাটি। সম্পর্কটা তখন জৈবিকতায় বন্দি।

মৃত্তিকা বুঝেতে পারে না, কেন ছেলেটা এখনও ফাঁক পেলেই নীল অলটোতে ছুটে আসে এই মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাটে? হয়ত ভুলতে পারে না ছেলেবেলার দিনগুলো। সেই সময়ের স্নেহের ছায়া আজও বাপ-মা হারানোর বুকে লহরা বাজিয়ে চলেছে। সারাদিনের ব্যস্ততার ফাঁকে অতীতে ফিরে যাওয়া। মমতার ছোঁয়ায় অনুভব করা হারানো দিনগুলোকে। কিছু খুঁজছে ছেলেটা। সেটা কী? তার সীমিত বুদ্ধির বাইরে। ওর চাওয়ার পরিমাপ কোনদিনও বিচার করতে পারেনি। যেদিন কেউকেটা ছিল না। আজও, যখন সে গণ্যমান্যদের একজন। না বুঝলেও, চাওয়া যে আছে, অনুভব করতে অসুবিধা হয় না।

এই চাওয়ার হাটে, নিজের চাওয়াটা ঘুমিয়ে পড়েছে। একবারও বলতে পারেনি। ওকে বিরক্ত করে কী লাভ? যার কোনও সমাধান নেই, ব্যাতিব্যস্ত করে কী হবে? যদি তার নগণ্য অস্তিত্ব দিয়ে কিছুটা আশ্রয় হতে পারে... তাতেই তৃপ্তি। তাতেই আনন্দ। ওর অস্তিত্বে রং ছড়ানোর মধ্যেই তার শূন্য জীবনের পূর্ণতা। আত্মত্যাগে ভরপুর।

অন্যান্য ছুটির দিনের মতো রবিবার বেলা বারোটায় অসীমের নীল মারুতিটা যখন ঢুকল, তখন মৃত্তিকার ফ্ল্যাটের বিল্ডিং-এর সামনে লোকে-লোকারণ্য। কী হয়েছে?

কালকেই তো ফোনে কথা হল "কাল দুপুরে খামু"

“চইলা আয়। বেশি কিসু রাঁধতে পারুম না”

“তুই যা খাওয়াইবি তাই অমৃত”

“অন্য সময় কইরা দিতাম। ক’দিন জ্বর। শরীরটা তেমন ভালো নাই” সত্যি কথা বলতে গিয়েও পারল না।

“ভাইরাল। সাতদিন লাগবো” মৃত্তিকার চাপা দীর্ঘশ্বাস ধরা পড়েনি।

“এই ক’দিন অফিসেও যাইতে পারি নাই”

“ডাক্তার দেখাইসস?”

“হ্যাঁ। কইল তো এমন কিছু নয়। ওষুধ দিয়া গেসে” ভেতরের কান্না চেপে স্বাভাবিক স্বরে বলল “একা একা আর ভালো লাগে না। হাঁপাইয়া উঠসি। তুই আইলে মনটা ভালো লাগব”

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনকে অসীম জিজ্ঞাসা করল “দাদা কী হয়েছে?”

“মৃত্তিকাদি সকাল থেকে দরজা খুলছে না। খবরের কাগজ বাইরে পড়ে। দুধওয়ালাও ফিরে গেছে”

মোবাইলে মৃত্তিকাকে ফোন। বেজে চলেছে... ক্রিং... ক্রিং... ক্রিং... উত্তর নেই। এগিয়ে গেল ফ্ল্যাটের সামনে। একজন বৃদ্ধ তদারকি করছিলেন। তাকে বলল “তাহলে তো দরজা ভাঙতে হবে”

“সেটাই একমাত্র উপায়” বৃদ্ধর সায়।

“পুলিশে খবর দিয়েছেন?”

“না”

ওরা শাবল খুঁজছে দরজা ভাঙার। পুলিস কমিশনরকে ফোন। ওদের বলল “পুলিশের অনুপস্থিতিতে দরজা ভাঙা ঠিক হবে না। অপেক্ষা করুন। পুলিশ আসছে”

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল “আপনি?”

“মৃত্তিকার ছোটবেলার বন্ধু”

পেছন থেকে ক’জন তরুণ এগিয়ে বলল “পুলিশের কথা ছাড়ুন। কখন আসবে কে জানে। অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। এখুনি ভাঙতে হবে”

অসীম বিনীতভাবে বলল “সেটা কী ঠিক হবে?”

বৃদ্ধ ওদেরকে বলল “একটু অপেক্ষা করে দেখ না পদা-কিশোর। উনি তো ফোন করেছেন”

কমিশনারের নির্দেশে, দশ মিনিটে পুলিস ছুতোর মিস্ত্রি নিয়ে হাজির। বসার ঘরের আসবাব ঠিকঠাক। শোয়ার ঘরে ঢুকল পুলিস ও অসীম। ওপরের পাখাটা বনবন করে ঘুরছে। খাটের ওপর মৃত্তিকা শুয়ে। ডান হাতটা বালিশের এক কোণে ছড়ানো। চোখ দুটো সিলিঙের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে। কেউ এভাবে ঘুমোয় না। হাত ঠেকাতেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। দিনের ঔজ্জ্বল্য মিশে গেল হিমঘরের নিথর গুমোট অন্ধকারে। পালস নেই। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে না।। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ভেতরে ছেলেবেলার মুক্তিযুদ্ধের বন্দুকের গুলির লহরা। দিনের অন্ধকারে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক নয়, অভ্রভেদী যুদ্ধের আর্তনাদ। ওর সাম্রাজ্যটা ভেঙে পড়েছে অবিশ্বাসে। এও সম্ভব?

বৃদ্ধ বলেই ফেললেন “মনে হচ্ছে, নেই”

বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সত্যটুকু। কিন্তু কেন? কী করে? অনেক প্রশ্ন। উত্তর দেওয়ার লোক চিরনিদ্রায় চলন্ত ফ্যানের ছন্দহীন বিবর্ণতায়। ইহলোকের শেষ শয্যার নিশ্চিন্তে। জবাব দেওয়ার মানুষটি সীমার বন্ধন ত্যাগ করে অসীমের পথে পাড়ি দিয়েছে। সাধারণ নিরাম্বর নারীটিকে ঈশ্বর তাঁর কোলে বহুযত্নে স্থান দিয়েছেন। মুক্তি দিয়েছেন সংবেদনশীল আত্মাকে। ভূলোকের মায়াজাল কাটিয়ে মুক্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোলে নতুন নক্ষত্রের আগরবাতি জ্বালাতে।

পুলিস বলল “আন-আইডেন্টিফায়েড ডেথ। পোস্ট মর্টেমে পাঠাতে হবে”

মাথা নাড়ল ওরা দুজনেই।

শোয়ার ঘরে থেকে বেরিয়ে বসার ঘরের মোড়ায় বসল। যেমন আগে বসত। আজ শেষবারের মতো। কোনও ফ্রক পরা মেয়ে ফ্রকে লুকিয়ে তাকে পরোটা আলুর-দম খাওয়াবে না। বাবা-মায়ের কটাক্ষকে উপেক্ষা করে বলবে না 'তোমরা আমারে খাওইতাস। অর কেউ নাই। আমার ভাগ থিকা যদি ওরে একটু দিই, অমন কর ক্যানে?'

মুক্তিযুদ্ধ থেকে বাঘাযতীনের পুকুরপাড়ের ল্যাম্পপোস্ট। রিপ্লে করে যাচ্ছে। অতীতের টুকরো আনন্দ মিশে গেছে আচমকা আঘাতে।

"তুই বড় হইলে আমারে একখান ঢাকাই শাড়ি কিনা দিবি?"

"আগে তো কিসু হইয়া লই, তারপর..."

প্রথম চাকরি পেয়ে কিনে দিয়েছিল বটে, আজ অবধি পরতে দেখেনি। কোনদিনও দেখবে না। সহায় সম্বলহীন ছুটে চলা জীবনে, সিনেমাও দেখাতে নিয়ে যেতে পারেনি। আর একবারও চায়নি মেয়েটি। ভীষণ দোষী লাগছে। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নানান চিন্তা। বড় প্রশ্ন - কেন? কালকের ফোনে তো অসংগতি পায়নি। শরীর খারাপের কথা ছাড়া। যেমন অনেকেরই হয়ে থাকে। সকালে তুলিকে পড়াতে বসে ভুলেই গেছিল আরেকবার ফোন করতে। দুপুরবেলা তো যাবেই।

"আজ দুপুরে খাব না" পড়াতে পড়াতেও স্বর্ণালীকে কথা ছুড়ে দিয়েছিল।

"কোথায় খাবে?"

"মৃত্তিকার ওখানে"

স্বর্ণালী কাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে বলেছিল "তুমি এখনও ছোটবেলার শিশুটি। ঠিক তুলির মতো"

তুলি বড় হলে কী হবে জানে না। কিন্তু বাঘাযতীনের রিফিউজি ক্যাম্পের থেকে আলিপুরের মসনদের পথে কোথায় যেন শূন্যতা। তার মধ্যেই অজানা সুর হাতড়ে বেড়াচ্ছে। আলো-আঁধারি জুড়ে। আলিপুরের মসনদ থেকে বেলগাছিয়ায় দুপুরের খাওয়া, সেই অচেনা বেহাগের লয়। শান্তির সমীকরণ।

পাশের ঘরে পুলিস নিয়মমাফিক অনুসন্ধান করছে। ফরেনসিক এক্সপার্ট পৌঁছে গেছে। সব জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিয়ে দেখছে। মৃত্যুটা কীভাবে হল। ওসি কাগজ নিয়ে এঘরে। ওর মুখের দিকে তাকাতেই, চমকে উঠল। মুখটা থমথমে। আরেকবার কাগজটা পড়ছে। মনে হল, চিঠি। বিনম্রভাবে উলটো দিকের সোফায় বসল।

"স্যার, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

অসীম চোখ তুলে তাকাল "নিশ্চয়ই"

"আপনার সঙ্গে ওনার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল?"

চমকে উঠল! এ প্রশ্ন করছে কেন? বুঝেতে পারছে না "হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?"

আমতা করে ওসি বলল "মৃতার বালিশের তলা থেকে এ চিঠিটা পাই"

চিঠিটা অসীমের দিকে এগিয়ে দিল। চশমা বার করে চিঠিটা পড়ছে। হৃৎস্পন্দনটা ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর। পালস জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিশ্বাস করতে পারছে না। কল্পনারও অতীত। ভাবতেই পারছে না, এও হতে পারে? মানুষ ভাবে এক। আর প্রবহমান জীবনটা বয়ে যায় অন্য স্রোতে। চিঠিটা পড়ল। একবার... দুবার... তিনবার। বারবার। ওসিকে ফেরত দিল। চশমাটা হাতে মেঝের দিকে চেয়ে। নিঃশব্দ। মাতৃত্বের রূপ কী বারবার পরিহাস করবে মৃত্যুর পথ ধরে? পেট্রাপোলের শ্মশানের কথা আবছা মনে পড়ছে। মাকে হারানো। আজ আবার স্নেহের বন্ধন থেকে দ্বিতীয়বার মুক্তি। এ কি নিতান্তই স্নেহের বন্ধন? না কি, ইহলোকের বন্ধন থেকে কেউ ক্রমশ তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অনির্দিষ্টে।

অন্য কোনও ধ্রুবতারার খোঁজে?

যার রূপ জানা নেই।

যার রং দেখা নেই।

যার আলো সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাও নেই।

যাকে ধরে এগোবার পথটাও মিলেছে অচেনা দিগন্তে। অনন্ত শব্দটা জোলো, অর্থহীন। সত্য শুধু একটাই। সে নিজে। একাকী আত্মচেতনা। সেটাও আজ প্রলয়ে টালমাটাল। কালপ্রবাহের অনাদি স্রোতে। নোঙর ছেঁড়া পালহীন নৌকো হয়ে ভাসছে মহাশূন্যে।

চশমাটা পকেটে ঢুকিয়ে উঠে পড়ল। ওসিকে বলল "চিঠিটা গোপন রাখবেন। কেউ যাতে জানতে না পারে"

সম্মতিতে মাথা নাড়ল ওসি।

বারো

"কী যে কর। কালকের স্যুটটা খুঁজে পাচ্ছি না" অসীম বিরক্ত।

"তোমার ওয়ারড্রবের বাঁ দিকেই তো রেখেছি" স্বর্ণালী ওয়ারড্রব থেকে স্যুটটা বার করে ওর হাতে দিল।

স্যুট নিয়ে ড্রেসিং সেকশনের অ্যানেক্সে পা বাড়াল। এত বছর ওকে দেখছে। এই ক'দিনে কেমন পালটে গেছে। কারণে-অকারণে বিরক্ত। মৃত্তিকার আকস্মিক মৃত্যুতে স্বভাবিকভাবেই বিমর্ষ। খবরটা অজানা নয়। সেটা মাত্রাতিরিক্ত আকার ধারণ করলে চিন্তার বিষয়।

"কখন ফিরবে?"

"কী করে বলব? কাজের কী টাইম আছে?" তাচ্ছিল্যের জবাব।

এভাবে তো কখনও কথা বলে না। প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। মুড-অফ দেখে চেপে গেল। মৃত্তিকা মারা যাওয়ার পর থেকেই ওর মানসিক বিবর্তন। ক্রমান্বয়ে আরও প্রকট। বিজিত মারা যাওয়ার পরও তো ওকে দেখেছে। বর্ণালীর ফোনে ছুটে গেছে নিউ ইয়র্কে। ভায়রার কর্তব্য নিঃশব্দে পালন করেছে। কিন্তু এমন বিচলিত দেখেনি। কী হল ওর? জানে না। যত দোষ স্বর্ণালীর। সে অসীমকে বুঝতে পারে না। এত বছরেও মানুষটাকে চিনতে পারেনি। দু'জনের অনুভূতির মধ্যে কাচের দেওয়াল। ছন্দ এক হলেও, স্বাদ ভিন্ন।

মৃত্তিকার সঙ্গে ছোটবেলার বন্ধুত্ব অজানা নয়। কলেজ জীবন থেকেই জানা। ফুলশয্যার দিনে, মৃত্তিকাই পরম আদরে ওকে সাজিয়েছিল, ভুলতে পারে না। এই যে হুটহাট করে মৃত্তিকার বাড়ি চলে যাওয়া, সব সময়ই জানিয়ে গেছে। ছোটবেলার স্মৃতি তাড়া করছে বলেই কী এই বিক্ষিপ্ত আচরণ? স্বর্ণালী মনকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

ড্রেসআপ করে কোনও কথা না বলেই লিফটের দিকে পা বাড়াল।

"খেয়ে যাবে না?"

"নাঃ"

"এভাবে না খেয়ে চলে যাচ্ছ। শরীর খারাপ করবে"

লিফটের বোতাম টিপে বলল "না খেয়ে কেউ মরে না। খেয়েই মরে"

কথা বলার আগেই লিফটের দরজা বন্ধ। এখন ওকে একা থাকতে দেওয়াই ভালো।

কিচেনের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল "কাল শনিবার। আমার হাফ-ডে। ক্যালকাটা ক্লাবে লেডিস মিট আছে। আসবি?" ফোনে অরুন্ধতী।

দ্বিধাগ্রস্ত ফোন হাতে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ বা না জবাব দিতে এর আগে একবারও ভাবতে হয়নি। এই মুহূর্তেই কী ফোনটার দরকার ছিল?

"না রে"

"কেন?"

"অসীম কাজে ব্যস্ত থাকে। তুলিকে নিয়ে বসা হচ্ছে না। ওকে নিয়েই বসব। সামনে পরীক্ষা। অভ্যাসটা তৈরি না করলে, পরে পস্তাবে"

ফোনটা কেটে দিতেই পেছন থেকে তুলির গলা "কাল সঞ্চিতার বার্থডে পার্টি। বিকেল পাঁচটায়। কাল পড়তে বসব কেন?"

ধ্যাত! স্বর্ণালী কোনও কথা না বলে সোজা কিচেনে।

মৃত্যু নয়, মৃত্তিকার চিঠিটাও সাজানো বাগানে দাবাগ্নি। বাঘাযতীনের বাঁশ মোড়া ছাউনি থেকে যতদূরেই এগক, এই চিঠি তার প্রগতির গতিকে শুধু লাগাম টানতে পারে না, লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে এতদিনের গড়া অস্তিত্বকে। ল' বলে, মৃত্যুর আগে মানুষ সত্যি বলে। প্রশ্নটা সেই সত্যিকে কে কী প্যারাডাইম দিয়ে দেখে। সেখানেই দ্বিধা, সংশয়। ইহলোকের লক্ষ্মণরেখা। রাতে যতই ঝিঁঝিপোকার ডাক শুনুক, সেও ইহলোকের বলয়ে বন্দি।

"স্যার ফাইলটা না দেখেই সই করে দিলেন?" প্রৌঢ় কেষ্টবাবু উলটো দিকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

কেষ্টবাবু চ্যাটার্জি গ্রুপের গোড়া থেকেই আছে। আগামী বছর রিটায়ার করবে। ধুতি-শার্ট। খোঁচা দাড়ি। যুগ পালটালেও কেষ্টবাবুর পরিবর্তন হয়েনি। এত বছর একই বেশে তাকে দেখছে। চ্যাটার্জি গ্রুপ ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি।

অসীমের পালটা প্রশ্ন "মানুষ মরার পর কোথায় যায়?"

আচমকা এরকম প্রশ্নে থমকাল। হঠাৎ এমন প্রশ্ন আসবে, ভাবতেও পারেনি। আমতা আমতা করে বলল "স্বর্গে"

"কোন স্বর্গ? স্বর্গটাকে কী আপনি দেখেছেন?"

কেষ্টবাবুর গুলিয়ে যাচ্ছে। এসেছিল ফাইল সই করাতে, এখন এ আবার কী প্রশ্ন? স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল। তিন ভুবনের চেতনায় একটা ছাড়লে অন্যটায়। তবে কোনটায়?

কেষ্টবাবু বিনীতভাবে বলল "স্বর্গ তো আপনার মধ্যেই স্যার"

কোনওকালে শুনেছিল সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপর নাই। কেষ্টবাবুর কাছে চৈতন্য মহাপ্রভুই স্বর্গের শুরু ও শেষ। এর বাইরে ভাবার শক্তি ঈশ্বর তাকে দেয়নি। জানে না, মৃত্যুর পর স্বর্গ কোথায়? নরকই বা কোথায়? তার চিন্তাধারার পরিধি ইহলোকের বেষ্টনীতে। অত ভেবে লাভ কী? তার থেকে ছোট মেয়েটার নবজাত শিশুটিকে দেখভালো করাই ভালো। ওখানেই তৃপ্তি। তার জীবন সায়াহ্নের কাঙ্ক্ষিত শান্তি। ওখানেই অবসর জীবনের পরিতৃপ্তি।

অসীম ব্যঙ্গ করেই বলল "কী যে বলেন কেষ্টবাবু! আমি মহাপুরুষ নই"

কেষ্টবাবু চুপ। বুঝতে পারছে না, হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন? তার এতদিনের দেখা স্যার নয়। তার স্নিগ্ধ গম্ভীর রূপ দোটানায়। ঠিক কী ব্যাপারে না-বুঝলেও, অসীমকে বলল "আমার কী অত বুদ্ধি আছে স্যার? ফাইলটা দেখবেন না?"

"আপনি তো দেখেছেন"

মনে পড়ে না, এর আগে কখনও স্যার না পড়ে ফাইল সই করেছেন। আজ নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? মাথা নেড়ে ফাইল হাতে বেরিয়ে গেল।

মৃত্তিকার মৃত্যুর পর কী যেন অসীমকে বিচলিত করছে। সেটা কী! জীবন-মৃত্যু, আলো-আঁধারির জগতে না-চেনা রূপ? না কি, পার্থিব ব্যাপ্তির বাইরে অজ্ঞাত চেতনা? যার কোলে কাছের মানুষ মৃত্তিকা স্বর্গ পেয়েছে। তা স্বর্গ না নরক, হদিস ক'জন জানে? এই না-জানাই আজ সব ছেড়ে ওকে তাড়া করছে। সেখানেই ধন্দ। সেখানেই প্রশ্ন। সেখানেই যাবতীয় অতৃপ্ত অবলোকন। বাহ্যিক ধারণার বাইরে নব-চেতন। মৃত্তিকার মৃত্যুই অদেখা পর্দাটা ধীরে ধীরে সরিয়ে দিচ্ছে। ভাবনায় আনছে নতুন রং।

কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই। সম্বিত ফিরল মোবাইলের শব্দে।

"অসীমদা তুমি কোথায়? স্বর্ণালী ফোন করেছিল। কী হয়েছে তোমার?" বর্ণালীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

"অফিসে"

"বাড়ি যাবে না?"

"হ্যাঁ। একটু পরেই। কাজ শেষ হলে"

“জানি মৃত্তিকাদির জন্য তোমার মন খারাপ। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে”
“কী জানি”
অসীমের দ্বিধার কারণটা বুঝতে পারল না “বিজিতকেও একদিন হারিয়েছিলাম। সময় সব ঠিক করে দেয়”
শুধু মৃত্তিকার চলে যাওয়াই নয়। পুলিসের হাতে ওর শেষ চিঠিটাও ভাবাচ্ছে, সেটা তো বর্ণালীকে বলতে পারবে না। সেখানে সে একা, চিন্তার পাহাড়ে। এই চিঠি তার সাজানো সাম্রাজ্য, পারিবারিক স্নিগ্ধতায় ঝড় তুলতে পারে, তা ওর থেকে আর কে বেশি জানে? সেই উত্তাল পরিস্থিতি একাই সামলাতে হবে ওকে।
“হয়ত তুমি ঠিক বলেছ বর্ণা”
“মন খারাপ হলে আমার বাড়ি চলে এস”
“আজ নয়, অন্য কোনও দিন। অনেক রাত হয়ে গেছে”
“যেদিন তোমার খুশি” ফোন কেটে দিল।

ড্রাইভার গোপাল দেরি হচ্ছে দেখে, অফিসে খোঁজ নিতে এসেছিল। অফিস ফাঁকা। সবাই চলে গেছে। ঘরে ঢুকে দেখল বাবু ডেস্কে নেই। সংলগ্ন চেম্বারের সুইটে সোফায়।
ধীর স্বরে বলল “বাড়ি যাবেন না বাবু?”
“আমি নিজেই ড্রাইভ করে চলে যাব। তুমি চাবিটা রেখে, বাড়ি চলে যাও”
গোপাল ইতস্তত করছিল। অসীম আবার বলল “বললাম না, আমার কাজ বাকি আছে। বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। তুমি চলে যাও। কাজ শেষ হলে ড্রাইভ করে চলে যাব”
গোপাল চাবিটা রেখে বলল “কাল কখন আসব?”
“সকাল দশটায়”
গোপাল বেরিয়ে গেল।

কত লোক চারপাশে। বিভিন্ন কারণে। কাছের লোক শূন্যতা ভরায়। তবুও কোনও মুহূর্তে মনে হয় এই বৃত্তের প্রাণীগুলো যেন দূরের নক্ষত্রের থেকেও দূরে। অচেনা রাজ্যে বাস। চেনা থেকেও অচেনা। কাছে থেকেও দূরের।
মৃত্তিকাকে হাফ প্যান্ট পরা বয়স থেকে দেখেছে, জেনেছে, বোঝবার চেষ্টা করেছে। এখন মনে হচ্ছে কিছুই চেনেনি। দেখেও অ-দেখা।
একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল “তুই আমারে দেইখ্যা যাস। আমার ভাগের কিছু খাওয়ার খাইয়াই ঝিবনটা কাটায়ে দিলি। তুই এখনও ইজার পরা সোট্ট বাচ্চাই রইয়া গেলি। কিসুই বুঝতে পারস না”
সত্যিই তাই। ইহলোকের খোলসটা শুধু দেখা গেছে। অন্তরটা আজও ধোঁয়াশায় ঢাকা। মৃত্তিকা থেকে স্বর্ণালী। বর্ণালী থেকে অরুন্ধতী। রবিনকাকু থেকে চ্যাটার্জি গ্রুপ। মানুষগুলোর ব্যাপ্তি কী পরলোক থেকে আলাদা? যা জানি, যা বুঝি, তাই সত্য। বাকি সব মিথ্যে। যদি কিছুই না বুঝলাম তাহলে ইহলোক পরলোকে তফাত কী রইল? অন্ধ-বিশ্বাসের লুকোচুরি। জানা অজানার মাঝে পুরোটাই মায়া। কায়ার বিবর্তন অসীমে। মহাশূন্যের এপার থেকে ওপার। ইহলোক থেকেই পরলোকের গণ্ডি খোঁজার চেষ্টা। মৃত্তিকা দুই পৃথিবীর ধোঁয়াশাকে আরও ঘোলাটে করে দিয়েছে।
আর রাত করা ঠিক হবে না। চাবি নিয়ে মার্সিডিজের স্টিয়ারিং হুইলে। কলকাতার ট্র্যাফিক পেরিয়ে তাজ বেঙ্গলের বাঁ দিকে গাড়িটা ঘোরাতে যাবে, এমন সময় ঝাঁকিয়ে বেসামাল। কোনওমতে স্টিয়ারিং হুইলটা বাঁ দিকে কাটিয়ে উলটো দিক থেকে আসা ট্র্যাফিক থেকে গাড়িটা বাঁচাল। রাস্তার বাঁয়ে দাঁড় করিয়ে নামল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চাকা। ঝুঁকে গাড়ির তলায় দেখল। কুকুরকে চাপা দিয়েছে। কোথা থেকে গাড়ির তলায় এল বুঝতে পারছে না। লক্ষই করেনি। আরেকটা মৃত্যু। মানুষ না হলেও প্রাণীর। চারদিকে মৃত্যুর দামামা।

সেখানে গলাফাটা কান্না নেই। উত্তেজনার পারদ তরতর করে উঠছে না। নীরব ব্যথার সন্ধ্যাতারা মিটমিট করছে।

এই কী জীবন?

বিদায়ের আলো-আঁধারি খুঁটি ছুঁয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। গতানুগতিক শৃঙ্খলে বাঁধা আত্মাটা নিয়মের গণ্ডি ছাড়িয়ে শুনতে পাচ্ছে অন্তরের শূন্যতায় বিদ্রোহের ডাক। বিবর্ণ ধূসর অন্ধকারে জীবন-মৃত্যুর মানে খুঁজছে। সাংসারিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি। স্বর্গ-নরকের দ্যুতিময় দামামার মধ্যে টিমটিমে শিখা দাবাগ্নি হয়ে জ্বলতে চাইছে। ব্রহ্মাণ্ডের দরবারে জীবন মৃত্যু পার হয়ে মহাশূন্যে।

"কখন আসছ?"

মোবাইলটা কোনওমতে কানে লাগিয়ে বলল "আসছি... রাস্তায়" গাড়ির লাল কাপড় দিয়ে চাকার বনেটে লাগা রক্তের দাগ মুছছে। আর রক্ত দেখতে চায় না। মৃত্যুর সম্মুখীন হতে চায় না। মৃত্যুর মধ্যেই আজানের সুর শুনতে চায়।

স্বর্ণালী বুঝবে না। কে বুঝবে, পরে ভাবা যাবে। এখন একটাই দায়িত্ব। মৃত্তিকার চিঠির বয়ান ওসিকে বোঝাতে হবে। প্রতীক্ষা শুধু পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টের।

তেরো

অসীমের মনে হল হঠাৎ ঘুম থেকে জাগল। মৃত্তিকা সারা জীবন ধরে ঘুমে ভুলেছিল। মৃত্যুকে বরণ করেছে জাগবার প্রত্যাশায়। মৃত্যুর মধ্যে কতটা খুঁজে পাবে কে জানে?

"পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এসেছে?" অসীমের প্রশ্নে মাথা নাড়ল অ্যাডিশনল কমিশনর অফ পুলিস গৌতম অধিকারী।

পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি। চোখ এড়ায়নি গৌতম অধিকারীর। অসীমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রুমাল বার করে মুছল।

বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গাড়িতে ওঠবার মুখে মোবাইল "স্যার আমি গৌতম অধিকারী। অ্যাডিশনল কমিশনর অফ পুলিস"

"কী ব্যাপার?"

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি? আর্জেন্ট অ্যান্ড কনফিডেনসিয়াল"

এই ফোনটার অপেক্ষায়ই ছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভেতরের ঘূর্ণিঝড়ের অবশেষে ঠিকানা মিলবে। একা বোঝা টানতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। না পেরেছে কাউকে বলতে। না পেরেছে উত্তাল মনটাকে লাগাম দিতে। মৃত্তিকা থেকে কুকুরের মৃত্যু ধোঁয়াশা হতে পারে, চিঠিটা নয়।

"সাড়ে এগারোটায় আমার অফিসে চলে আসুন"

"ফাইন। আমার নাম গৌতম অধিকারী। মনে থাকবে তো স্যার?"

"অফ কোর্স। রিসেপশনে বলে রাখব"

ফোন ডিসকনেক্ট করে গাড়িতে উঠে পড়ল।

গৌতম অধিকারীকে চেম্বারে অভ্যর্থনা করে বলল "চা না কফি?"

"ব্ল্যাক কফি উইদাউট এনি সুগার" উলটো চেয়ারে বসে আইপিএস অফিসারের জবাব।

ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে অর্ডার "টু কফিস প্লিজ। ওয়ান ব্ল্যাক উইদাউট সুগার"

আড়চোখে লক্ষ করল মিঃ অধিকারীর চোখ চেম্বারের চারদিকে। যত বড়ই পুলিস হোক না কেন অনুসন্ধিৎসু প্রবণতা মজ্জায়। পারফেকশনিস্ট দাই নেম ইজ প্রফেশন।

রিপিট করল "পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এসেছে?"

মাথা নেড়ে সায় "ইট ফিটস ইনটু দ্য স্টোরি। এইচআইভি পজিটিভ । এলাইজা টেস্টের জন্য পাঠিয়েছিলাম। রিপোর্টস কনফার্ম হার লেটার। সি ওয়াজ এ ভিক্টিম অফ এইডস"

ছোটবেলায় যেমন লেপ্রসির স্টিগমা ছিল, একবিংশ শতাব্দীতে তেমন এইডসও স্টিগমা। বিড়ম্বনার কারণ। মৃত্তিকার এইডস হল কী করে? অবিবাহিত এইডস আক্রান্ত মেয়ের সঙ্গে অসীমের ঘনিষ্ঠতা সমাজ কী গ্রহণ করতে পারবে? সেখানেই বিড়ম্বনা, যন্ত্রণা, দোটানা। এতদিন ধরে তিলতিল করে গড়া সামাজিক, পারিবারিক আবরণ তছনছ। কপালে আবার ঘাম। পালস রেট দ্রুত থেকে দ্রুততর। ফর্সা মুখ লাল। বাকরুদ্ধ, নির্বাক। কী বলবে? কাকে বোঝাবে? কে বিশ্বাস করবে? সন্দেহ থেকে বাঁচতে পারবে? মৃত্যুর বাজি সামাজিক বলয়ের অক্ষকে দুলিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। বুঝতে পারছে না ওই মারণব্যাধি কোথা থেকে এল। তবে কী এমন কিছু যা অসীম জানে না। মৃত্তিকা চিঠিতে উল্লেখ করেনি। শুধু লিখেছে, 'আমার মৃত্যুর জন কেউ দায়ী নয়। অসীম যাতে আমায় ভুল না বোঝে'

রোগের কথা জানত। সেজন্যেই চায়নি তাকে ভুল বুঝুক।

সব গুলিয়ে যাচ্ছে। চেনা লোকটাও অচেনা। এত বছর পাশাপাশি। অথচ একে অপরের কত দূরে। কেউ কাউকে চিনি না। কোনওদিনই চিনব না। তবু পাশাপাশি চলব, বলব, থাকব। শেষ ঘণ্টার পরেও নশ্বর দেহ অজানা আবরণে। অবিনাশী আত্মা এক জীবন থেকে অন্য আশ্রয়ে, কালস্রোতের মহাসঙ্গমে। অনন্য চেতনার নেশায়। একটু দেখা। একটু প্রেম। কুহকের পথে উত্তরণ। মৃত্তিকা পারেনি। অসীম কী পারবে!

“আইচ্ছা মানুষ মরলে কোথায় যায়?”

“সগগে” বেগুনির ঠোঙা হাতে মৃত্তিকা আঙুল তুলে দেখাত।

“বাবা মাও সগগে আসে?”

অসীমের হাতে ঠোঙাটা দিয়ে বলেছিল “দেইখ্যা লস আমিও মরলে সগগে যামু”

স্বর্গটা কোথায় কেউ জানে না। আকাশের পারে? না কি, মহাবিশ্বের গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, নক্ষত্রের মধ্যে? না কি, তার বাইরে? মৃত্তিকা কী সেখানেই গেছে? বিশ্বাস হত, যদি মৃত্যুটা স্বাভাবিক হত। এই অস্বাভাবিক মৃত্যু সব ওলটপালট করে দিচ্ছে। চেতনায় কোনও উত্তর নেই। তার বাইরে খুঁজতে চাইলেও, বেশিদূর এগোতে পারেনি, ভালোই জানে।

“স্যার, আপনার কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে” সম্বিত ফিরল গৌতম অধিকারীর কথায়।

কফিতে চুমুক দিয়ে বলল “আই জাস্ট কান্ট বিলিভ দ্যাট সি হ্যাড অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ সামওয়ান। নোইং হার সিন্স চায়েল্ডহুড ইট ডসেন্ট ফিট ইনটু দিস রিপোর্ট”

“রিপোর্ট ইজ কনফার্মড। এখন কী করব তাই ভাবছি”

অসীম নিজেকে সামলে নিলো “ওয়ান থিং আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ দ্যাট আই হ্যাড নো ফিজিক্যাল ইন্টিমেসি উইথ হার। ইটস ইওর ওনাস টু ইনভেস্টিগেট দিস ফার্দার হোয়াই সি কমিটেড সুইসাইড অ্যান্ড হাউ সি গট এইডস। ইউ ক্যান এক্সপেক্ট ফুল কোঅপারেশন ফ্রম মাই সাইড। একটা পার্সোনাল রিকোয়েস্ট করব?”

“শিওর”

“এই ব্লাড রিপোর্টটা বাইরে যদি না জানান... আফটার অল, আন্টিল প্রুভড, মাই রেপুটেশন ইজ অ্যাট স্টেক। বুঝতেই তো পারছেন”

মাথা নাড়ল “আই ফুললি আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনি ভাববেন না স্যার। একমাত্র ইনভেস্টিগেশনের কয়েকজন ছাড়া কেউ জানবে না। একটা রিকোয়েস্ট। আপনি ওনার সম্বন্ধে যা জানেন, ব্রিফ করলে ইনভেস্টিগেশনে সুবিধে হবে”

স্মৃতির ঝাঁপি খুলল। রোমন্থনের জন্য নয়। বাঁচবার জন্য। কাঙাল মনটা স্নেহের পিপাসায় ছুটে বেড়িয়েছে। স্নেহের বাতাবরণ থেকে বাঁচাবার জন্য স্মৃতির টুকরো ঘটনাগুলো রোমন্থন করছে। পাওয়ার আশায় নয়। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। মৃত্তিকার আত্মহত্যার কারণ আন্দাজ করতে পারছে। ডিপ্রেশন। কিন্তু কেন? মধ্যবয়সে কেন-ই বা হতাশা?

গৌতম অধিকারী যাওয়ার আগে বলল “স্যার আই উইল কিপ ইউ ইনফর্মড অফ এনি ফার্দার ডেভেলপমেন্টস। অ্যান্ড কিপ দ্য ব্লাড রিপোর্ট সিক্রেট”

পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে আগ্নেয়গিরি বেরোতে চাইছে, পারছে না। কান্না-ভয় মেশানো যন্ত্রণায় ছটফট করছে চাতকের মতো, জলের আশায়। শান্তির জল। বর্ষার প্লাবনে নয়। বেদনার নিঃসঙ্গ মেরুতে। সেখানে কেউ নেই। চেনা পৃথিবীটা ক্রমশ দূরে। ধূসর অন্ধকারের বেলাভূমিতে। সহস্র শব্দের লহরা বাজছে বুকে, গভীর কোণে। পুঞ্জিভূত অসহায়তার নিঃশব্দ হাহাকারে। মন খুলে কথা বলার কেউ নেই। আজ সবার মধ্যেও একা। একদিন একাকিত্বে, ঝিঁঝির শব্দে, ধ্রুবতারা খুঁজছিল। আজ তা-ই দুর্বিষহ। মনে পড়ল বর্ণালীর কথা।

সেও তো একা। জীবনের ভার একাই বয়ে চলেছে নির্বিকার আনন্দে। বর্ণালী তার থেকে কত দৃঢ়। একমাত্র ওর কাছেই সাহারা পেতে পারে। একটু আশ্রয়।

"তোরা বিয়া কইরা পোলাপান লইয়া জীবন কাটায়ে দিবি, আর তদের সুখের সংসার দেইখ্যা আমার জীবনও কাটায়ে দিমু। ওতেই শান্তি"

শান্তি পেলে কেউ আত্মহননের পথ বেছে নেয়? অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের আলো দেখতে গিয়ে আবার অন্ধকারে। সাজানো বৃত্ত তাকে লক্ষ্মণরেখায় বদ্ধ করেছে। মুক্তি নেই। শান্তি নেই। প্রাচুর্যের মধ্যেও যন্ত্রণার মলম নেই।

মোবাইলে ফোন বর্ণালীকে "এখন কী করছ?"

"কেন অসীমদা? রান্না শেষ করে স্নান সেরে উঠলাম"

"আমি আসছি"

"এখানে খাবে নাকি?" কথা শেষ করার আগেই ফোন কেটে দিল।

বর্ণালী বুঝতে পারল না, অসীমদার কী হয়েছে।

দেড়টা বেজে গেছে। বর্ণালী ঠাওর করতে পারছিল না খাবে, না অসীমের জন্য অপেক্ষা করবে। কোনওদিনও অসীমদার মতো কাজের মানুষ এ-সময় আসে না। আজ কেন? ঠিক দুটোয় এল।

"খাবে তো? তোমার জন্য না খেয়ে বসে আছি"

প্রত্যুত্তর না দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল। ওর মনে হল অসীমদা স্বাভাবিক নয়। ছটফট করছে। খাবারের আয়োজন করে ডাকল "খেয়ে নাও। পেট চোঁচোঁ করছে"

অসীম নিঃশব্দে খাওয়ার টেবিলে। নীরবে খাওয়া শেষ করল। প্লেটগুলো কিচেন সিঙ্কে ফেলে অসীমদার পাশে "কী হয়েছে?"

কথা নেই। চুপচাপ বসে।

আবার প্রশ্ন করল "মৃত্তিকাদির কথা মনে পড়ছে?"

"ভুলি কী করে? একসঙ্গে বড় হয়েছি। মা জন্ম দিলেও মাকে কোনওদিন সেরকমভাবে পাইনি। মায়ের স্নেহ তো মৃত্তিকার কাছ থেকেই পেয়েছি। তখন পাশে কেউ ছিল না। একমাত্র ও ছাড়া"

"এখন আমরা আছি"

"আমরা কী একাকিত্বে থাকতে পারি?"

সত্যিই তো। কেউ কী কারও পাশে থাকতে পারে? বিজিতের যাওয়ার পর থেকেই বর্ণালী একা। সেভাবেই নিজেকে তৈরি করেছে। মনকে তৈরি করতে পারলে কারও প্রয়োজন হয় না। বর্ণালীরও হয়নি। বই, গান, ছবি - কত কিছু আছে। ইন্টারনেটে ঘরেই দুনিয়া হাতের মুঠোয়। জ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা। সময়ে বন্দি না হয়ে, তাকে মুঠোয় ধরেই বাঁচা। তাই করে এত বছর।

বর্ণালী হেসে বলল "আমি একলা থাকতেই অভ্যস্ত। আমার পাশে উনি আছেন। না-চাওয়ার সহায়"

বুঝতে পারল না "কাউকে তো প্রয়োজন মনের কথা বলার। তুমি কাকে বল?"

"নিজেকে"

চেনা বর্ণালী অচেনা। আগে তো এমন করে ভাবেনি। বর্ণালী বোধহয় একাকিত্বকে জয় করতে পেরেছে। যা সে এখনও পারেনি। কি বোকাই না অসীম। একা বারান্দায় অন্ধকারে ঝিঁঝির ডাকে সম্পূর্ণতার রাগ শুনতে চেয়েছে। দিক না জেনেও নক্ষত্র খোঁজার নেশায়, চেতনা নিয়ে খেলা করেছে। আরেক অসীমের সন্ধানে। পাশের ঘরে স্বর্ণালী। সুখস্বপ্নে স্বর্গ খুঁজছে মর্ত্যলোকের সীমায়।

"নিজেকেই এখনও যে চিনলাম না। মৃত্তিকার সঙ্গে বড় হয়েছি। এখন মনে হচ্ছে ওকেও চিনিনি"

"একথা কেন?"

"কাউকে না বলে পারছি না। তবুও তো কাউকে বলতে হবে। মৃত্তিকা কেন আত্মহত্যা করল, জানি না। আজকে একটা খবর পেয়ে আরও অবাক হলাম। পোস্ট-মর্টেমে ওর এইডস পাওয়া গেছে। কীভাবে এই রোগ এল সেটাও ধোঁয়াশা"

"আমি কী ডাক্তার না ছাই? বলব কী করে? আমার মনে হয় ও আপনাকে ভীষণ ভালোবাসত"

"কী বলছ তুমি বর্ণা!?"

"যা মনে হল, বললাম। কুকুরের সঙ্গে অনেকদিন থাকলেও অপত্যস্নেহ জন্মায়। ওর সঙ্গে বড় হয়েছেন। আপনাকে না ভালোবাসা কী সম্ভব?" বজ্রাঘাত। ভাবতে পারেনি। মনেও আসেনি। বর্ণালী অকপটে সত্যিটা বলল। বর্ণালী কী ঠিক! জানে না।

"আপনি এখানে কেন এসেছেন জানি। ডামাডোলের উত্তর খুঁজতে। অনেকদিন থেকেই আঁচ করেছিলাম। বলিনি। আজ না বললে অন্যায় হবে। মৃত্যুর কারণ কী, বলতে পারব না। ভালোবাসত, অকপটে বলতে পারি"

কত সহজেই বলে দিল। এর জন্যই কী অসীম এখানে? এই কথা শুনতে? নিখাদকে আবার কোমলে ফেরাতে? না কি, উল্কার স্বপ্নকে বেলাভূমিতে আনতে? অকপট সত্যকে অস্বীকার করতে পারছে না। হয়ত তাই। কিন্তু এর জন্যে আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? সেখানেই ধোঁয়াশা। চিন্তা থেকে দুশ্চিন্তা, মোহভঙ্গ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে। উত্তর জানা নেই।

বর্ণালী কোমল দৃষ্টি মেলে বলল "কিচ্ছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। এ আপনার সততার অগ্নিপরীক্ষা"

চৌদ্দ

আজ ৪ জুলাই। অ্যামেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। শুধু কী অ্যামেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্স? হয়ত বর্ণালীরও মুক্তির দিন। বিজিতের মৃত্যুদিন। নায়াগ্রা ফলসে এই দিনেই বর্ণালীকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে হারিয়ে গেছিল।

অন্ধকার ঘরে একা বসে হারমোনিয়ামের কি-বোর্ডের ওপর অন্যমনস্কভাবে হাত বোলাচ্ছিল। কত বছর পার হয়ে গেল। সম্বিত বড় হয়ে এখন কোচিং ক্লাসে। বর্ণালীর আঙুল সন্ধ্যাতারার নির্জনে একা বসে ছন্দ খুঁজছে – ফেলে আসা জীবন, আজকের জীবন, ভবিষ্যতের জীবন। কত স্মৃতি বিস্মৃতির অতল থেকে উঠে আসছে। ফুলশয্যা থেকে কালশয্যা জাগতিক বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে অস্তিত্বকে। জীবন-মৃত্যুর যুগ্ম স্পন্দন ঘূর্ণিতে আছড়ে ফেলেছে এপার-ওপারের সন্ধিক্ষণ। আঙুলটা সরগম থেকে নিখাদে, কি-বোর্ডে খেলে, থেমে গেল। সুর হারিয়ে গেছে। অন্ধকারে শিউরে উঠল। ভেতর থেকে বুকফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে গিয়েও থেমে যাচ্ছে। চোখে আষাঢ়ের মেঘ। আর কিছুক্ষণ। এর পরেই ভেসে যাবে। অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুট কান্নার সুর ‘দীপ নিভে গেছে মম নিশীথ সমীরে’।

কতদিন পর। গলায় সুর আছড়ে পড়ল। ছোটবেলার গানের তালিমের পরিণতি গুনগুন করা নিউ ইয়র্কের বাথরুমের সওয়ারে, কিচেনে। বিজিতের ছিল ফটোগ্রাফির নেশা। ক্যামেরা কাঁধে এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়ত। উইক-এন্ডে একসঙ্গে দু’জনেই। লং ড্রাইভে গেলে গাড়ির স্টিরিওতে গান। সংগীত পাখনা মেলতে চাইলেও, একান্তই তা নিভৃতে। সুর কখনও লয় হয়ে ফোটেনি।

আজ বহুবছর পর, বিজিতের স্মৃতিতে মন কেঁদে উঠল ‘...এসে তুমি যেও না, যেওনাকো ফিরে...’ ফিরে তো সবাইকে যেতেই হবে বন্ধন ছিন্ন করে আদি-অনন্ত বাসভূমিতে। সেটা কোথায়? বেলের শব্দে চমকে উঠল। কে, এই সময়? এখনও তো সম্বিতের আসার সময় হয়নি।

বিছানা ছেড়ে বসার ঘরের লাইট জ্বালিয়ে দরজার পাশে “কে?”

“আমি” অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। দরজাটা খুলতেই ভেতরে অসীমদা।

“হঠাৎ?”

“আজ বিজিতের মৃত্যুদিন। ভাবলাম তোমার পাশে থাকলে ভালো লাগবে”

মৃত্তিকাদির মৃত্যু বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। চাপা দুঃখের একটা আশ্রয় খুঁজছে। এসময় মানুষ ব্যথার সাথীকেই খোঁজে। অসীমদাও তাই। দুঃখটা এখন আর দুঃখ মনে হয় না। গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন বর্ণালী কাউকে খোঁজে না। ব্যথার ভার একাই বহন করতে শিখে গেছে। একমাত্র সম্বিত ছাড়া, ওর আর কোনও ইহলোকের বন্ধন নেই। সেও একদিন জীবন গড়তে চলে যাবে। পার্থিব বন্ধনের সমাপ্তি। তারপরই মুক্তি। সবার জন্য সবকিছু নয়। যদি তাই হত ওর সাজানো পৃথিবীটা হঠাৎই ভেঙে চুরমার হয়ে যেত না। অন্ধকারে দিয়া জ্বালাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেই বা কী লাভ? তার থেকে আঁধারের রূপে ডুব দেওয়াই ভালো।

অগোছালো শাড়িটা একত্রিত করে অন্যান্য লাইট জ্বালাতে ব্যস্ত।

“থাক না। কর্নার ল্যাম্পটা জ্বালালেই হবে” বাধা দিল অসীমদা।

আলোর রোশনাইতে অনীহা। বর্ণালীও তাই চাইছিল। রোশনাই থেকে দূরে থাকতে।

কিচেনের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। অসীমদা বাধা দিল “কিছু খাব না। চা-ও নয়” নিজের মনে আওড়ে গেলঃ

‘আঁধার আলোর একাকী নিভৃতে

পাশাপাশি বসে ভাগ করে নেব অমৃতে।
কালস্রোতের দুঃখ সে তো তাঁরই দান
তাকে জয় করে গাইব জীবনের গান’

দুঃখের ভারটা লাঘব করার জন্য বলল “কার লেখা কবিতাটা?”

“কী জানি। মনে নেই। নামকরা কবির নয়। কবে পড়েছিলাম”

কবিতা শুনে বর্ণালীর সুরের মূর্ছনাঃ

‘আমারে পড়িবে মনে যখন সে লাগি প্রহরে প্রহরে
আমি গান গেয়ে যাই এসে তুমি যেও না কো ফিরে...’

অসীম মুগ্ধ হয়ে শুনছিল “গেয়ে যাও। থেম না”

গান শেষ হতেই অসীমের তারিফ “বাঃ”

“বহুদিন পর গাইলাম”

“সেই কলেজ জীবন থেকে দেখছি। সুর তোমার ভেতরেই। প্রকাশের অবকাশ খুঁজছিল। আজ দুঃখে মুক্তি পেল। গানটা ছেড়ে দিয়েছিলে। আবার নতুন করে ধরতে পার-না বর্ণা?”

“জানি না। এতদিন মনে হয়েছিল হারানোর মধ্যেই বাঁচতে হবে। আজ মনে হচ্ছে এই গানই হয়ত মুক্তির পথ। এতদিন জানতাম না। আজ মনে হচ্ছে ওটাই বেঁচে থাকার রসদ। সম্বিত একদিন চলে যাবে। তখন কী নিয়ে থাকব?”

কর্নার ল্যাম্পের ফিকে আভা ঘরে সাইকাডেলিক আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে। তার ক্ষীণ রশ্মি বর্ণালীর মুখে। সেই আলোয় অবয়বটা দেওয়ালে সিল্যুটের মতো ছায়া সৃষ্টি করেছে। বোঝা যাচ্ছে না কোনটা আসল। কায়া না ছায়া? প্রত্যেকের দুটো সত্তা। একটা বাইরের কায়া। অন্যটা মনের ছায়া। প্রতিনিয়ত একে অন্যকে খুঁজছে, ছুঁতে, ধরতে, পেতে চাইছে। আলো-আঁধারির এই লুকোচুরি নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের যোগসূত্র খুঁজছে।

“আমরা সবাই নিজের মতো করে খুঁজছি”

“বলতে পারব না। অতশত ভাবিনি। আজ এতদিন পর কি-বোর্ডে হাত লেগে সুর বেরিয়ে এল”

“সুর তো আমাদের ভেতরে। বাজনার কী প্রয়োজন আছে?”

সুরটা ব্যথার। ফ্ল্যাশের মতো বিজিতের স্মৃতি অবচেতন থেকে চেতনায়। বিজিত খালি বলত ‘একটা দৃশ্য দেখলেই মনের ক্যানভাসে কম্পোজিশন শুরু হয়ে যায়। বাকিটা ক্যামেরায় বন্দি করা’

বিজিতের অনুপস্থিতি সেই রেশই নিয়ে এল। সুর থাকলে যেমন বাজনার প্রয়োজন হয় না, জীবনের মানে খুঁজে পেলে ব্যঞ্জনা নিরর্থক। এই আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলায় সেখানেই স্বপ্নের শুরু। অসীমের মনে হল দিয়া তো নিভে যায়নি। জ্বলে উঠেছে বর্ণালীর অবচেতনে। এখন চেনাটাই বাকি।

“তাহলে আর কী। কাল থেকে তালিম শুরু করে দাও”

“দেখি” বর্ণালীর দ্বিধা রূপান্তরিত সুর মূর্ছনায় ‘নিজের হাতে, নিজেই বাধা, ঘরে আঘাত বাইরে আঘাত’

মুগ্ধ হয়ে অসীম শুনছে। এ কী অজানার স্রোতে ভাসার ডাক? জানা-অজানার ব্যবধান মেনে নিতে পারছে না। মনে দ্বিধা। সংশয়। মাঝে কী কিছু নেই? সুর ব্যথাকে মুচড়ে দিচ্ছে। প্রশ্ন জাগাচ্ছে ভাবনায়। এপার-ওপারে, পৃথিবীর বাইরে না ভেসেও তো আলো-আঁধারির লুকোচুরি দেখা যায়। মর্ত্যলোকে আরেক অচেনা নক্ষত্র।

গান ছেড়ে বর্ণালী উঠে পড়ল “আসছি। বসো”

অসীম সোফায় গা এলিয়ে দিল। মৃত্তিকার মৃত্যু তাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। যা একদিন ছিল আঁধারের মধ্যে ঝিঁঝির ডাক, তা বাস্তবে কঠিন প্রশ্ন। মৃত্তিকা ইহজগতের কোন পৃথিবীর? একবারও মনে হয়নি, এই মেয়েটি তার অনাড়ম্বর জীবনে কিছু হারিয়েছে নিঃশব্দে, তবে মৃত্যু কেন? পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে

‘ড্রাগ ওভারডোজ’। ভেনিজ এক্সআর। সতেরোখানা ১৫০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট একসঙ্গে খেয়েছে। তার পরিণতি এক কম্পার্টমেন্ট থেকে অন্য কম্পার্টমেন্টে। এসব ঘটনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাইনামিক ফ্লুয়িড ইকুইলিব্রিয়ামের বহিঃপ্রকাশ? বিভিন্ন রূপে। সীমা-অসীমের দুই দিক যেন তারই পরিব্যাপ্তি। ভেনিজ এক্সআর। সেটা কী? ডাক্তার বন্ধুরা জানিয়েছে, ওটা ভেনলাফ্যক্সিন ওষুধের ট্রেড নেম।

নিজের চিন্তায় হারিয়ে গেছিল। সম্বিত ফিরতে খেয়াল হল বর্ণালী ফেরেনি। কোথায় বর্ণালী? সোফা থেকে উঠে অন্ধকার বেডরুমে যেতে কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। বর্ণালী কাঁদছে! পায়ের শব্দে নিজেকে সামলে নিল। লাইট জ্বালাতে যাচ্ছিল। বর্ণালী বাধা দিল “না অসীমদা। লাইট জ্বালিও না”

“কী হয়েছে বর্ণা? বিজিতের কথা মনে পড়ছে?”

বর্ণালী চুপ। পুঞ্জিভূত অনুভূতি আছড়ে পড়ছে অন্ধকার বিদীর্ণ করে বুকফাটা হাহাকারে। এখন কাউকে চায় না। একটা অনুরণন। চাওয়া-পাওয়ার সাগর পেরিয়ে দুঃখে একাকী হাঁটছে। শেষ না হওয়া দুঃখের ধারায় ভিজবে অসহায় ডানা ঝাপ্টিয়ে।

অসীম ফিসফিস করে বলল “আজ আসি বর্ণা। কান্নার মধ্যে নয়, গানের মধ্যে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা কর”

অসীম কখন চলে গেছে খেয়াল নেই। অন্ধকারে নিস্তব্ধতায় শান্তি। পূর্ণতা। একাকিত্বের থেকে বেশি পূর্ণতা কোথায়? মনে বারবার অসীমদার কথা ‘গানের মধ্যে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা কর’। হারানোর ব্যথা, সৃষ্টির মধ্যে উজাড় করে দেওয়ায়। তারার দ্যুতিই আগামীর আশ্রয়। একা ঘরে ভাসিয়ে দিতে চাইল দামাল ঝড়ের দাপটে অন্তহীন সময়ের সাগরে, পূর্ণতার শ্রাবণধারায় ভিজতে। শান্তির ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পনেরো

গোধূলির শেষ রশ্মি রডন স্ট্রিটের সাবেকি বাড়িগুলোর ফাঁকে হারিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার আকাশ প্রস্তুতি নিচ্ছে আর এক কর্মযজ্ঞের। সেখানে সুরের ব্যঞ্জনা নেই। আছে মহানগরীর নতুন রূপে সেজে ওঠার একক প্রয়াস। ব্যস্ত কলকাতার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রকৃতিকে পাওয়ার বিশেষ অবকাশ নেই। গাড়ি পার্ক করে আকাশচুম্বী অট্টালিকার লিফটে ঢোকা। অরুন্ধতীও লিফটে। টুয়েলভথ ফ্লোরে প্রতীকের ফ্ল্যাট।

মুম্বাই থেকে কলকাতায় এলে প্রতীক এখানেই ওঠে। পৈতৃক হিন্দুস্তান পার্কের বাড়িতে ওঠে না। এখানে একা প্রতীক অনেক বেশি স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ। সে কার সঙ্গে কখন দেখা করবে, নিজের হাতে। সামাজিক বেষ্টনীর বাইরে।

দরজাটা খুলে বলল "এস"

সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। ওপরের বোতাম দুটো খোলা। রবিবারের ছুটির মুডে। মুম্বাই থেকে এসে ফোন করেছিল "কাল সকালের ফ্লাইটে এসেছি। আজ তো তোমার ছুটি। বিকেলে কী করছ?"

"তেমন কিছু নয়। এ সপ্তাহে প্রচুর খাটনি গেছে। তাই রিল্যাক্স করা ছাড়া কোনও কাজ নেই"

"আমার ফ্ল্যাটে চলে এস"

"ঠিক ছ'টায়"

তখন ছ'টা। নীল জিনস সাদা আঁটসাঁট টপস। রুদ্রাক্ষের মালা। হালকা লিপস্টিকের প্রলেপ। প্রতীকের সাবেক বাঙালি বেশের পাশে আধুনিক পোশাকটা কনট্রাস্টিং।

সোফায় বসে বলল "তুমি আজ একেবারে বাঙালি"

"তোমরা এখানে সাহেব হতে চাও। আমি সাহেবদের দেশ ঘুরে এখন সম্পূর্ণ বাঙালি" মুচকি হেসে উলটো দিকের সোফায়।

"বাঙালি না ছাই। বাড়িতে আছ। পাজামা-পাঞ্জাবির চেয়ে কমফর্টেবল কী হতে পারে? আন্ডারওয়ার পরে তো রিসিভ করতে পারবে না"

কলকাতায় বড় হওয়া, তাই পুরনো অভ্যাস থেকে গেছে। দক্ষিণ কলকাতার বনেদি বাড়ির ছেলে। সে অর্থে বনেদি নয়। যেমন উত্তর কলকাতার জমিদার বাড়ি। বাবা স্বর্ণকমল চৌধুরী অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে উঠে এসেছিল। শুরু করেছিল স্টিভেডরিং, জাহাজ থেকে মাল খালাসির ব্যবসা। সেই ব্যবসা একদিন ফুলে ফেঁপে এত বড় আকার নিলো, এক চতুর্থাংশ কলকাতার মালিকানাই চৌধুরী পরিবারের। বড় ছেলে প্রভাত চৌধুরী শিক্ষার মুখ অতটা না দেখলেও, মেজ ছেলে প্রতীক আর ছোট ছেলে প্রদোষ শিক্ষার দিকে পিছিয়ে থাকেনি। প্রতীক সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাস। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল কমুনিকেশনে স্নাতক। তারপর বিদেশে পাড়ি। ইউনিভার্সিটি অফ সারে থেকে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন। ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স সেরে মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। পিএইচডি করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাবার দেহাবসানের খবর পেয়ে দাদা প্রভাতের চাপে, সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশে ফিরল।

এত পড়াশোনা করে মন চায়নি স্টিভেডরিং ব্যবসা নিয়ে পড়ে থাকতে। শিক্ষা কাজে লাগাতে দাদার হাতে ব্যবসাটা ছেড়ে মুম্বাইতে। প্রদোষ সেন্ট পলস দার্জিলিং থেকে পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতক। ইনস্টিটিউট অফ শিপ ব্রোকার্স ও লন্ডন স্কুল অফ ফরেন ট্রেড থেকে ডিপ্লোমা। কেন যে বাবা স্বর্ণকমল চৌধুরী তাকে পারিবারিক ব্যবসা থেকে বঞ্চিত করেন, আজও বুঝতে পারেনি।

যারা চৌধুরী বাড়ির সম্বন্ধে খোঁজ রাখে, অনেকেরই জানা। সঙ্গে এও জানা, স্বর্ণকমল চৌধুরী এক সময় কলকাতার মেয়র হয়েছিল। রঙিন মানুষ স্বর্ণকমল চৌধুরীর ভান্ডারখোলার বাগানবাড়িতে নামীদামি তারকা থেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠদের গৃহিণীর রঙিন মাতোয়ারা নিশিযাপনের কথাও কানাঘুষায় শোনা যেত। স্বর্ণকমলের মৃত্যুর পর, মিডিয়া সংবাদের মতো, সে সব এখন অবলুপ্ত স্মৃতি। কিন্তু যে ধোঁয়াশা আজও অজানা বাহিরমহলের কাছে, ছোট ছেলে প্রদোষের জন্মবৃত্তান্ত। স্বর্ণকমলের মৃত্যুর পর উইলে নামের উল্লেখ না দেখে, চমকে ওঠে প্রতীক। বাবা ব্যবসাটা বড়ছেলে প্রভাত ও মেজছেলে প্রতীকের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়। প্রতীকের তৎপরতায় এই ধোঁয়াশার আবরণ উন্মোচন।

"চা না কফি?"

সিগারেট ধরিয়ে অরুন্ধতীর জবাব "কফি। এক চামচ চিনি"

বাহাদুরকে হাঁক "দো কাপ কফি বনানা। মেরে লিয়ে ব্ল্যাক। ঔর মেমসাবকে লিয়ে এক চামচ চিনি। আজ জো সমোসে লায়া, উসে ভি গরম করকে দেনা"

যবে থেকে এই ফ্ল্যাটটা কিনেছে, বাহাদুরই তদারকি করে। নেপালে ব্যবসার কাজে গিয়ে পঁচিশ বছরের বাহাদুরকে নিয়ে এসেছিল। সেই থেকে এই রডন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের সব দায়িত্ব ওর। অরুন্ধতীর সঙ্গে পরিচয় কয়েক বছর আগে। ব্যবসায়িক সূত্রে নয়। অরুন্ধতী তখনও ফ্যাশন আনলিমিটেডে যোগ দেয়নি। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ড্রয়িংরুমে একদিন এক মধ্যবয়সি লোকের সঙ্গে বাবাকে সঙ্গে কথা বলতে দেখে। বাবা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল "আমার বন্ধু স্বর্ণকমল চৌধুরীর মেজ ছেলে প্রতীক। ইংল্যান্ডে মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছে। এখন মুম্বাইতে মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টসের বিজনেস"

বাবার পাশে প্রতীক। ফর্সা সুঠাম দেহ। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। গোঁফের সরু রেখাটিও সযত্নে শেভ করা। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে অরুন্ধতীর চোখে।

"জয়ন্ত তো কাস্টমস এক্সাইজে। বলিস না ওকে, যদি প্রতীকের টেন্ডারটা ক্লিয়ার করে দিতে পারে। আজকাল কত হাসপাতাল, ডায়গনেস্টিক সেন্টার হচ্ছে। সেই এরিয়ায় প্রতীক এক্সপ্যানশন করতে চায়। গভর্নমেন্টে তো আজকাল ঘুষ ছাড়া কোনও কাজ হয় না। প্রতীক এসবের মধ্যে নেই"

টেন্ডারটা পাস করে দিয়েছিল জয়ন্ত। সেই থেকে প্রতীকের সঙ্গে আলাপ। ঘনিষ্ঠতা অবশ্য পরে। ও মুম্বাই ফিরে গেছিল। ফোনে যোগাযোগ ছিল। বাবার শ্রাদ্ধে মুম্বাই থেকে এসেছিল। তখনও ওর স্ত্রী মাধুরী জীবিত। মুম্বাইয়ের মেয়ে। ওখানেই ওর পৃথিবী। স্বচক্ষে দেখেনি ওকে। আলাপটা ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছেছিল অনেক পরে।

কফি, সিঙাড়া টেবিলে নামিয়ে বাহাদুরের প্রশ্ন "সাব ঔর কুছ?"

"অভি নেহি। বাদ মে। বড়িয়া চিকেন পকোরে বনানা"

অরুন্ধতী সিঙাড়ায় কামড় দিল "বাঃ, বেশ। বৃষ্টি হলে আরও জমত"

বৃষ্টি, সিঙাড়া, গরম কফির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য মিল। মন বারবার ফিরে যায় কলেজ জীবনে। অকৃত্রিম দিনগুলো। এখন মেকি দুনিয়ায় হিসেবের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে দম ছটফট। সবাই লাভ-লোকসানের হিসেবে বন্দি। গালভরা নাম। এটাই জীবন। ছন্দহীন জীবনে জোর করে ছন্দ আনার প্রয়াস। অজ্ঞানতার রূপ। প্রতীকের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর কলকাতায় এসেছিল, দাদার কাছে পারিবারিক সম্পত্তির কেনাবেচার ব্যাপারে কাগজপত্র সই করতে। মনে তখনও প্রদোষের অনুপস্থিতি। পারিবারিক ব্যবসায় প্রদোষের অধিকার না থাকলেও, আর্থিক দিক দিয়ে বাবা উদার হস্তে দান করে গেছে। কেন এই বঞ্চনা বুঝে উঠতে পারেনি। চৌধুরীবাড়ির অনেক কাহিনির মতো প্রদোষের কাহিনিও কানাঘুষায় শোনেনি। উৎসুক মন খুঁজেছে এই রহস্যকে।

বাড়ির বহুদিনের পুরনো কাজের লোক হারুদার কাছে জানতে পেরেছিল আসল কাহিনি। বহুবছর আগে, স্বর্ণকমল চৌধুরী মধুপুরে ছ'মাসের জন্য সস্ত্রীক থাকতে গেছিলেন। তখনকার দিনে বনেদি বাঙালিরা হাওয়া বদলের জন্য পশ্চিমে বেড়াতে যেত। তখনকার পশ্চিম, আজকের ঝাড়খণ্ড। পাত্র আর জয়ন্তী নদীর মাঝে,

দেওঘর ডিসট্রিক্টের শহর মধুপুরে স্বর্ণকমল চৌধুরীর সুবিশাল অট্টালিকা। সেখানেই প্রদোষের জন্ম। হারুদাও ওদের সঙ্গে গেছিল দাদাবাবু বৌদিমনির দেখভাল করতে। হারুদার আজ অনেক বয়স। স্মৃতিশক্তিও ক্রমশ ফিকে। যাচাই করার দ্বিতীয় ব্যক্তি খুঁজে পায়নি।

নেশাগ্রস্ত হারুদা পাকা চুলে হাত বুলিয়ে বলেছিল "দাদাবাবু প্রদোষকে তার ব্যবসা দিয়ে যাবে কোন দুঃখে? প্রদোষ তো বৌদিমনির ছেলে নয়"

বুঝতে পারেনি হারুদা নেশার না বিস্মৃতির ঘোরে।

"তার মানে?"

"দাদাবাবুর সঙ্গে গেছিলাম রাজপথে পাটনা মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেই শিখা বড়ুয়া প্রদোষের জন্ম দেয়"

"কে শিখা বড়ুয়া?"

"শিখা বড়ুয়ার নাম শোনেননি? তখনকার দিনের অহমিয়া ছবির এক নম্বর নায়িকা। দাদাবাবুকে ভীষণ ভালোবাসত। দাদাবাবু গৌহাটি গেলে ওনার বাড়িতেই উঠত"

"তাহলে মা?"

"বৌদিমনি সব জানতেন। ভীষণ ভালোমানুষ ছিলেন। দাদাবাবুর ইচ্ছা মেনে নিয়েছিলেন। তাই ছ'মাস দাদাবাবুর সঙ্গে মধুপুরে ছিলেন। কলকাতায় ফিরলেন প্রদোষকে কোলে করে। সবাই জানল, প্রদোষ এ বংশেরই সন্তান"

"তবুও তো প্রদোষ আমার ভাই"

"বইকি"

"যখন সামাজিক স্বীকৃতি দিলেন, সম্পত্তির ভাগ নয় কেন?"

"বোধহয় দাদাবাবুর সঙ্গে বৌদিমনির কোনও চুক্তি হয়েছিল। আমি জানি না"

কৌতূহলে সুড়সুড়ি দিয়ে আরেক চুমুক। বাবার রঙিন জীবনযাপনের কথা অজানা নয়। তার রেশ যে বাড়িতে বর্তমান - ভেবেই সবকিছু গুলিয়ে গেছিল। হারুদা ঠিক বলছে তো? বয়স হয়েছে। মাঝেমধ্যে অনেক কিছু গুলিয়ে ফেলে। নেশার ঘোরে আবোল-তাবোল বকছে না তো?

"শিখা বড়ুয়া এখন কোথায়?"

"বছর দশেক আগে মারা গেছে"

"প্রদোষ জানে সে কথা?"

"না। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। মারা যাওয়ার আগে হয়ত দাদাবাবু বড়কর্তাকে বলে থাকতে পারেন। বলতে পারব না"

প্রতীকের মনে কৌতূহল। এতজন থাকতে হারুদা তাকেই বলল। "আমাকে বললে কেন?"

"আমি আর ক'দিন? যাবার সময় তো হল। তুমি এই চৌধুরীবংশের হয়েও, এ বাড়ি থেকে আলাদা। এদের ব্যবসায় তোমার অংশিদারিত্ব থাকলেও, তোমার মাথাব্যথা নেই। তোমাকে ছাড়া তো আর কাউকে বলতে পারব না। কেউ না জানলে এই চৌধুরীবংশের ইতিহাস অজানা থেকে যাবে। আর কোনও প্রশ্ন কোর না। একা থাকতে দাও"

হারুদাকে একা থাকতে দিয়ে চলে এসেছিল। মনে ব্যথা। সামাজিক রূপের আত্মপ্রকাশ চিরাচরিত সত্য হয়ে নব বেশে। যুগ পাল্টেছে। কিন্তু চরিত্রের ব্যঞ্জনা পাল্টায়নি। সমাজেকে ঠুলি পরিয়ে কেউ সারা জীবন নিষ্কলুষ কাটাতে পারে! ধ্রুব সত্য মিশে যায় মিথ্যের চোরাবালিতে। মিথ্যের ওপর ভর দিয়ে উড়ছে সামাজিক প্রগতির ফানুস। সেখানেই স্বীকৃতি, জীবন, পরিতৃপ্তি। চেতনার অগ্রগতি মেকি খোলসের সিন্দুকে বন্দি। এতে সুখ আছে। অহম আছে। কিন্তু শান্তি কী আছে? প্রদোষের জন্য ভীষণ কষ্ট হয়েছিল।

সিঙাড়া কফি শেষ। চিকেন পকোড়া বাহাদুরের হাতে ম্যারিনেট হচ্ছে "হোয়াট ড্রিংক উড ইউ প্রেফার?"

রবিবারের সন্ধেবেলার অবশ্যম্ভাবী উপকরণ। আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের অঙ্গ।

অরুন্ধতী সিগারেটে জ্বালিয়ে বলল "জিন উইথ ফ্রেস লাইম সোডা"

"বাহাদুর রেডি করো। সেদিনের কথা আমি ভুলতে পারি না"

ধোঁয়া হাওয়ায় ছুড়ে অরুন্ধতী "কোন দিনের"

"যখন আমার ম্যালেরিয়া হয়েছিল"

পারিবারিক সম্পত্তির ব্যাপারে মাধুরী মারা যাওয়ার পর কলকাতায় এলেও, সে আর হিন্দুস্তান পার্কে ওঠেনি। এখানেই উঠেছিল। এখানেই সে বেশি স্বচ্ছন্দ। সাবলীল। এটাই তার নিজস্ব পৃথিবী। বড় মেয়েটা তখন মুম্বাইতে পড়ছে। ছোট মেয়েটা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে। প্রতীক কাউকেই বিরক্ত করতে চায়নি। প্রচণ্ড জ্বরে সন্ধেবেলা কাঁপুনি। মাথায় দারুণ যন্ত্রণা। ভীষণ দুর্বল লাগছিল। বাহাদুর ছাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ নেই। দাদাকে বিরক্ত করতে চায়নি। প্রদোষ দেশের বাইরে, সিঙ্গাপুরে।

অরুন্ধতীকে ফোন "জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে"

বেশি কিছু বলতে হয়নি "এখুনি আসছি"

ছুটে এসেছিল তৎক্ষণাৎ। টেম্পারেচার ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। তাড়াতাড়ি নিয়ে গেছিল বেলভিউতে। ঋতব্রত মৈত্রের রোগটা ধরতে অসুবিধা হয়নি। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে প্রতীকের পাশে দিনরাত। প্রথমে এনকেফেলাইটিস সন্দেহ হয়েছিল। ব্লাড রিপোর্টে ম্যালেরিয়া প্রমাণিত হওয়ায় কিছুটা নিশ্চিন্ত। একটু সুস্থ হতেই আর নার্সিংহোমে থাকতে চায়নি। ফ্ল্যাটে ফেরত। চব্বিশ ঘণ্টার নার্স থাকলেও, অরুন্ধতীর ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা। শীর্ণ দুর্বল প্রতীককে গা স্পঞ্জ, বাথরুমে নিয়ে যাওয়া, খাওয়ানো, সময়মতো ওষুধ দেওয়া, ব্লাড টেস্ট। কী না করেছে। মাধুরী কখনও এত করেছে কি না মনে করতে পারে না।

রুগ্ন প্রতীক ঠাট্টা করত "আগের জন্মে কী আমার স্ত্রী ছিলে?"

"মনে হয় না। এখন ভেবে কী লাভ?"

"এত কর কেন আমার জন্যে?"

উত্তর দেয়নি। বাহাদুরকে খাবার আয়োজনের তদারকি করতে দিয়ে, সিলিং ফ্যানের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে। ঈশ্বর যখন সাহায্যের হাত বাড়ান, তখন এমনিভাবে কাউকে পাঠিয়ে দেন। ঈশ্বরের নিয়ম জীবনের ক্ষুদ্র প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

গ্লাসটা প্রতীককে দিয়ে বলেছিল "খেয়ে নাও"

"এটা কী?"

"ইলেক্ট্রাল ওয়াটার। ইলেক্ট্রলাইটস ঠিক করার জন্য ডাক্তার খেতে বলেছে"

এই সেই অরুন্ধতী। চেনা নক্ষত্রের নাম নিয়েও অচেনা। বহু দূরের তারা। দেখা যায়, বোঝা যায় না। পাওয়া যায়, অথচ চেনা যায় না। অনুভব করলেও ধরে রাখা বাতুলতা। চেনা সুরের অচেনা মূর্ছনা। আবছায়া ক্যানভাসে নতুন ছবি।

অরুন্ধতীর জিন উইথ লাইম কর্ডিয়ালে চুমুক। সে নক্ষত্রের মতোই সান্ধ অভিসারে। উদাসী। স্মৃতিময় অতীতের আলেয়ায়। কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো চুল ছুঁয়ে যাচ্ছে মৃত ভালোবাসা। ছায়াপথ ডাকছে অজানা শপথে। রডন স্ট্রিটের একফালি আকাশে চেয়ে চাঁদের আলো-আঁধারে ইঙ্গিতে দিচ্ছে শপথের। অন্ধকার থেকে আলোর, না আলো থেকে অন্ধকার, না কি আলো-আঁধারির যুগলবন্দি? জানতে কেউ চায় না। মুহূর্তটা জানার নয়। ভেতরে অনুভবের গুঞ্জন। ইহলোকের মায়াবী লালসা হাতছানি দেয়। রক্তমাংসের মানুষ নিরালায় মিলিত হতে চায় রিপুর আবেগে। বর্তমানের অচেনা শপথে। মাধুরী বিগত অতীত। জয়ন্ত দুঃস্বপ্নের জীবন। স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন ভরা হিসেব-নিকেশের বাইরে একটুকরো মুহূর্ত। ভাগ করে নিতে চায় অমৃত বা গরলে। চিকেন পকোরা ঠান্ডা, চাওয়ার উষ্ণ উত্তাপের পাশে। শেষ না হলে, ডিনার কখন? সারারাত আবেগের আগরবাতি জ্বললেও, অরুন্ধতীর সংসার আছে।

লাগাম টানতে বলল “অ্যাম আই থিংকিং ইন দ্য সেম লাইনস লাইক ইউ”

কয়েক মুহূর্ত। জবাব দিল না অরুন্ধতী। ফিসফিস করে বলল “প্রব্যাবলি ইয়েস”

অজানা ছায়াপথে ধুধু মাঠ পেরিয়ে রাস্তাটা বাঁক নিল। সন্ধে পথ করে দিচ্ছে, ধীর শান্ত পায়ে, ছলছল কলকল বওয়া খরস্রোতা নদীর ডাকে। চেনা অথচ নতুন করে দেখা অজানা শপথে।

যোলো

অনেকদিন পর আজ সন্ধেবেলা কোনও পার্টি নেই। বিজনেস মিটিংও নয়। কাজেও মন বসাতে পারছে না। কোথা থেকে কী হয়ে গেল। বারান্দার বেতের সোফায় গা এলিয়ে। আজ ঝিঁঝিঁপোকার ড্যাক শুনতে ভালো লাগছে না।

রাত্রির শব্দ মোচাড় দিচ্ছে ব্যথায়। বুঝতেই পারেনি, মৃত্তিকার সমবেদনায় অন্য রাগ। এখন মনে হচ্ছে এতকাল বাইরে থেকেই ওকে দেখেছে। পেট্রাপোলে মায়ের মৃত্যুর পর মৃত্তিকাই তার জীবনে দ্বিতীয় নারী। মামির গঞ্জনার মধ্যে সান্ত্বনার বাতাবরণ। শান্তির আচ্ছাদন। তখন এর বেশি ভাবার অবকাশ ছিল না। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের স্বপ্ন।

"চরণ হুইস্কি দিয়ে যা" অসীম হাঁকল।

অনেক আর্দালি, কাজের লোকের মধ্যে চরণ খুব কাছের লোক। বারান্দায় এসে বলল "কী দেব দাদাবাবু?"

"সিঙ্গল মল্ট। দেখ তো গ্লেনমর‍্যাঙ্গি আছে কি না?"

মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। দাদাবাবু সচরাচর হুইস্কি খায় না। যদিও বাড়িতে সব ড্রিংকস মজুত। অতিথিদের জন্য। একা ড্রিঙ্ক করে না। নিশ্চয়ই দাদাবাবুর মন ভালো নেই। কিছু না বললেও, চরণ এতদিন দেখছে। বুঝতে ভুল হয় না। কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাসী। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে সামনের অন্ধকারে। ল্যাম্পপোস্টের আলোটা ধূসর, অন্ধকারের রক্ষী। সন্ধ্যার ঘূর্ণিঝড় নিভে যাওয়া দিয়াকে বৃথাই জ্বালাতে চাইছে। বুঝে উঠতে পারছে না দীপটা কোথায়। মৃত্তিকার নশ্বর স্নেহের বিচ্ছেদে? না কি, বর্ণালীর কণ্ঠে দুঃখের টিমটিম সলতে? ব্যথার ঢেউ বুকে। জয়জয়ন্তী না রামকেলি? চিরন্তনকে চেনার অভিলাষে।

"তোমার সম্বন্ধে টিভিতে বলছে" স্বর্ণালী ছুটে বারান্দায়।

"কী?"

অসীমের হাত ধরে টানল "এস তো"

চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধার অসীম চ্যাটার্জির গোপন জীবনের কাহিনি যে টিআরপি বাড়াবে, এ কথা বিক্রেতা মিডিয়া ভালোই জানে। পলিটিক্যাল নেতাদের অর্থহীন প্রলাপ লোকের মন টানে না। সেলেবদের হটসিটে বসালেও তাদের নিরর্থক আবেগ বিক্রি হয় না। যে করে হোক ভুঁইফোঁড় অগুনতি চ্যানেল চালাতে হবে। নইলে কত লোক বেকার হয়ে যাবে। তাই কেচ্ছা খোঁজো। কেচ্ছা বেচো। মিডিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অসীম–মৃত্তিকার লোকচক্ষুর আড়ালে প্রেম কাহিনি নিয়ে 'স্টোরি' করলে অনেক বেশি খাবে, ভালোই জানে।

অসীম স্বর্ণালীর দিকে তাকাল। মুখটা কঠিন থেকে কঠিনতর আকার ধারণ করছে। এরপর সমাজে মুখ দেখাবে কী করে?

টিভির প্রেজেন্টার বলে চলেছে "এ এক অদ্ভুত কাহিনি। চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধার অসীম চ্যাটার্জি আর বেলগাছিয়া মিল্ক-কলোনিতে অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী মৃত্তিকার গোপন প্রেমের। মৃত্তিকা আজ আর নেই। যদিও তার কোনও মৃত্যুকালীন জবানবন্দি পাওয়া যায়নি, তবু ওখানকার লোকদের সঙ্গে আমরা কথা বলে জেনেছি, অসীমবাবুর ওখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বিশেষজ্ঞ মহলের মতামত মৃত্তিকার সুইসাইডের সঙ্গে অসীমবাবুর যোগাযোগ আছে..."

নিজেদের স্টোরিকে বিশেষজ্ঞ মহলের নাম দিয়ে চালাবার প্রয়াস। কে এই বিশেষজ্ঞ মহল? কেউই জানে না। তবুও অসীমকে শুনতে হচ্ছে তার কেচ্ছা, বিকৃতরূপে। স্বর্ণালীকেও। হয়ত বা বর্ণালীকেও। চিঠিতে তেমন কিছু লেখা ছিল না। শুধু 'অসীম যাতে আমায় ভুল না বোঝে' পঙক্তি দিয়ে বানানো গল্প তৈরি করা যায়! যদি সৎ কাজে মস্তিষ্কটা উর্বর হত নতুন প্রতিভা বিকশিত হতে পারত। গৌতম অধিকারী বলেছিল '"আই ফুললি আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনি ভাববেন না স্যার। একমাত্র ইনভেস্টিগেশনের কয়েক জন ছাড়া কেউ জানবে না' চিঠির বয়ানটা মিডিয়ার হাতে গেল কী করে? বুকটা ছলাৎ করে উঠল। টাকা দিয়ে যখন সব কিছু কেনা যায়, একটা চিঠি কিনতে কতক্ষণ? এরা তো ব্যপারি। খবরের দূত নয়।

অসীম স্বর্ণালীর মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। টিভি এমনিতেই শোনে না। এসব শোনার প্রয়োজনও নেই। স্বর্ণালীকেও নয়। এখন চাই গ্লেনমর‍্যাঙ্গি। অন দ্য রকস। দোলাচলে একটু আশ্রয়। খ্যাতির সঙ্গে বিড়ম্বনা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে, কারও অজানা নয়। এখন এসব নিয়ে ভাবারও সময় নেই। মনটা সুদূর মরুভূমির তেপান্তরে, খুঁজে বেড়াচ্ছে ভিসুভিয়াসের মুক্তি। ছোটবেলায় পুকুরপাড়ে ধ্রুবতারা খুঁজত। কিছুদিন আগেও অন্ধকারে ঝিঁঝিপোকার শব্দে খোঁজার চেষ্টা করছিল। আজ ধ্রুবতারার রঙটা পালটে গেছে জ্বলন্ত লাভার আঁচে। মহাশূন্যের পরিমণ্ডল ছেড়ে অন্তরের মরুভূমিতে তৃষ্ণার জল চাই। নিরাকারের মধ্যে নয়। আকারের সংস্পর্শে। চুমুক, নেশা না হলে ভুলবে কী করে?

"এরপর লোকের সামনে মুখ দেখাব কী করে?" ঝাঁঝালো স্বর্ণালী ঘর থেকে বারান্দায়।

"কেন?"

"টিভিতে তোমাকে নিয়ে কী সব যা-তা বলছে"

"বলতে দাও। তুমি তো আমাকে জানো। এটা সাজানো গল্প ভালো করেই জানো"

"আমি জানলে তো হবে না। লোকে মানবে?"

"তাতে তোমার আমার কী আসে যায়? ওদের তো কিছু বিক্রি করতে হবে। তাই করছে। এখন আমাকে নিয়ে। ওরা করলে কী করতে পারি?"

কাফতান পরা স্বর্ণালী ওপাশের বেতের চেয়ার টেনে বসল। আলো আঁধারিতে পুরপুরি দেখা না গেলেও, ওর মুখ থমথমে। এবার ঝড় উঠবে।

"কজনে বিশ্বাস করবে?"

"কে বিশ্বাস করল না করল বয়েই গেল। তুমি করলেই হল"

সব বললেও মৃত্তিকার এডসের কথা তো আর বলতে পারছে না। গৃহযুদ্ধ থেকে বিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। একমাত্র বলতে পেরেছে বর্ণালীকে। অসীমের মনে হল, এত বছর বিয়ের পরও সে স্বর্ণালীর কাছে অস্বচ্ছন্দ। বর্ণালীর কাছে বেশি সহজ, সাবলীল। বৈবাহিক বন্ধনে যে জড়তা আছে, অন্য সম্পর্কে সংযম অনেক কম।

স্বর্ণালী ভ্রুকুটি পাকিয়ে বলল "এত লোক থাকতে, ও তোমার নাম লিখে গেল কেন? তুমি কি বোঝ, কী আসে যায়?"

সত্যিই তো। কী আসে যায়?

অসীম কৈফিয়তের স্বরে বলল "কী করে বলব?"

"বাঃ। মরার আগে তোমার নাম লিখে গেল আর তুমি বলতে পারবে না?" স্বর্ণালী ক্ষিপ্ত।

"আমি কী করে বলি? ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। তুমি জানো, মামির সংসারে ভালো করে খাওয়াও পেতাম না। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়ার সময় খিদেতে পেট মুচড়ালে, মেয়েটা খাবার এনে দিত" হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে আকাশে চেয়ে বলল "কখনও কিছু চায়নি। হারানো মাকে খুঁজে পেতাম। তাই বারবার ছুটে যেতাম। ফেলে আসা জীবন তাড়া করে বেড়াত"

"আত্মহত্যা করল কেন?" স্বর্ণালী স্থির তাকিয়ে।

অসীম দীর্ঘশ্বাস ফেলল “যদি জানতাম...”

স্বর্ণালী ব্যঙ্গ করে বলল “তোমার জানার দরকার নেই। মিডিয়া খোঁজ নিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেবে”

এ যেন অন্য স্বর্ণালী। তার ঘরের লক্ষ্মী নয়। সামাজিক স্ত্রী। মূঢ় সমাজের পরিমণ্ডল অতিক্রম করতে পারেনি। স্বল্প জ্ঞানের অলীক পৃথিবীতে নিজের ফাঁদেই বন্দি। এর বাইরে বেরতেও চায় না। শুনতেও চায় না। যে মিডিয়ার কথায় স্বামীর চরিত্র নির্ণয় করে, তাকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। এরপরে কথা বলার মানেই নেই। ঢকঢক করে বেশ কিছুটা গিলে নিল। কলেজ জীবনের হার্টথ্রব, আজ বাস্তবের ভার। এক পক্ষের সন্দেহ অপরের বিড়ম্বনা।

অরুন্ধতী অসীম সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাতে স্বর্ণালী প্রশ্ন করেছিল “অরুন্ধতীকে কী তোমার পছন্দ? ওর দেখি তোমার সম্বন্ধে একটু বেশি আগ্রহ” সেখানেও সেই একই জবাব।

“আমি কী করতে পারি? অরুন্ধতী আমার সম্বন্ধে কী ভাবছে, সেটা বড় নয়। তুমি কী ভাবছ, সেটাই সব। অন্যরা কে কী ভাবছে, তাই নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই”

ভাষাটা সেদিনের। যুক্তিটাও। মাঝে সামাজিক টেনাপড়েন সেই যুক্তিকে আজ শূলে চড়িয়েছে। যার ওপর, তার কোন হাত নেই, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা বাতুলতা। স্বর্ণালীর থেকে চোখ ফিরিয়ে, চেয়ে আছে বাংলোর বাগানে। যেন ও থাকতেও নেই। সেদিন অরুন্ধতীকে নিয়ে যে প্রশ্ন, আজ মৃত্তিকাকে নিয়েও একই। কত তফাত। বয়েস কী চিন্তাধারাকে সংকীর্ণ করে ফেলেছে? সামাজিক বলয়ের মিথ্যে আচ্ছাদন? যে আচ্ছাদন ছেড়ে বেরতে চেয়েছে সনাতনের খোঁজে, সে-ই অজান্তে গ্রাস করছে তাকে।

ল্যাম্পপোস্টের তলায় পড়ার সময় মৃত্তিকা বলত “ওই আলোয় কিসু দ্যাখতে পাস?”

“হ্যারিকেনের চেয়ে ভালো”

“বাবারে কই তোর জইন্য একটা হ্যঝাক কিনা দিতে”

“তেলের খরচ কে দিব?” স্পষ্ট উত্তরে হকচকিয়ে গেছিল ফ্রক পরা মৃত্তিকা। সত্যি তো, তেলের দাম আসবে কোত্থেকে? ভাবেনি। ছেলেটার কষ্ট দেখে অনুকম্পা হয়েছিল।

যার এত মমতায় ভরা মন, তার বিকিরণকে কেন নিজের একাকিত্বে বন্দি করে রাখল? স্বর্ণালী উঠে গেছে। জানে, এরপর ও আর কিছু বলবে না। মাথায় ঘুরছে, সমাজে মুখ দেখাবে কী করে?

সম্পর্কের মেকি সংজ্ঞাগুলোর ব্যাকরণ ছিন্নভিন্ন ঝড়ের ঝাপটে। বাইরের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর! লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে চেনা লক্ষ্মণরেখাকে। ভাসিয়ে দিতে পারে সংসারের বিধি নিষেধের বেড়া। এখন কালপ্রবাহে ভাসা ছাড়া উপায় নেই। ওখানেই মুক্তি।

মনে হচ্ছে, বর্ণালী সেই মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল বিজিতের প্রয়াণের পর। অসীম বোঝেনি। স্বর্ণালী বোঝেনি। স্বপ্ন দেখতে গিয়ে তাকে যদি বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে, তার মূল্য কী?

মৃত্তিকা বলত “জানোস তর অনেক স্বপ্ন আসে। আমার নাই”

“ক্যান?”

“স্বপ্ন মানেই ত দুঃখ। স্বপ্ন মানেই ত বেদনা। আমার দুঃখ-বেদনা ভালো লাগে না”

তাই কী আড়ম্বরের পৃথিবী থেকে গুটিয়ে নিয়েছিল বেলগাছিয়ার নিঝুম আস্তানায়? যদি সেটাই শান্তির বাতাবরণ হয়, তবে সেখানে কীসের অপূর্ণতা? কিংবা অসম্পূর্ণতা? সেখানেও কেন না-পাওয়ার হাহাকার? চিরবিদায়ের ডাক?

সবকিছু ধোঁয়াশায় আঁধার। হুইস্কির নেশা চড়েছে। চিন্তাগুলো ঝাপসা। মিডিয়া কী বলল, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। স্বর্ণালী কী ভাবল তাকেও ভাগ্যের হাতে ছুড়ে দিয়েছে। এতদিনের শিক্ষা, বীক্ষা জড়ানো অনুভূতি আত্মবোধকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। বিশাল শূন্যতায় দোদুল্যমান। জ্ঞান আর অজ্ঞানের মাঝে ভাসছে।

মুক্তি নেই! পরিত্রাণ নেই! অন্ধকার জীবন।

বর্ণালীর অভয়বাণী 'সব ঠিক হয়ে যাবে। এ আপনার সততার অগ্নিপরীক্ষা' এই দ্বন্দ্ব ধোঁয়াশায় শান্তির জল।

সতেরো

সলতেটা জ্বালাতে গিয়েও বারবার নিভে যাচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটও নেই। অথচ চেষ্টা সত্ত্বেও জ্বলছে না। অর্থের বর্ণচ্ছটাও জ্বালাতে পারেনি অস্তিত্বের দীপশিখা।

অরুন্ধতীর দুনিয়াটা সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে জয়ন্ত নেই। তেলে জলে খাপ খায় না। বিয়ের পর স্বপ্নের ফানুস নিভতেই অনুভব করেছিল জয়ন্ত। তাই বারবার সাজাতে চেষ্টা করেছে নিত্য নতুন ছাঁচে। তেল-জলের ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছে আপ্রাণ। তবুও অদৃশ্য দেওয়াল লক্ষ্মণরেখার মতো। হাজার চেষ্টা করেও ভেদ করতে পারছে না। ওর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের দুনিয়ায় প্রবেশ করতে পারেনি। বিয়ে করেও অরুন্ধতী অধরাই।

প্রিন্সেপ ঘাটে নীলোৎপল টাকার ব্রিফকেস দিয়ে বলেছিল "আর কিছু লাগবে, স্যার?"

জয়ন্তকে ইতস্তত করতে দেখে ওর বুঝতে অসুবিধা হল না, টাকা নয়, জয়ন্ত আরও কিছু আশা করছে। এ লাইনে বহুদিন। কোন দেবীর কী পুজো দিতে হয় ভালোভাবেই জানা। আমতা করে বলল "স্যার, রক্তিমা আপনাকে ফোন করবে। কোথায় ওকে যেতে হবে বলে দেবেন। সেরকম প্রয়োজন হলে, হোটেলের ঘরও বন্দোবস্ত করে দিতে পারে" মুচকি হাসি "কমপ্লিমেন্ট ফ্রম মাই সাইড। দেখবেন স্যার, পারমিটটা যাতে পাস হয়ে যায়"

অনেকদিনের বাসনা। মুখ ফুটে নীলোৎপল বলে ফেলেছে। শুনেই মনে আনন্দ। রক্তমাংসের মানুষ তো। ইচ্ছে থাকলেও, কোনও মেয়েকে মুখ ফুটে প্রস্তাবের সাহস নেই। সে তো যে সে নয়। কমিশনর অফ কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ।

"তাহলে কী কনফার্মড হতে পারি?"

"নিশ্চয়ই" জয়ন্ত তোতলাচ্ছে।

অরুন্ধতীর সঙ্গে অ-দৈহিক বন্ধনের সংসারচক্র প্রাণহীন। অর্থহীন জীবন। বৈবাহিক পরিচয় ছাড়া বাকিটা শূন্য। বাড়ির বিলাসবহুল সামগ্রীর মতো। ক্লীবলিঙ্গ। অরুন্ধতীর গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার নেই, সামর্থ্যও নেই। ঘরে ফেরার বা বাইরে যাওয়ার সময়ও অজানা। কৈফিয়ত তো দূরের। বহুদিন আগে আমতা করে বলেছিল "কোথায় কখন যাও, বলে গেলেও পারো"

অরুন্ধতী লিপস্টিকের প্রলেপ বুলিয়ে, লেদার হ্যান্ডব্যাগ তুলে বলল "তোমার জেনে কী হবে? তুমি তোমার দুনিয়ায় থাক। জালি কামাই তো ভালোই। যাতে শান্তি পাও তাই কর। আমি কী করছি, তাতে তোমার কী? তুমি মর্মও বুঝবে না"

কী করে বোঝাবে কামানো ছাড়াও পুরুষের অনেক চাহিদা। কামনা-বাসনা যে বিবাহিত জীবনে নেই, অনেক আগেই অরুন্ধতী বুঝে গেছে। তবু মা, টুবলুর মুখ চেয়ে তাসের ঘরটা সাজিয়ে রেখেছে। ঢালের মতো। নিজেকে ছেড়ে দিলে পরজন্মটা ভাগাড়ে, অজানা নয়। জয়ন্তর পজিশন থেকেও ফায়দা লোটা যায়। জয়ন্ত যেখানে খুশি থাকুক। সে তার ভূমণ্ডলে।

ভেতরে বাসনার তুষের আগুন। রক্তিম ওড়না, দোপাট্টায় রক্তিমা। নিয়ে গিয়েছিল ওকে বারুইপুরের লেকল্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবে। সান্ধ্য বর্ণচ্ছটায়, রক্তিমার উদ্ধত যৌবনকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না। ভাববার উপায়ও ছিল না, কেন এই শিক্ষিত মেয়েটা মনোরঞ্জনের দূত? কর্পোরেট সেক্টরের নেপথ্য ইতিহাস রচনায় নিবিষ্ট। টাকা? ওখানে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। খুশিই হয়েছিল। কলকাতার পাঁচতারা হোটেলের লবিতে চেনা

লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঘুঘু নীলোৎপল জানে, কোথায়, কাকে, কী ভাবে, আপ্যায়ন করতে হয়।

রক্তিমা আগেই ফোন করেছিল "বারুইপুরের কান্ট্রি ক্লাব চেনেন তো? চলে আসবেন। লাল সালওয়ার কামিজ পরে লাউঞ্জে থাকব। চিনতে অসুবিধা হবে না। না পারলে মোবাইলে ফোন করবেন। নম্বরটা সেভ করে নিন"

ক্লাবে ঢুকে জয়ন্ত এদিক-ওদিক চাইছে। একগাল মিষ্টি হেসে লাল চেলি ওড়নায় "আমি রক্তিমা। ওপরে আসুন"

বোধহয় আগেই ঠিকঠাক করা। ঘরটাও। বুঝতে অসুবিধা হল না মেয়েটি আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে রেখেছে। জয়ন্ত ড্রাইভার নিয়ে আসেনি। রাতের অভিসারের সাক্ষী রাখতে চায়নি। অরুন্ধতী বলে গেছে আজ রাতে ফিরবে না। তাই ফ্রি। প্রশ্ন করার কেউ নেই। এমনিতেও ওর গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করে না। কাজের লোক টুবলুকে যথাসময় খাবার দিয়ে দেবে।

"আসতে রাত হবে। খেয়ে শুয়ে পরো" টুবলুকে বলে এসেছে।

"কী খাবেন, হুইস্কি, বাকার্ডি না ভডকা?" রক্তিমার প্রশ্ন।

জয়ন্ত বেশি হুইস্কি খেতে পারে না। শরীরে নেয় না। হার্ড ড্রিঙ্কস না খেলে সাহস দৃঢ় হবে কী করে? উত্তেজনা বাড়াতেও সহায়ক। রঙিন ভাবে দেখতে পারবে রক্তিমাকে।

"বাকার্ডি কোকের সঙ্গে মিশিয়ে"

"বাকার্ডি, কোক আর বরফ পাঠিয়ে দাও। সঙ্গে মিক্সড ককটেল স্ন্যাক্স" রিসেপশনে অর্ডার দিল "সব খান তো?"

সোফার কোনায় জড়সড় জয়ন্ত। মাথা নাড়ল। অচেনা মেয়ের সঙ্গে একা হোটেলে এই প্রথম। সঙ্কোচ হবেই। মনে পড়ে না, অরুন্ধতী ছাড়া আর কোনও মেয়ের সঙ্গে নিভৃতে বসেছে কি না। রোমাঞ্চর সঙ্গে ভয়। অনেকদিনের অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। কলেজ জীবনে কোনও মেয়ের দিকে তাকাতেও পারেনি। নেহাত অরুন্ধতী সম্মতি দিয়েছিল। নইলে আজও অবিবাহিত থেকে যেত। জীবনটা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ছেড়ে প্রবেশ করেছে অচেনা আগামীতে। তাই আশঙ্কা। সরকারি কর্মচারীর সংসারী বিবেক ছাড়া আর কিছু থাকে কি না জানা নেই। চেয়ারের স্বীকৃতিই সর্বার্থে মাপকাঠি। মেক হে হোয়াইল দ্যা সান সাইন্স। ফর টুমরো ইজ জাস্ট এ বেড অফ এম্পটি রোসেস।

সোফায় গা এলিয়ে রক্তিমা বলল "এত সঙ্কুচিত কেন? রিল্যাক্স। লজ্জার কিছু নেই। সব পুরুষেরই চাওয়া থাকে"

এক পেগ ভডকার পর সাহস বেড়ে গেছে। চিকেন ককটেল স্যসেজ এগিয়ে বলল "নিন। বেশ ভালো খেতে"

প্রফেশনাল হলেও আন্তরিকতা মন ছোঁয়। কথার মধ্যেই প্রকট সে শিক্ষিত। চলনে-বলনে রুচির ছাপ। পাঁচ ফুটের কিছু বেশি, মেদহীন, অভিজাত লালিত্য। দেহের সম্ভারে প্রাচুর্য। টুবলু হওয়ার পর, এই শরীরে শুধু মাতৃত্বই দেখতে পেয়েছে। এত বছরে দূর থেকে অরুন্ধতীর জামাকাপড় ছাড়ার মধ্যেই বাসনার তৃপ্তি। কখনও 'সায়া-ব্রা আনতে ভুলে গেছি। ড্রেসিং টেবিলের স্টুলে রাখা' বাথরুমের দরজার ফাঁক দিয়ে তোয়ালে জরানো অরুন্ধতীকে দেখা। এতদিন পর নাগালে। জীবন্ত স্যসেজের সামনে, প্লেটের স্যসেজের কতটুকু স্বাদ?

রক্তিমা সোফা ছেড়ে পাশে। আরেকটু বাকার্ডি গ্লাসে ঢেলে কোকের বোতল টানতে গিয়ে ওর স্তনের ছোঁয়ায় কাঠ জয়ন্ত।

"ভালো লাগছে?"

"কেন লাগবে না? বেশ তো"

"কাকে? আমাকে না ড্রিংককে?"

এসি ঘরে উত্তাপ ছড়াতে চাইছে। বুঝতে পারছে, ওর জড়তা না কাটালে, মিছিমিছি সময় নষ্ট। রাত পার হয়ে যাবে ওকে চাঙ্গা করতে। ওকেও তো বাড়ি ফিরতে হবে। নীলোৎপলের আদেশ। জয়ন্ত নড়েচড়ে বসল। রাম ততক্ষণে মস্তিষ্কধামে। অন্য সময়, কোনও মেয়ের প্রতি লালসার হাত বাড়াতে সাহস করত না। ভডকার নেশায় সাহস ব্যক্তিত্বকে দখল করল। জড়তা ক্রমশ শিথিল। রক্তিমার লাল পোশাক আগুন ধরাচ্ছে নেশার মাদকতায়। অ্যালকোহল দাহ্য পদার্থ। এতদিনের চাওয়া নাগালের মধ্যে... পিঠের শিহরণ শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। রক্তিমা মোমের পুতুলের মতো গলে মিশে যাচ্ছে আবেশে। জ্বলছে লাল চেলি, চোরাবালি। ওর চোখে হাসি। ভঙ্গিমায় সারল্য, আরও কাছে।

এই চাওয়া এই পাওয়া।

জীবনের আসল স্ফুরণ।

ইচ্ছে হল চিৎকার করে অরুন্ধতীকে বলে 'দেখে যাও আমার দাম। তোমার চেয়ে হাজারগুণ টগবগে সুন্দরী সব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ইউ ক্যান গেট লস্ট ইন দ্য হেল অফ ইওর ওয়ার্ল্ড। আই শ্যাল হ্যাভ মাইন, ইন মাই ওন ওয়ে। অ্যান্ড নাউ'

রক্তিমার ওড়না সোফায়। পেছন ফিরে বলল "চেনটা খুলে দিন তো"

জয়ন্ত হকচকিয়ে "কো... কো...কোন চেন?"

রক্তিমা হাসল। চোখে ইশারা।

"কোনটা আবার? কামিজের" হাসল "জামাটাও খুলতে দেবেন না..."

কথাগুলো চঞ্চল শিশুর অথচ কানে সহস্র বিস্ফোরণ। ভলক্যানো দেহ ছাড়িয়ে কানে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। শিশুকে জোরে ধমক দিলে যেমন, তেমনি গুটিয়ে গেল। অন্য দিকে তাকিয়ে। রক্তিমা ঘুরে বসল "এত শাই কেন? টেক ইট ইজি"

জয়ন্তর শিশুমন বলতে চাইল 'ভয় করছে', কিন্তু আওয়াজ বেরল না। নির্বাক চেয়ে রক্তিমার দিকে। মনে আশ, মুখে লাজ, ফ্যালফ্যাল। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে লাজ ভাঙতে?

দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাকেও তো বাড়ি ফিরতে হবে। এরপর শেষ ট্রেনটাও মিস হবে। শুরু হবে কৈফিয়তের বন্যা – 'এত দেরি হল কেন?' 'বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও গিয়েছিলি?' 'মোবাইলে একটা ফোন করেতে পারতিস' 'দিনকাল তো ভালো নয়' মধ্যবিত্ত মায়ের চিন্তার কী শেষ আছে?

রক্তিমা হঠাৎ জামাটা খুলে ফেলল। নেটের অন্তর্বাস। জয়ন্ত তাকাতে গিয়েও পারল না। উন্মুক্ত জীবন হাতছানি দিচ্ছে সম্ভোগের পসরা সাজিয়ে... ডাক দিচ্ছে কনজিউমারিজম। বাসনার রুদ্ধ কক্ষে হাতছানি দিচ্ছে প্রলোভনের ভাষায়। চাহিদা শ্যেন পাখির মতো, চোখদুটোকে বারবার ফেরাচ্ছে রক্তিমার দেহসৌষ্ঠবে। মুগ্ধ, লোলুপ দৃষ্টিতে খোলা বুকের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে।

রক্তিমা বিভিন্ন ক্লায়েন্টে অভ্যস্ত। নানা নামকরণও শুরু করেছে। এক-একজন, এক-একটা ক্লাস। এ লোকটি 'লোভী আর ছিঁচকে' ক্লাস। আর দেরি করা যায় না। জয়ন্তর জামার বোতাম খুলতে শুরু করল। যা ভেবেছে, তাই। লোভী ছিঁচকেটার সাহসী হওয়ার চেষ্টা। হাত পড়ছে দেহে। রক্তিমার হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠল। উপরি টাকায় সংসারের ভার বহন করতে না জানি কত কিছুই করতে হয়। আবেগের বন্যা, মস্করা। আর দেরি নয়। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য হ্যাঁচকা মেরে লোকটাকে কাছে টানল। জয়ন্ত হারিয়ে যাচ্ছে উচ্ছ্বাসের প্লাবনে। সব বাধা কাটিয়ে পৌরুষ দেখা দিচ্ছে।

প্রবল ঝড়ে, বিপুল জলে ছোট্ট নৌকা যেমন দিশেহারা হয়ে ওলটপালট খায়, রক্তিমার দাপটে, সে-ও দিশাহারা। ওকে আঁকড়ে উচ্ছ্বাসে ভাসতে চাইছে। এক ঝলক। অরুন্ধতীর অবয়ব দূরের লাইটহাউসের মতো নিমেষে বিলীন। তবুও রক্তিমাকে দেখতে পাচ্ছে না। একজনকেই দেখছে... তার জীবনের ধ্রুবতারাকে... সাতপাকের সামাজিকতা, সিঁথিতে সিঁদুর, অগ্নিসাক্ষীতে বরণ করা একমাত্র নারীকে। সে আর কেউ নয়। সংস্কারে ঘেরা জীবনসঙ্গিনী।

বাস্তবে অব্যবহারের শঙ্কা তাড়া করছে রক্তিমার নগ্ন রূপে। ওর নিরাবরণ দেহ ম্লান। উচ্ছ্বাস, লালসা স্তিমিত। বাকার্ডির ঘূর্ণিঝড়ে হারিয়ে গিয়েও অনুভবে করল, আজ সে চূড়ান্ত অসহায়। হাল-দাঁড়হীন নৌকোর মতো অক্ষম। ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তে দিশাহারা। প্রাণপণে চেষ্টা করল হারানো জাদু শেষবারের মতো ফেরাতে। শুধু আজকের দিনে, এই মুহূর্তে। বৃথাই... কানের কাছে হিসিয়ে উঠল রক্তিমা। এলোমেলো ঝড়ে, নৌকা টালমাটাল। হাজার চেষ্টা করেও সে দাঁড় বাওয়ার শক্তি পেল না। নিথর হালভাঙা নৌকোটা সরিয়ে আনতে চাইল গরম নিঃশ্বাসের আঁচ থেকে। কিন্তু দুরন্ত বানে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল সব সমেত। জ্বলন্ত শরীরটাকে প্রাণপণে নিজের করে নিতে পারল না। অন্তত একবারের জন্যেও।

রক্তিমা সরে গেল। উঠে, জামাকাপড় হাতে নিয়ে বলল “আপনি যে ঢোঁড়া সাপ তা কী নীলোৎপল জানে?”

জয়ন্ত বিছানায় বসে, নগ্ন। নিঃশব্দ, নিথর, মাথা হেঁট।

শেষ ট্রেনটা ধরতে হবে। নইলে মা চিন্তায় সারা রাত ঘুমোতে পারবে না। কথা না বাড়িয়ে, জামাকাপড় পরে, দরজাটা টেনে বেরিয়ে গেল।

আঠেরো

‘সব যে হয়ে গেল কালো
নিভে গেল দীপের আলো’

দূর থেকে ভেসে আসা গান নয়। বিছানায় খালি গলায় সুর ভাঁজছে বর্ণালী। বহুবছর পর বিজিতের মৃত্যুদিনে দুঃখের মধ্যে হারানো সুর খুঁজে পেয়েছে। তা ভেতরে নতুন প্রেরণা জাগাচ্ছে। ছোটবেলা হাতছানি দিচ্ছে অন্য অবলম্বন আঁকড়ে পথ চলার। সঙ্গত নেই। হারমোনিয়াম নেই। অন্ধকারে সুর ভাঁজছে নতুন পথের দিশায়। কিছুদিন পর সম্বিতও ভবিষ্যতের খোঁজে চলে যাবে। তখন কী নিয়ে বাঁচবে? কান্নায় বরের মতো ঈশ্বর সরস্বতীর বীণা তুলে দিয়েছে। এতদিন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। বিজিতের মৃত্যুদিনে বিরহের রোশনাই। পৌষের জড়তা কাটিয়ে দেখতে পাচ্ছে বসন্তের উন্মাদনা। সুর পেখম মেলছে বাধনছাড়া পাখির মতো অন্তরে। লুকোচুরি নেই। আলো-আঁধারি নেই। নির্মল পবিত্র আত্মা শান্তির তৃষায় সুরের স্তবে একাকী।

পরে অসীমদা ফোন করেছিল “নতুন করে রেওয়াজ শুরু কর”

তার ভেতরে আলো-আঁধারি কুহকের মায়া কাটিয়ে উজাড় করা সাধনায় ডুবে পাওয়ার রেশ।

কলিং বেল! আবার কে? ঘরে ঢুকল অসীমদা।

“না বলে?”

ক্লান্ত দেহটাকে সোফায় এলিয়ে বলল “বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। তাই চলে এলাম”

“বেশ করেছ। স্বর্ণালী জানে?”

“না, জানাইনি”

খটকা লাগল। আগে বহুবার এসেছে। স্বর্ণালীকে না জানিয়ে নয়। কোথায় ছন্দের গরমিল। হাউসকোটের কোমরদড়ি বেঁধে বলল “কী হয়েছে অসীমদা?”

“কিচ্ছু নয়। ভালো লাগছিল না। তাই...”

“কারণটা লুকিয়ে যাচ্ছ” কিচেনে ঢুকল চা করতে। কিংবা ওকে প্রকাশের অবকাশ দিতে। মৃত্তিকার মৃত্যুতে এখনও বিচলিত। মেনে নিতে পারছে না। মিডিয়ার প্রচার ওকে বিচলিত করেছে, তা নয়। মিডিয়া হাইপের ৪৮ ঘণ্টা।

চা এগিয়ে বলল “কী হয়েছে, আমাকে বলবে?”

অসীম চুপ। পাশের সোফায় বসে বলল “স্ক্যামে বিচলিত হওয়ার মানুষ তো তুমি নও”

“তুমি দেখেছ?”

“না দেখার কী আছে? সবাই দেখেছে” নিটোল চোখের দৃষ্টি ওর দিকে ফিরিয়ে বলল “নতুন কিছু শান্তিতে থাবা দিয়েছে”

ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা। স্বর্ণালী তো এভাবে কখনও বলেনি। বাইরেটাই দেখেছে। অন্তরে ঢোকার চেষ্টাও করেনি। বর্ণালী স্বভাবজাত স্নিগ্ধতায় সেখানে সহজেই প্রবেশ করেছে। মৃত্তিকার মৃত্যু তাকে দ্বিতীয়বার মাতৃহারা করেছে। এডসের ব্যাপারটা এখনও ধোঁয়াশা। রিপোর্টটা ঠিক তো? কোথাও কি ভুল হয়েছে? তার থেকে বেশি করে স্বর্ণালীর মানসিক বিচ্ছেদ নাড়া দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এতদিনের সামাজিক বলয় মূল্যহীন। চেনা গণ্ডির বাইরেটা যন্ত্রণাদায়ক। ভবিতব্য তাকে সেদিকেই ঠেলছে। বিচ্ছেদ যন্ত্রণা না হলে মানসিক উত্তরণ

হয় না। স্বর্ণালীর মানসিকতা অন্য মেরুতে হলেও এই মুহূর্তে ওকেই সবথেকে বেশি কাছে চেয়েছিল। সেখানেই শূন্যতা।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল "তুমি এত বড় সাম্রাজ্য চালাও, এখনও দাঁড়াতে শিখলে না?"

সুপ্ত অজানা আশঙ্কায় আঘাত করল কথাটা। অবচেতনের অসহায়তাকে এতদিন নাম, যশ, প্রতিপত্তির আভরণে সামাজিক বলয়ে সাজাবার চেষ্টা করেছে। কথাটা মূল্যবোধের ভিতে নাড়া দিল।

ঘোরের মধ্যে বলল "ঠিক বলেছ বর্ণা। এতটা পথ পেরিয়ে বুঝতে পারছি এখনও দাঁড়াতে শিখিনি। চলা তো দূরের"

"দুঃখের মধ্যেই তো আমরা চলতে শিখি। আমিও শিখেছি। তুমি এখন শিখছ"

যন্ত্রণায় আশ্চর্য মলম। এতদিন ধরে ওকে দেখছে। মনে হচ্ছে, ওকে কোনওদিনও ঠিকভাবে চেনেনি। আজ ওকে নতুন করে জানছে। অবচেতনের দৃষ্টিতে।

"শিখছি কী?"

"দুঃখ মানেই ঈশ্বরের শিক্ষা। তুমি বোঝ, চাই না বোঝ" সোফা থেকে উঠে পড়ল "একটু বস। টুক করে স্নান করে আসি"

কলেজ জীবন থেকে ওকে দেখছে। চিরকাল সাধাসিধে। আজও তাই। এটাই তার আত্মচেতনাকে জাগ্রত করেছে। প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি নয়। এই বোধহয় ওকে কাছ থেকে চিনতে পারছে।

"আমার দিদি"

প্রথম আলাপ কলেজ জীবনে, যেদিন স্বর্ণালী ওকে শশিভূষণ দে স্ট্রিটের বাড়ি নিয়ে যায়। কচি কলাপাতা রঙের সুতির শাড়িতে, হারমোনিয়াম লক করে নমস্কার করেছিল "আসুন আসুন। কোথায় যে বসতে দিই" প্লাস্টিকের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়েছিল।

লাজুক অসীম ভালো করেও দেখেনি ওকে। তবুও ওর সৌন্দর্য স্নিগ্ধ আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভোরের দূর্বা ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু। যার অনাড়ম্বর উপস্থিতিই ভোরের কুয়াশার মতো, প্রত্যুষের সূর্যের সোনালি আলোর প্লাবন ছড়ায়।

প্রলেপহীন মুখে ওর দিকে মুচকি হেসে বলেছিল "বাড়ির হবু জামাই বলে কথা। আদর আপ্যায়ন করতেই হবে। ধুলো মেখে যা ছিরি করে এসেছিস। যা, যা, স্নান করে আয়। ততক্ষণ তোর হবু বরকে আপ্যায়ন করছি"

বাবা তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। মা অসীমের জন্য জলখাবার তৈরিতে ব্যস্ত। আহা রে! ছেলেটা কলেজ করে প্রথমবার বাড়িতে এল। কিছু না দিলে চলে।

বর্ণালী উল্টোদিকের চৌকিতে পা দুলিয়ে বলেছিল "মশাই, খুব জোর প্রেম করে বেড়াচ্ছেন। বোনটিকে পছন্দ তো? সারাদিন আপনারই নামগান শুনছি"

অসীম লাজুক, মাথা নিচু "চালচুলোহীন ছেলেটার সঙ্গে জড়িয়ে আপনার বোন কেন যে বিপাকে পড়তে চায়, বুঝতে পারি না"

"বুদ্ধি। আপনার মতো ইনটেলিজেন্ট ছেলে প্রেসিডেন্সিতে ক'জন? বুদ্ধি শিক্ষা থাকলে পৃথিবী গড়তে কতক্ষণ"

বুদ্ধিমান শিক্ষিত অসীম আজ অস্থিরতায় ভাসছে। বর্ণালীর কাছে রোশনাইয়ের খোঁজে ছুটে এসেছে, ভালোই বুঝতে পারছে। নিজের অন্ধকারে আলো খুঁজতে? না বর্ণালীর ভেতরের ঝড়ে নতুন প্রলেপ টানতে? মানুষকে দুঃখের দিনে চেনা যায়। বর্ণালীকেও চিনতে পারছে। চেনা লোকগুলো অচেনা। অচেনা লোককে নতুন করে চেনা। এই জীবনের গতিই জানা-অজানা, চেনা-অচেনার খেলা।

অচলাবস্থা থেকে সরার জন্য ও ফিরতেই বলল "একটা গান গাইবে?"

ভেজা চুল মেলে অন্ধকার কোণে তাকিয়ে নিজেকে সঁপে দিল সুরের মায়াজালেঃ

‘আকাশপানে হাত বাড়ালে তাহারও তরে
জানি নাইকো তুমি এলে আমার ঘরে’

বর্ণালী অন্য জগতে চলে গেছে। সে যেন ঈশ্বর খুঁজছে সুরেঃ

‘অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানে
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানে
সকালবেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি
ঘরভরা এই শূন্যতারই বুকের পরে’

বুঝতে পারছে গানের ঘোরে হারিয়েছে, একাত্ম শব্দ-সুরের সঙ্গে। পার্থিব জগৎ থেকে বাইরে। উজাড় করা চেতনার অন্য লোকে। গান কখন শেষ, খেয়াল করেনি। আলো-আঁধারির আবছায়াতে ওরা হারিয়ে গেছে নিজেদের ব্যথার অন্ধকারে। ওরা কাঙ্ক্ষিত ধ্রুবতারা খুঁজছে।

নিস্তব্ধতা ভেঙে অসীম বলল “তোমার সুরে জীবনকে খুঁজে পাচ্ছি। অন্য আরেক সুর। তা কী ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি?”

বর্ণালী চুপ। উত্তর না দিতে দেখে বলে চলল “মানুষের আরেকটা দিক। এতদিন দেখা হয়নি। আজ নতুন করে দেখছি”

“আমি তো পূজা পর্যায়ের গান গাইছিলাম”

“জীবন-মৃত্যু, প্রেম-পূজা, জানা-অজানার সুর। দুঃখের মধ্যেই সৃষ্টি। কম বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝি, এসব পাওয়া না-পাওয়ার দুই দিক”

বর্ণালী সরলভাবে বলল “জীবন মৃত্যুর কোনও ভাগ নেই। বিজিত আমার কাছে এখনও জীবিত। সেদিন ৪ জুলাই, ওকে অনুভব করলাম সুরে একা অন্ধকারে। তুমিও তো আলোর দুনিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র। অথচ এখন অন্ধকারে শান্তির গান শুনতে চাইছ”

সহজ সরল ভাষায় গূঢ় অনুভূতি বলে যাচ্ছে। যেন সীমা-অসীমের ভেদাভেদ মুছে দিতে। ইহলোক, পরলোক, আলো-আঁধারির দুই মেরু।

“অত তত্ত্ব বুঝি না। সুর ভাষা আমাকে নিয়ে যায় না-চেনা, না-জানা জীবন-মৃত্যুর আলোকে। যখন গানে জীবনকে খুঁজে পেলাম, তুমি দোটানায় দিশাহারা। দেখেছ, দু’জনেই কিন্তু খুঁজছি”

“তবুও, খোঁজার মধ্যে তফাত আছে”

উত্তর না দিয়ে উঠে পড়ল “তফাতটা এখানেই। তোমার খিদে না পেয়ে থাকতে পারে, আমার পেয়েছে”

কিচেনে হারিয়ে গেল। অসীম সোফায়, ওর কথার মানে বোঝার চেষ্টায়। এতদিন বর্ণালীকে দেখেছে শালি হিসেবে। এখন দেখছে নিজস্ব সত্তায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী রূপে। মোবাইল বেজে উঠল। স্বর্ণালী “তুমি কোথায়?”

“বর্ণালীর বাড়িতে”

“ওখানে কী করছ?”

“এই এসেছিলাম”

“মৃত্তিকাদি গেছে। এখন দিদির ঘাড়ে চেপেছ” স্বর্ণালী ফোন কেটে দিল।

হিসেব যে কখন বেহিসেবে পরিণত হয়, কে জানে? বর্ণালী ঠিকই বলছিল। জীবনটাই যখন এতটা এলোমেলো, তখন মৃত্যু আর জীবনের মধ্যে তফাত কোথায়? মরণের বাস্তবতা কী তবে অন্ধকারের দিকেই!

উনিশ

মিঃ পূর্ণেন্দু সেন অরুন্ধতীরকে ইঙ্গিত করল "বস"

ও মিঃ নাগের চেম্বারে ঢুকে কিছুটা আশ্চর্যই হয়েছিল। সোহমকে এখানে আশা করেনি। ফ্যাশন আনলিমিটেডের অফিসে ফোন করে পূর্ণেন্দু সেনই ডেকেছিলেন "হেড অফিসে এক্ষুনি চলে এস। আর্জেন্ট মিটিং"

খুব ইম্পরট্যান্ট না হলে মিঃ সেন ফোনে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেন। রেগুলার মিটিংগুলো আগে থেকেই প্রি-প্ল্যান্ড। মিঃ সেনের তো একটা ব্যবসা নয়। অনেক ব্যবসার মধ্যে ফ্যাশন আনলিমিটেড কণা মাত্র। অত সময় নেই এর পেছনে দেওয়ার। পূর্ণেন্দু সেনের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উলটো দিকে সোহমের পাশে বসল। ওরা যে পূর্বপরিচিত কোনও ইঙ্গিত দিল না। ব্যবসায়িক মিটিং-এ ব্যক্তিগত সম্পর্কের জের সমস্যা ডাকতে পারে। অরুন্ধতী ফ্যাশন আনলিমিটেডের বাইরে অন্য কোনও সমস্যায় জড়াতে চায় না। সোহমও অরুন্ধতীকে না চেনার ভান করল। লেবু চিপড়ানোর ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোলা থাক নিভৃত নিশির অন্দরে।

পূর্ণেন্দু সেন আলাপ করিয়ে দিল "একে বোধহয় চেন না। সোহম বসু। অনেক খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেলের মালিক"

বুঝেতে পারছিল না, সোহমের সঙ্গে মিঃ সেনের কী দরকার যেখানে অরুন্ধতীর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

মিঃ সেন সরাসরি বলল "আমাদের অর্গ্যানাইজেশনে ক'জন মেয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে চায়?"

"কে না চায়? সেভাবে কাউকে সিঙ্গল আউট করা যায় না। ইন ফ্যাক্ট অল"

পূর্ণেন্দু সেন জোর দিয়ে বলল "কারা চটজলদি উঠতে চায়?" ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে বলল "তিন কাপ কফি। একটা চিনি ছাড়া"

অরুন্ধতী বলল "আপনি কী স্পেসিফিক নাম্বার্স চাইছেন?"

"লেটস অ্যাসুম ফাইভ ফর নাউ"

"ইন দ্যাট কেস আই হ্যাভ টু সিঙ্গল দেম"

"বেটার ডু দ্যট। অ্যান্ড প্রিটি সুন। আই উড বি নিডিং দেম শর্টলি। অ্যান্ড সোহম উইল মেক শিওর দে গেট ম্যাক্সিমাম লাইমলাইট"

সম্মতিতে মাথা নাড়ল সোহম। অরুন্ধতী বুঝতে পারছে না অন্দরের খেলাটা কী? প্রশ্ন জমাট বাঁধলেও সাহসে কুলোচ্ছে না। বিশাল সেন সাম্রাজ্যর একটা ছোট্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী মাত্র। আদার ব্যপারিদের জাহাজের খবরে কী লাভ? তবু কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কিছু প্রশ্ন তো উঁকিঝুঁকি দেয়।

পূর্ণেন্দু সেন উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল "তাহলে অরুন্ধতী তোমার অর্গ্যনাইজেশন থেকে আট জনকে শর্টলিস্ট করে ফেল। দে মাস্ট বি গুড লুকিং অ্যান্ড সেক্সি"

সম্মতিতে মাথা নাড়ল অরুন্ধতী "ওদের রোলটা কী, যদি বলেন। মানে, ওদের তো সেভাবে ব্রিফ করতে হবে"

"এন্টারটেনমেন্ট। এন্টারটেনিং ভেরি পাওরফুল মেলস"

ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা। কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না! এ কোন দুনিয়ার ঠিকেদারি এতদিন করছে! মনে পড়ে, পূর্ণেন্দু সেন যখন ফ্যাশন আনলিমিটেডের স্বপ্ন দেখছিলেন, পরিচালনা করার জন্য একজন দক্ষ লোকের জন্য অনেককেই বলেছিলেন। অনুগত, বিশ্বস্ত, প্রগ্রেসিভ স্বাধীন ভদ্রমহিলা। টুবলুর তখন চার বছর।

ঘরে এক মেরুদণ্ডহীন স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনে অনীহা, দম হাঁসফাঁস করছিল। সারাদিন সময় কাটে না। তখন কলেজের বন্ধু প্রতীক্ষা খবরটা এনেছিল "কর্তা বলছিল, ওর বস পূর্ণেন্দু সেন একটা ফ্যাশন কোম্পানি খুলবে। একজন দক্ষ মহিলা খুঁজছে। করবি?"

"কী চাকরি?"

"কোম্পানির এমডি। মাইনে দারুণ। সঙ্গে পার্কস গাড়িও"

সরাসরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছিল পূর্ণেন্দু সেন। হ্যান্ডসেক করে বলেছিল অরুন্ধতী ভেবেছিল, মন্দ কী? ঘরে সময় নষ্ট করার থেকে কিছু করা ভালো। টুবলুও বড় হয়ে উঠেছে। স্কুলের বাইরে, কাজের লোকরাই দেখভাল করে। জয়ন্তর থেকে হাতখরচ না নিয়ে, নিজের পরিশ্রমে যদি কিছু কামানো যায়, ক্ষতি কী? সময়টাও কেটে যাবে। "আমার অনেক বিজনেসের মধ্যে এদিকে সময় হয়ে উঠবে না। তোমাকেই সবকিছু একা করতে হবে। ইউ ক্যান বি রেস্ট অ্যাসিওরড। অবশ্য ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকআপ আমার থেকে পাবে। আই ওয়ান্ট দিস অর্গ্যানাইজেশন টু ফ্লারিস লাইক মাই আদার বিজনেসেস"

"আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট স্যার" বহুদিন পর অরুন্ধতী পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছিল। অস্তিত্বের নতুন আভরণ। শিশুকে বড় করার মতো তিলতিল করে ফ্যাশন আনলিমিটেডকে গড়ে তুলেছিল। রিক্রুটমেন্ট, গ্রুমিং, প্লেসমেন্ট সব একা সামলে মার্কেটিং-এর ধ্বজা উড়িয়ে আদৃত শিশুর প্রতিষ্ঠায়। এমনকী সোহমের সঙ্গে অঙ্ক কষে নিয়ে গেছে অ্যাটলান্টিকের ওপারে। প্রিয় সন্তান আজ দিশাহারা। নোঙরটা কী হারিয়ে গেছে? মিথ্যে পাড়ের কল্পনায় ভাসছে অকুল সমুদ্রে? সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস বলল "ঠিক বুঝলাম না স্যার"

"না বোঝার কোনও কারণ নেই। এই বিশাল এম্পায়ার চালাতে অনেককেই খুশি রাখতে হয়। ইটজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ মডার্ন এক্সিটেন্স। এভরিথিং বয়েলস ডাউন টু ইকুয়েশনস। সার্ভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট। এটাই দুনিয়ার নিয়ম"

মাই ফুট। জাগতিক নিয়ম সত্যি কী, আজও বুঝে উঠতে পারল না। সেরকমভাবে বোঝারও চেষ্টা করেনি। সবেতেই মনপ্রাণ দিয়ে একশো ভাগ উজাড় করে দিয়েছে। ধ্রুবতারাটা ঠিক করে নিলে পথ চিনতে অসুবিধা হয় না। ওটাই আলো দেখায়। তখন পেছনের অন্ধকারে চোখ ফেরানোর সময় হয় না। সেই আলোর পিপাসায় আজ প্রথম হোঁচট। একা চলা হলে, হোঁচট খেলেও সামলে নিতে পারত। কিন্তু এর সঙ্গে ফ্যাশন আনলিমিটেডের সঙ্গে নিজের ক্রেডিবিলিটি অনেক কিছু জড়িয়ে। অফিস পার্টিতে, কে কার সঙ্গে ঢলাঢলি করল, কিংবা ব্যক্তিগতভাবে উঁচুতে ওঠার লোভে কী করল, সে নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু সে তো জেনেশুনে তাদের বাঘের মুখে ঠেলতে পারে না।

সেখানেই সংশয়।

সেখানেই দ্বন্দ্ব।

সেখানেই ধোঁয়াশা।

দ্বিধা বুঝতে পেরে পূর্ণেন্দু সেন বলল "অফ কোর্স দোস হু আর উইলিং। নো কম্পালশন"

"চেষ্টা করব" প্রাণহীন উত্তর।

সেন স্যার দৃঢ় "চেষ্টা নয়। ইউ হ্যাভ টু গেট এইট অফ দেম। আদারওয়াইজ আইল বি ইন ট্রাবল"

"আইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট" অরুন্ধতী উঠে পড়ল।

অফিসে ফিরে ছটফট করছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। স্যার যখন বলেছেন, করতে হবেই। এতদিনের শিক্ষা, মূল্যবোধ, সংস্কার, বিবেক। বুকে দক্ষযজ্ঞ চলছে। চাকরি করতে এসে শেষ পর্যন্ত মেয়েছেলের দালালি! ভাবতেও পারছে না। এর জন্যই কী বাবা তাকে প্রেসিডেন্সিতে পড়িয়েছিল? এটাই কী আজকে উঁচুতে ওঠার একমাত্র উপায়? আজকের প্রগতিশীল সভ্যতা হাসছে, বিদ্রূপে ধিক্কারে। নিজের ভার বইতে অক্ষম। এখন চাই একটু আশ্রয়। দৈহিক স্বেচ্ছাচারিতা, যৌবনের পসরা কোথায় নিলামে চড়াচ্ছে, তা

একান্তই ব্যক্তিগত। তার ওপর কারও অধিকার নেই। কিন্তু অন্যকে নিলাম করে উত্তরণের পথ দেখতে চায় না। এখানে যদিও উত্তরণ নেই, খালি টিকে থাকা। ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেছে।

এখন এই আবর্ত থেকে বেরতেই হবে। একাই...

কুড়ি

"আপনি যে ঢোঁড়া সাপ তা কী নীলোৎপল জানে?"

রক্তিমার কথাগুলো বিষফোঁড়ার মতো খোঁচা দিচ্ছে। শুধু পৌরুষে আঘাত নয়, জয়ন্তর অস্তিত্বকেই লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। কর্মজীবনের সাফল্য ছাড়া ঝুলিতে আজ কিছুই নেই?

কতবার কনফিস্কেটেড জিনিস থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ, জামাকাপড়, খেলনা বেহালার অনাথ আশ্রমে দান করেছে। পুণ্যের লোভ নিয়ে নয়। মন থেকেই। উলটে ওদের ভালোবাসাও পেয়েছে। মানুষটা সাদামাটা হলেও, মনটা দরাজ, উদার। অজান্তে কোথায় যেন শান্তি। যখন কোথাও শান্তির লেশমাত্র আভাস নেই, এই নিভৃত শান্তি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। একদিন মনে হল কীসের আশায় স্বপ্নসৌধ গড়ছে। সে তো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন অজানা নক্ষত্র নয়। এখানেই বাস। অস্তিত্বের স্বীকৃতি। এখানেই সত্তার সংজ্ঞা বুঝে নিতে হবে। স্ত্রীর কাছেও নয়। তার উচ্চপদস্থ কর্মজীবন, নিজস্বতা আজ ধাক্কা খেয়ে এক চরম সত্যের সামনে।

রক্তিমার কথাগুলো বারবার হাতুড়ি পিঠছে। জাগতিক পূর্ণতায় তারা গুনতে শুরু করেছিল। অন্তত একটা ধ্রুবতারা তো দেখছিল। সেখানে রক্তিমা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, মাদকতার নেশায় রামধনুর পেছনে ঘোর অন্ধকার। সে লীলায় অপারগ। মেনে নিতে না পারলেও ভেতরে ফুঁসছে। মনে হচ্ছে, শিক্ষাদীক্ষা, কর্মদক্ষতা সব-ই পরিহাস।

একটু আগেই অরুন্ধতী বাড়ি ফিরে স্নানে। স্নান সেরে বেরিয়ে ফ্রেস জামা বার করতে দেখে বলল "আবার বেরবে?"

জামাকাপড়ের স্তূপে বাছবার চেষ্টা করছিল। না তাকিয়েই বলল "হ্যাঁ। রাতে ফিরব না"

এ না হলে ঘরের লক্ষ্মী! জয়ন্ত বাকরুদ্ধ। আগে হলে প্রশ্ন করত 'কোথায় যাচ্ছ?' এখন সে ক্ষমতাও হারিয়েছে। মনে হল, সাতাশটি চেনা নক্ষত্রের মাঝে যেটি অগ্নিসাক্ষী করে এনেছিল, শুধু টুবলুর মা-ই নয়, দূরের অচেনা আশ্চর্য প্রদীপ। তার উত্তরণের পথেও অচেনা। কল্পনার চেয়েও ব্যবধান অনেক বেশি।

সাদা স্ল্যাক্স, গাঢ় খয়েরি টপস, নাইটড্রেস, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ সাজাতে ব্যস্ত। রাতের অভিসারে জরুরি সরঞ্জাম।

শেষ চেষ্টায় বলল "টুবলু একা"

"কেন? তুমি তো আছ। নিতাইয়ের মা আছে। আজ তো কোথাও বেরচ্ছ না। ওকে দেখে রেখো" সব জিনিস ব্যাগে পুরে ঝিপ বন্ধ করে ওঘরে জামা পাল্টাতে গেল। জয়ন্তর সামনেও বেআব্রু হতে লজ্জা। ফিরে প্রসাধন ঠিক করতে ব্যস্ত।

টুবলু হওয়ার পর যখন দাম্পত্য জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার স্পৃহা চনমনে, সম্ভোগের ব্যর্থতা অরুন্ধতীকে দূরে সরিয়েছিল। নিঃশব্দতাই বুঝিয়েছিল সম্পর্কটা হিমঘরে। টুবলুর মুখ চেয়ে অরুন্ধতী সংসার ভাঙেনি। জয়ন্তকে বিদ্রূপও করেনি। নীরবতাই বুঝিয়ে দিয়েছিল তাদের বৈবাহিক ভবিষ্যৎ। সে তো বহুদিন আগের কথা। এতদিন পরে নীলোৎপলের প্রস্তাবে আরেকবার চেষ্টা। এবার নীরবতা নয়, প্রকাশ্য বিদ্রূপ। রক্তিমার আঘাত ভুলতে পারছে না। মন কাঁদছে। অথচ পৌরুষ তুষের আগুনে ঘি ঢেলেই চলেছে। নিজের কাছেও মুক্তি নেই। পরিত্রাণ নেই। অভ্যাসটাই লুপ্ত।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে অরুন্ধতী "কাল সকালে অফিস যাওয়ার আগে ফিরব। ছুটি। টুবলুকে নিয়ে বসব। চলি"

বেডরুম থেকে শুনল বাইরের দরজা বন্ধ হল। ফ্যালফ্যাল চেয়ে সিলিং ফ্যানে। পাশের ঘরে টুবলু পড়ছে। টিভি চালাতেও ইচ্ছে করছে না। তার একাকিত্বে না আছে অরুন্ধতী, না রক্তিমা।

মনে পড়ে গেল, গুরুদাস কলেজ থেকে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে যখন কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের কথা ভাবছে, বাবা একদিন ঘরে ঢুকে বলেছিল "ডিগ্রি-ফিগ্রি যাই কর না কেন, আসল হচ্ছে চাকরি"

কেমিস্ট্রির ডক্টরেট করে এ পোড়া দেশে মাদাম কিউরি হওয়া যাবে না, ভালোই জানত। নিদেনপক্ষে কলেজের লেকচারি। নয়ত ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে মোটা মাইনের চাকরি। সেদিন থেকেই আইএএস-এর তোড়জোড়। সাধনার ফল কমিশনর অফ কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজে উত্তরণ। পড়াশোনা নিয়েই থেকেছে। প্রেম করার দুঃসাহস হয়নি। দূর থেকে মেয়েদের দেখা। কখনও শাড়ির আঁচল পড়ে গেলে লাজুক আড়চোখে তাকান। যৌবনের চাওয়া সীমাবদ্ধ। পাওয়ার বাস্তব রূপ দিতে এগোবার সাহস হয়নি। তাই অরুন্ধতী যখন বিয়েতে সায় দিল, হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। অনেক কামনার সাক্ষর টবলু। সেই টুবলু পাশের ঘরে পড়ছে দেখে নিশ্চিন্ত। মায়ের পথ যাতে অনুসরণ না করে। না থাকুক অরুন্ধতী। একমাত্র আত্মজ যে তার পথে, তাতেই শান্তি।

কিন্তু নীলোৎপলের উপহার রক্তিমা? অরুন্ধতীর ক্ষতে নুনের ছিটে লাগিয়ে যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিপন্ন পৌরুষ। বিয়ের বন্ধন ঢিলে করে দূরতর নক্ষত্রের খোঁজ। রক্তিমা সেই পথের শিক্ষক মাত্র। সেখানেও আঘাত। ডাহা ফেল। টাকা ছুড়লে নাকি সবই পাওয়া যায়। তাই কী?

"নিতাইয়ের মা" হাঁক দিল জয়ন্ত। হাজির হতেই বলল "হুইস্কির বোতলটা দিয়ে যাও"

"দিচ্ছি" ভাবল এ কী হল দাদাবাবুর? এত বছর এ বাড়িতে কাজ করছে। কখনও তো হুইস্কি খেতে দেখেনি!

দু পেগ পেটে পড়তেই দুঃখ কর্পূরের মতো উধাও। কীসের দুঃখ, ব্যথা? চুলোয় যাক অরুন্ধতী। রক্তিমার কটাক্ষই শেষ নয়। কী আসে যায়? ভেটে পাওয়া ম্যাকলাক্যানের স্বাদটা বড়ই মধুর। চাকরি করে কী এসব কেনা যায়? সেই তো অ্যান্টিকুইটি নয়ত ব্লেন্ডার্স প্রাইড। হুইস্কিতে অভিষেক হলে, ভালো ব্র্যান্ড দিয়েই বউনি শ্রেয়। ঝটকা লাগে না। ধীরে ধীরে কল্পনালোকে ভেসে যাওয়া। রক্তিমা থাকলে দেখিয়ে দিতে পারত ঢোঁড়া না কেউটে। অরুন্ধতী নাগপাশ খুঁজতে গেছে! বোড়া-ঢোঁড়া নির্বিচারে খেলা শেষ হলে ফিরবে। যতক্ষণ যৌবন, ততক্ষণ স্তাবক জনগণ। ঝরে গেলে বাসি স্তবগান। কূলহীন সমুদ্রে উৎক্ষেপণ।

কাপুরুষের মতো সেদিনের প্রতীক্ষায় জয়ন্ত। অরুন্ধতী ফিরবে। তখন সে মহাপৌরুষে বরণ করবে। তার মর্যাদার লড়াই।

"বাবু, একটু কিছু করে দিই" নিতাইয়ের মায়ের কথায় তাকাল।

"বেশ, দাও। আলুর চপ করতে পারবে?"

"কেন পারব না? তুমি আরাম করে খাও। বানিয়ে দিচ্ছি"

নিতাইয়ের মা এভাবে ওকে আগে কখনো বোতল নিয়ে বসতে দেখেনি। বৌদিমণি নেই। বেশি খেয়ে বেসামাল না হয়ে পড়ে। টুবলু একা। কিছু হলে, দেখবে কে? রাতে তো তাকেও বাড়ি যেতে হবে।

কয়েক পেগ পেটে পড়ার পর জয়ন্তর মনে হল, অরুন্ধতী যতই দূরের নক্ষত্র হোক না কেন, বড্ড কাছে। খালি ছোঁয়াটাই বাকি। রক্তিমা না হয়ে নীলিমা হলেই বা কী আসে যায়? যা আছে রক্তিমায়, তাই আছে নীলিমায়। শুধু নামের তফাত। নীলোৎপল আবার এলে, রক্তিমা নয়, নীলিমা চাই। নীলে লালে উজ্জ্বল সম্ভার। বাঁচার চেষ্টা। অরুন্ধতী যদি নিজের মতো করে বাঁচার ঠিকানা খুঁজে নিতে পারে, সে কেন নয়? টাকা ফেললে মেয়ের কী অভাব?

নিতাইয়ের মা তেলেভাজা রেখে বলল "বেশি খেও না। টুবলুকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে যাচ্ছি। তোমার খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে গেলাম। সময় মতো খেয়ে নিও"

জেগে থাকলে সময় কাটানো যত শক্ত, নেশায় হুড়মুড় করে পার হয়ে যায়। রং শুধু গ্লাসে নয়, মনেও। ফাগুয়ার হোলি খেলছে, অন্ধকারে। যে আগুন রক্তিমা জাগাতে পারেনি, তাই জাগাচ্ছে চেতন-অবচেতনে সিনেম্যাটিক ধোঁয়াশা। সে যেন দেবরাজ ইন্দ্র। মেহেফিলে নাচছে কত রম্ভা, মেনকা, উর্বশী। লাল চেলির রক্তিমা রং পালটাচ্ছে নীল থেকে হলুদ, বেগুনি, সবুজে। সেখানে সে সবুজ পাগড়িতে রাজ সিংহাসনে। শুধু ইঙ্গিতটুকুই বাকি। মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দরীরা হাজির। রং-বেরঙের পোশাকে মায়াবী হাতছানি। ভেসে যাচ্ছে অনাবিল আনন্দের তোড়ে, অবচেতনের জোয়ারে। যেখানে চেতনার অন্ধকার, স্বপ্নের আকাশে চিতা জ্বালায় না। যেখানে ফুলেরা পাপড়ি মেলে অনন্ত স্বর্গের স্বপ্ন নিয়ে। ক্লেদাক্ত ইহলোকে যেখানে সুপ্ত সুর সুমধুর।

"এখনও ঘুমিয়ে?" ঘুম ভাঙল অরুন্ধতীর ডাকে। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে।

একুশ

ফ্যাশন আনলিমিটেডের মিনি অডিটোরিয়ামে সবাইকে নিয়ে মিটিং-এ বসল অরুন্ধতী।

কয়েক দিন ধরেই রাতে ঘুমতে পারছিল না। তীব্র দ্বন্দ্বে ছটফট করছিল। একদিকে বিবেক। অন্যদিকে পূর্ণেন্দু সেনের দুনিয়ার সঙ্গে সমঝোতা। পূর্ণেন্দু সেন উপলক্ষ মাত্র। আজকের দিনে টিকে থাকার নিদর্শন। এভাবেই আজকাল অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। প্রথমে ভীষণ রাগ হয়েছিল সেন স্যারের ওপর এই বিপথে ঠেলার জন্য। চাকরি করে বলে কী অন্যায় পথে হাঁটতে হবে? রাগে গা শিরশির করে উঠেছিল। সময় গড়াতে, সেই রাগ রূপান্তরিত যুক্তি-বিশ্লেষণে। সে যেমন নিরুপায়, হয়ত সেন স্যারও তাই। বিশাল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে তাকেও এ পথে হাঁটতে হচ্ছে। তখন অতটা কুনজরে দেখতে পারেনি ফ্যাশন আনলিমিটেডের মালিককে। সেও ওর মতো দায়বদ্ধ। কার কোথায় টুটি বাঁধা, কে জানে? চোরের মতো চুপিচুপি এই কুপ্রস্তাবে মন সায় দিচ্ছিল না। রুচিশীল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত অরুন্ধতীর মনে হচ্ছিল, এ পথে হাঁটা পাপ। তখনই ঠিক করে ফেলেছিল, ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে, এই প্রস্তাব সর্বসমক্ষে রাখবে বিবেকের কাছে স্বচ্ছ থাকতে।

মাইক্রোফোনে বলল "আই হ্যাভ কলড ইউ ফর দিস মিটিং উইথ এ আনিউসুয়াল প্রপোসাল। হোয়েদার ইউ সাপোর্ট অর রিজেক্ট ইজ ইওর চয়েস। ওয়ান্ট টু লে ইট ডাউন ট্র্যান্সপ্যারেন্টলি" সবাই ওর দিকে চেয়ে। মিনারেল ওয়াটারে চুমুক দিয়ে, ধীর শান্তভাবে বলে চলল "আই হ্যাভ কলড ইউ টুডে টু ডিসকাস ওপেনলি অ্যান ইস্যু বিফোর মি। আই হ্যাড বিন থিংকিং ওভার ইট ফর দ্য লাস্ট ফিউ ডেস। ইন দ্য এন্ড, ডিসাইডেড ইট উড বি অ্যাপ্রপ্রিয়েট টু ডিসকাস ইট ওপেনলি, দ্যান বিহাইন্ড ক্লোজড ডোরস। এ প্রপসাল হ্যাস কাম ফ্রম হায়ার কোয়ার্টার্স। ডোন্ট আস্ক মি ফ্রম হোয়ার। দ্য এসেন্স ইজ এইট গার্লস আর রিকয়ার্ড টু এন্টারটেন টপ লেভেল পিপল অফ দ্য সোসাইটি। ইউ নো হোয়াট আই মিন। আউট অফ দ্য এইট, ফাইভ উইল বি চোজেন। দিস ফাইভ উইল বি পুসড টু লাইমলাইট বাই দেম। অফ কোর্স, আদার্স উড হ্যাভ দেয়ার প্লেসমেন্টস ইন দ্য ইউসুয়াল ম্যনার। দিস ইস এ বিট অফ এক্সট্রা পার্কস ফর দোস উইলিং। নট সিওর হাউ মেনি উড ভলেন্টিয়ার"

কথাগুলো একসঙ্গে বলে দীর্ঘশ্বাস। মাথা নিচু করে বসে। ফ্যাশন আনলিমিটেডেটের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে এ কাজ কখনও করতে হবে ভাবেনি। অডিটোরিয়াম নিস্তব্ধ। এর পর ঝড় উঠবে আনাচে-কানাচে। তারই প্রতীক্ষায়। দু-তিন মিনিট। কোনও কথা নেই। ঠিক তারপরই...

একজন বলল "ম্যাডাম, আই অ্যাম রেডি ফর ইট" তাকাল মেয়েটির দিকে। গোটা হল তাকিয়ে আছে। তাদেরই রাইমা। ছিপছিপে গড়ন। সুন্দর মুখশ্রী। যৌবনের সম্ভারে পরিপুষ্ট "আই ভলেন্টিয়ার"

কয়েক মুহূর্ত। আরও চারজন বলল "আমি রাজি"

চার থেকে আট। আট থেকে ষোলো। বত্রিশ, চৌষট্টি। সংখ্যাটা জিওমেট্রিক প্রগ্রেশনে বাড়ছে। বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কিছুক্ষণ আগের কুণ্ঠা নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে আধুনিক প্রজন্ম। অরুন্ধতীই সেকেলে, পিছিয়ে আধুনিকতার ইঁদুর দৌড়ে। সংস্কারাচ্ছন্ন আধুনিকতাকে পেছনে ফেলে, নব-সভ্যতা স্পুটনিকের মতো কোন মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে? এই উত্তরণের স্পৃহা তাকে ভাবাচ্ছে পরিবর্তিত মূল্যবোধ নিয়ে। আগামীর কম্পিটিটিভ যুবতীরা বিদ্রূপ করছে তার রক্ষণশীল, আপাত প্রগতিশীল সত্তাকে। বুঝতে পারছে, যুগসন্ধিক্ষণে বিশ্বব্যাপী ধোঁয়াশায় দাঁড়িয়ে। সেও তো জয়ন্তকে সরিয়ে প্রতীকের সঙ্গে কাটিয়েছে। মন যে কখনো ফণা তোলেনি, তাও নয়।

সোহমের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, প্রতীকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কোথাও আন্তরিকতা, আবেগ ছিল। উষ্ণতা তো বটেই। লালমাটির রাঙাপথে চাঁদনি আলোয় প্রতীকের পাশে হাঁটতে গিয়ে বসন্তকে দেখেছিল। ফাগুয়ার হাওয়া না প্রতীকের উপস্থিতি, বোঝেনি। অনুভূতিটা অন্য, যা জয়ন্তর পাশে থেকেও পায়নি। প্রকৃতিকে অনুভব করার মন চাই। যা জয়ন্তর কোনও কালেই ছিল না। শান্তিনিকেতনের অ্যান্ড্রুস পল্লিতে প্রতীকের বাড়ি থেকে ডিয়ার পার্কে পাশাপাশি হাঁটা।

বসন্ত উৎসবে প্রতীক আগ বাড়িয়েই বলেছিল "চল না, শান্তিনিকেতন ঘুরে আসি"

ম্যালেরিয়ার সময় সেবার কথা ভুলতে পারেনি। অরুন্ধতীর সত্তাকে কিছুটা হলেও অনুভব করেছিল। একাকিত্বে তাই পাশে চেয়েছিল। কর্মব্যস্ততার ফাঁকে একটু ব্রেক, কিছুটা উষ্ণতা। মুম্বাইয়ের জীবনে দিনরাত ছোটা। অবসরে একা বাংলোতে হুইস্কি। মেয়েদের ফোনের অপেক্ষা। টাকা দিয়ে তো সব কেনা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন তাসের দেশে মন কখনও ভেসে বেড়াতে চায়, উদাসী বাউল হয়ে, ডানা মেলে, অন্তত নীলিমায়। একটু আকাশ, একটু মাটি, একটু রং, একটুকরো মনের মতো মুহূর্ত। গান, কবিতা, ছবি, সাহিত্য। অরুন্ধতী তারই দোসর। কংক্রিট জঙ্গলে রোজকার একঘেয়েমির মধ্যে, খোলা আকাশ। যেখানে অর্থহীন যন্ত্র চিন্তাকে বাক্সবন্দি করে না। হিসেবের তরী ভাসে না লালসায়। সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি সংশয় জাগায় না মূল্যবোধে। ব্যস্ততার ফাঁকে নিজের করে পাওয়া অবসর। সেখানে গ্ল্যামারের ব্যঞ্জনা, বিকিকিনির পসরা নেই। আছে, সব ভুলে বরণ করা অবসরের সময়কে। মুম্বাইয়ের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে অবসর। মাধুরী যখন বেঁচে মাঝেমাধ্যেই বেড়িয়ে পড়ত। কখনও ডেভসে, কখনও ইন্সব্রুকে, সময় কম থাকলে লোনাভিলা বা ওয়াগাতুর বিচে। মুক্তি খুঁজত প্রকৃতির পাদদেশে।

মরার তো কথা ছিল না, তবু চলে গেল। বিশ্বপ্রকৃতির লীলায় মানুষ কত অসহায়। কয়েকদিনের ডেঙ্গু জ্বর। বাড়ির কাছে, হিন্দুজা হসপিটালে ভর্তি। তারপর, সব শেষ। একটা অধ্যায়। তারপর নতুন কোনও অধ্যায় গড়তে মন চায়নি। মেয়েরা বড় হয়ে গেছে। আবার বিয়ে?

সেই দিনগুলোয় মন পালাতে চাইত। কখনও রডন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। কখনও গ্রামে গঞ্জে। অথবা বসন্ত বন্দনায়। বাউলমন উড়তে চাইত গ্রাম বংলার মেঠোপথে। খুঁজত ফেলে আসা অতীতের ছন্দ। পূর্ণিমায়, অরুন্ধতীর সঙ্গে বসে তারা গোনার মধ্যে হারানো সুর। বস্তাপচা ইডিয়ট বক্সের প্রলাপে হাসি পায়। অঙ্কগুলো মুখস্থ। নবসভ্যতার মুখোশে অস্তিত্বহীন উন্মাদনা। অর্থ নেই, তবু বলতে হয় রোমান্স।

"বেশ চল" অরুন্ধতী সম্মতি দিয়েছিল।

মেঠোপথ ধরে কোপাই নদীর পাশে। চাঁদটা জ্বলজ্বল করছে দোল পূর্ণিমায়। এদিকটায় রাতে কখনও আসেনি অরুন্ধতী। দিনের বেলা আর জ্যোৎস্নারাতের খোয়াই একেবারে আলাদা। প্রথমে ভয় ভয় করছিল। দিনকাল খারাপ। যেখানে সেখানে চুরি ছিনতাই। তারপর রাত। কিছুটা ঘোরে, কিছুটা বিভোরে, প্রতীকের সঙ্গে আসার পর ভয়ের মেঘ কেটে স্নিগ্ধতার মায়াবী আলোয় খুশি। প্রতীকের চটির মরমর। অনুভূতির কম্পন। ভালোবাসা? বোঝেনি। তুষের আগুনের মতো জ্বলা অসীমের প্রতি আসক্তির অপূর্ণতা, তাকে অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছে। ভালোবাসার মানেটাও ধোঁয়াশা।

প্রতীক বলেছিল "কী ভাবছ?"

"কিছু না" প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল।

যেখানে চেতনাটাই ঘূর্ণিঝড়ে, সেখানে ভাবনার বিশ্লেষণ বাতুলতা মাত্র।

প্রত্যুত্তর না পেয়ে বলে উঠেছিল "দারুণ ভালো লাগছে"

খোয়াইয়ের খাদ অন্ধকার। বড় বড় গাছগুলো অন্ধকারে কালো স্তম্ভের মতো। পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো চাঁদের আলো মাটিতে। নানা শেপের, সাইজের। নানা রঙেরও। কোনওটা হাল্কা হলদে, কোনওটা ধবধবে সাদা, কোনওটা মলিন। কোনওটা ত্রিভুজাকৃতি, চৌকো, গোল। কোনওটা এলোমেলো। সবগুলোই কী ধ্রুবতারার এক একটা রূপ?

অরুন্ধতী জানে না।
প্রতীক আলো আঁধারিতে বলেছিল "তোমার ভালো লাগছে না?"
"হ্যাঁ" বিভিন্ন আকৃতির চাঁদের টুকরোর মতো অস্ফুট উত্তর।
আলোর টুকরোগুলোর দিকে তাকালে ধাঁধা লাগে মনে। মনে হয়েছিল, আলোছায়ার এই গোলকধাঁধায়, অরুন্ধতী যেন কৈশোরে। ফ্রক পরে স্কুলে যাওয়ার দিনগুলো ভিড় করে স্মৃতি থেকে বাস্তবে। টুকরো আলোগুলো এক্কাদোক্কার ছক বানিয়ে ফেলেছে। ওকে ডাকছে 'আয়... আয়... খেলবি-না আমাদের সঙ্গে?"
মোহগ্রস্ত অরুন্ধতী আলোছায়ার লুকোচুরিতে চেয়ে। ধ্রুবতারাটার ঠিকানা হয়ত আবছায়া আলোর মধ্যে মিশে...
"কী হল? চুপ করে গেলে কেন?" প্রতীকের ব্যারিটোন আওয়াজে ঘোর কেটেছিল।
"কী বললে?"
"তখন তো আসতেই চাইছিলে না"
অরুন্ধতীর মুখে ক্ষীণ হাসি "বুঝতে পারিনি, রাতের বেলায়, এখানটা এত সুন্দর"
"দোল পূর্ণিমায় এত চাঁদের আলো না থাকলে অন্যরকম লাগত"
প্রতীকের কথায় তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। এ তো কলকাতা নয়। এখানের আকাশে অনেক বেশি তারা দেখা যায়। তবে উজ্জ্বল কোনও নক্ষত্র নয়।
আকাশটা এক অদ্ভুত আলোর বর্ণচ্ছটায় আলোকিত। শান্ত স্নিগ্ধ সেই আলোর উৎস খোঁজার খুব বেশি দরকার হয় না। উৎসটা চিরপরিচিত। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে 'আয় আয় চাঁদ মামা, আমার খোকার কপালে টিপ দিয়ে যা' ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গে আজকের চাঁদের কোথায় যেন পার্থক্য। এ কী সেই চাঁদ? ওর মনে হয়েছিল, এমন অচেনা চাঁদ তো আগে কখনও দেখেনি। যেন অন্য পৃথিবীর। রশ্মিটাও অন্য কোনও সূর্য থেকে ধার করা। ছোটবেলা থেকে একটাই সূর্য দেখেছে। একটাই চাঁদকে চিনেছে। এর বাইরেও কী কোনও উপমণ্ডল?
আকাশটা পরিষ্কার। দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে অনেক ওপরে ঝকঝক করছে। একটা বিশাল রূপোর থালা। থালাটা এত উজ্জ্বল, যে অরুন্ধতীর চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছিল। ঘুমে জাগরণের অনুভূতিতে চোখ খুলেছিল। অপার্থিব দৃশ্য। একেই কী কবিরা অসীম বলে অনন্তে বিলিয়ে দিয়েছে? সারা আকাশ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। তার মধ্যে সাঁতার কাটছে স্বর্গলোকের দর্পণ। মনে হয়েছিল ভালোলাগায় তক্ষুনি মরে যাবে। অনেক না-পাওয়ায় এইটুকুই পাওয়া। রবির বাইরে আরও কোনও রবি মিটমিট করে হাসছে। যে রবিকে চিনি না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আরেকটা দিক।
নীচে তাকাতেই লক্ষ করেছিল খোয়াইয়ের খাতগুলো অদ্ভুত আলো-আঁধারিতে হারিয়ে যাচ্ছে অচেনা রূপকথার দেশে। স্বপ্নের মায়ালোকে। অন্য ভূমণ্ডলের বেলাভূমিতে। অজান্তেই কখন ঝর্ণাধারার মতো বেরিয়ে এসেছিল ভালোলাগার আশ্চর্য অমৃতময় অনুভূতি 'চাঁদের হাসির বাধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো...'
রূপকথা? অচেনা বিভোরে হারিয়ে গেছিল। কতক্ষণ, কে জানে? সময়টা যেন স্তব্ধ, কালপ্রবাহের উৎসে। ভালোলাগাকে তো সোনার খাঁচায় বন্দি করা যায় না। ধরাও যায় না চেনা অঙ্কে। সেই মুহূর্ত এক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের দ্বার খুলেছিল। প্রতীক কাঁধে হাত রেখে নিবিড় করে টেনে নিয়েছিল। কাছেই শ্বাসের আওয়াজ, অনুভবে উষ্ণতা।
"তোমার কখনও একা লাগে না?" চেয়েছিল প্রতীকের দিকে।
"বেশি সময় কাজে ব্যস্ত থাকি। বাকিটা সোশ্যাল গ্যাদারিংয়ে। যখন একা, ভীষণ একা লাগে। বিশেষ করে মাধুরী যাওয়ার পর"
"আমার ঠিক উল্টো। কাজের মধ্যেও সবসময় মনে হয় একা"

আরও একবার অরুন্ধতী অনুভব করল, সে একা। মনের ভাষা এক। পটভূমি পালটে গেছে। এখন সে একেবারে অন্য মেরুতে। ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক পটভূমিতে ধাক্কা খেল। যুগটা বড্ড তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছে। ওর প্রগতি, এই উল্কার মতো ছোটা সভ্যতায় স্থিতিশীল। নক্ষত্রের রং সত্যি তাহলে পালটায়। এই পরিবর্তন যদি জীবনের অঙ্গ, সেখানে সে প্রবল ঝড়ের আবর্তে। তারপর, কালের নিয়মে একসময় হারিয়ে যাবে। হারাতে চায় না। হারতেও নয়। মেয়েগুলোর ভাষা অচেনা। রণক্ষেত্রে সে একা। চেনা আপেক্ষিকতা নাড়া দিচ্ছে। ভাগ্য সহায়ক হলেও, নতুন চেতনার জাগরণে যুগসন্ধিতে সে বেমানান।

সমস্যাটা এখন অন্য জায়গায়। আগে ভাবছিল পূর্ণেন্দু সেনের কাজের জন্য লোক পাবে কী করে? এখন ভাবছে, এত ভলেন্টিয়ারের মধ্যে বাছবে কী করে?

মাইকে বলল "টু বি অনেস্ট আই ওয়াজ নট এক্সপেক্টিং সাচ এ হিউজ রেসপন্স। ইট লুক্স লাইক ৮০% পার্সেন্ট অফ ইউ আর উইলিং টু ভলেন্টিয়ার। উই কান্ট চুজ অল অফ ইউ। উই নিড ওনলি এইট। হাউ ডু ইউ প্রপোস আই পিক দ্য এইট?"

সমস্যাটা ওদের দিকেই ছুড়ে দিল। আবার স্তব্ধতা। এ ওর দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। সত্যি তো। এতজনের মধ্যে আটজনকে বাছবে কী করে? এটা তো চাকরির পরীক্ষা নয়, যে ইন্টারভিউ নেবে। হাস্যকর হয়ে যাবে। এন্টারটেনমেন্টের জন্য সিলেকশনের কী কোনও নিয়ম আছে? ক্লায়েন্টের ব্যাক্তিগত চয়েস ছাড়া। সেটা এখানে অসম্ভব।

উত্তর না পেয়ে বলল "লেট মি লুক অ্যাট ইট ফ্রম দ্য আদার সাইড। ইন দ্যাট কেস দ্য বেস্ট অল্টারনেটিভ উড বি টু হ্যাভ এ লটারি। প্লিজ সাবমিট ইওর নেমস টু মাই সেক্রেটারি। ফিউ ফ্রম দ্য আনউইলিং সাইড কুড পিক দ্য নেমস র‍্যান্ডামলি ফ্রম দেম"

উঠে পড়ল। সভ্যতার দক্ষযজ্ঞে ক্লান্ত... তোমাদের পথ তোমরাই ঠিক করে নাও। আমি নেই। ঘরে এসে ডুকরে কেঁদে উঠল মন। এ যাত্রায় রক্ষে পেল।

এই প্রগতিময় চিন্তায় সে আদৌ কোথায়? কোনখানে?

বাইশ

বহুদিন পর আজ নতুন উদ্দীপনা অনুভব করছে বর্ণালী। সুরে খুঁজে পাচ্ছে জীবনের মলিনতা ছেড়ে বসন্তের আগমনি। আজানের সময় থেকে প্রত্যুষের প্রথম আলোর বর্ণাঢ্য হোলিতে গলায় আবার ঝংকার ছোটবেলার সকালের রেওয়াজ। খালি গলায় সাধনা। সেদিন ছিল রোজকার অভ্যাস। আজ পূজার ডালি।

স্বর্ণালী তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। ওর স্বভাব ছিল রাত জেগে পড়া। বর্ণালী কিছুতেই রাত জাগতে পারত না। ভোরের পাখির ডাকে, দিনের কলকোলাহলের বাইরে মিশে যেতে পারত কোমল থেকে নিখাদে। নির্মল সুরের সাধনায়। এটাই ছিল তার পূজা। জগৎ।

বিজিতের মৃত্যুদিন ৪ জুলাইয়ের সন্ধেবেলায়, আবার খুঁজে পেয়েছে হারানো বসন্ত। সুরের সাগরে এখন নিয়মিত রেওয়াজ। ছোটবেলার সুরসাধনা আবার জীবনের ধূসর বর্ণহীন বালুচরে নতুন করে ধ্রুবতারা দেখাচ্ছে। শূন্যতা থেকে পূর্ণতার পথে। ক'দিনের রেওয়াজে বহুদিনের অনভ্যাসের খুঁতগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা। কিছুদিন রেওয়াজ করলেই নিজেকে তৈরি করে ফেলতে পারবে।

কাল রাতে অসীম ফোন করেছিল "সকাল এগারোটায় ফ্রি আছ?"

"হ্যাঁ"

"আমি আসব"

মাথায় ঢুকছিল না, হঠাৎ সকালবেলায় অসীমদা কেন আসতে চায়। আজ তো ছুটির দিন নয়। মৃত্তিকাদির মৃত্যুর পর মিডিয়া স্ক্যামের সময় এরকম এসেছিল। বেশ কিছুদিন আগে। নতুন খবর চাপা দিয়েছে পুরনো সেই কাহিনি। আগের থেকে অসীমদার আসা-যাওয়াটা বেড়ে গেছে। ভেতরের অস্থিরতাও। ধীর স্থির অসীমদা আগের থেকে স্বতন্ত্র। ঠিক কোথায়, এখনও বুঝে ওঠেনি। কাজে একনিষ্ঠতার অভাব। দূর থেকে হলেও বোঝা যায়। আবার কিছু হল না তো?

ঠিক সাড়ে এগারোটায় কলিং বেল। অসীমদা একা নয়। সঙ্গে আরেজকন স্যুট পরা ভদ্রলোক। দেখে মনে হয় অবাঙালি।

"আসুন, আসুন। ভেতরে আসুন"

ভাগ্যিস নাইট গাউন পরে ছিল না। ওরা আসার আগেই শাড়ি পরে নিয়েছিল। রোজ সকালে মা স্নান করে আদ্যাস্তব করতেন। মাকে দেখে স্বর্ণালীও করত। জানে না ও এখনও আদ্যাস্তব করে কি না। ছোটবেলা থেকেই বর্ণালীর পুজো-আর্চা পোষায় না। সুরের মধ্যেই ঈশ্বরকে চায়। বিজিতের মৃত্যুর পর সেই সুর হারিয়ে গেছিল। ঈশ্বরের সংজ্ঞাও ধূসর।

অসীমদা সোফায় বসে বলল "উনি মিঃ রহিম। সাধনা রেকর্ডসের সিইও"

বর্ণালী বলল "চা করি?"

অসীমদা সোফায় গা এলিয়ে বলল "তা করতে পার"

বর্ণালী কিচেনে চায়ের বন্দোবস্ত করতে গেছে।

মিঃ রহিমকে বলল "ইউ হিয়ার হার সিং। ইটজ মেসমারাইজিং"

"মিঃ চ্যাটার্জি, হোয়েন অ্যান ইনফ্লুয়েনশিয়াল ম্যান লাইক ইউ হ্যাজ রেকমেন্ডেড হার, আই হ্যাভ নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। আই হ্যাভ অলরেডি ব্রট দ্য প্রিপেয়ারড কন্ট্র্যাক্ট ফর্ম। আফটার দ্য ফরম্যালিটিজ আর ওভার আই লিভ দ্য বল অন ইওর কোর্ট। প্রডাকশন, টেকনিক্যাল সাইড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মার্কেটিং ইজ

আওয়ার রেস্পন্সিবিলিটি। দ্য এক্সপোজার অ্যান্ড পাবলিসিটি ইজ ইন ইওর কোর্ট। দ্যট উইল গিভ আস এ মার্কেটিং বুস্ট অ্যাজ ওয়েল”

“আই হ্যাভ অলরেডি অ্যাসিওরড ইউ দ্যাট। আই অ্যাম গোয়িং টু স্পন্সর এ সোলো প্রোগ্রাম অফ হার অ্যাট আইসিসিআর অর কলামন্দির প্রায়র টু দ্য লঞ্চ, উইথ ফুল মিডিয়া পাবলিসিটি”

বর্ণালী চা-বিস্কুট এগিয়ে দিল। এ ভদ্রলোক কে?

অসীম বলল “বস। মিঃ রহিম সাধনা রেকর্ডস থেকে তোমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবাম বার করতে চান”

বর্ণালী অবাক “আমার!?”

“হ্যাঁ তোমার। উনি তোমার গান শুনতে চান”

অসীমদা ওকে সুরসাধনায় ফিরিয়ে আনতে চাইছে। আরেকটা নতুন জীবন সোনার সিন্দুকের চাবি নিয়ে হাজির। ও তো নাম, যশ, খ্যাতি কোনওদিনই চায়নি। সুরের মধ্যে শান্তির বাতাবরণ খুঁজছিল। অসীমদা এসব করছে কেন? কোনও সিন ক্রিয়েট করতে চায় না।

“তোমার গান শোনাবে?”

“খালি গলায় না হার্মনিয়াম নিয়ে?”

“খালি গলায়ই গাও। তোমার তো বাজনার দরকার নেই” অসীম চায়ে চুমুক দিল।

বর্ণালী আত্মস্থ হয়ে খালি গলায় গেয়ে উঠলঃ

‘এতদিন যে বসে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে

দেখা পেলেম ফাল্গুনে...’

মিঃ রহিম মন দিয়ে শুনছিলেন। শেষ হতেই বললেন “সুপার্ব। আপনার গান রেকর্ড করব”

“আরও কয়েকটা দিন রেওয়াজ করতে দিন। এখনও অনেক খুঁত আছে” ইমেডিয়েট ডিসিশনের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

“বেশ তো। টাইম নিন। যতদিন খুশি। কন্ট্র্যাক্টটা সই করে দিন। তাহলেই হবে” ব্রিফকেস থেকে কন্ট্র্যাক্টটা এগিয়ে দিল।

বর্ণালী বুঝতে পারছে না, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির এই আকালে, হঠাৎ মিঃ রহিম যেচে সই করাতে চাইছে কেন। এখন সিডির বিক্রি নেই। স্পন্সর ছাড়া রেকর্ড কোম্পানি টাকা ঢালতে চায় না। আর্টিস্টরা ইউটিউবে গান পোস্ট করে প্রোগ্রাম জোটায়। সেখানেও অপেক্ষাকৃত খরা। চিট ফান্ডের অস্তাচলে সরকারি প্রোগ্রাম ছাড়া গুটি কয়েক প্রোগ্রাম। নইলে বিদেশের বঙ্গ সংস্কৃতিতে। সে আর ওখানে ফেরত যেতে চায় না। বিজিতের স্মৃতি তার পারফ্রম্যান্সকেই নষ্ট করে দেবে। অ্যামেরিকা অতীত। নায়াগ্রা ফলসকে পেছনে ফেলে সে অনেক দূরে চলে এসেছে। এখানেও কামাবার শখ নেই।

“তৈরি হয়েই কন্ট্র্যাক্ট সই করব” ধীর গলায় জবাব।

অসীম বুঝতে পারছে, মন থেকে যতক্ষণ সায় না পাবে, এ টোপ গিলবে না। হাল্কা করার জন্য বলল “ঠিক আছে। যখন তুমি মনে করবে। কন্ট্র্যাক্টটা রইল”

চা শেষ করে মিঃ রহিম উঠে পড়ল “ঠিক আছে। ভেবেই সই করবেন। মিঃ চ্যাটার্জি খবর দিলে এসে নিয়ে যাব। গানগুলো সিলেক্ট করলে আমাদের ট্রেনার তৈরি করাবে”

ওনাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে, চলে যাওয়ার পর বর্ণালী বলল “হঠাৎ এসব করতে গেলে কেন? আগে তো কথা বলে নেবে”

“ভাবতে পারিনি তোমার আপত্তি থাকবে। সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম”

“আমি গানটাকে পুজো হিসেবে দেখি। নাম, টাকা এসবের জন্য গান শিখিনি”

ভেতরে তুমুল আলোড়ন। ওদের আগমন দমকা হাওয়ার মতো। ওলটপালট করে দিতে চাইছে তার শান্তির আরাধনাকে। দোটানার ঘূর্ণায়মান আবর্তে ফেলে দিয়েছে।

“তুমি যদি না চাও...” অসীমের কথাগুলো হারিয়ে গেল।

“একটু ভাবতে দাও” সোজাসাপ্টা জবাব।

মৃত্তিকার স্ক্যাম অনেক চাঞ্চল্যকর খবরে ধামাচাপা। কিন্তু ঘরে স্বর্ণালীর সঙ্গে অদৃশ্য দেওয়ালটা থেকেই গেছে। দূরত্বটা অনুভব করছে। স্বর্ণালীর সম্পর্কটা আগের মতো নেই। অসীম আশ্রয় খুঁজছিল। কাজের বাইরে অন্য পৃথিবী। মনে হয়েছিল, বর্ণালীকে উৎসাহ দিতে পারলে, সেও একটা অবলম্বন পাবে। বর্ণালীর থেকেও নিজের তাগিদে।

বর্ণালী চুপ। নীরবতা। যেন দুজনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। একজনকে অপরজনের পাল্লায়। অন্য কোনও ফ্ল্যাট থেকে মহিলাকণ্ঠের গান ভেসে আসছে। হিন্দি গান। চটুল সুর। কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জানলার কার্নিশে একটা কাক অনর্গল ডেকে চলেছে। সেই আওয়াজটাই ছিন্ন করল নীরবতা।

বর্ণালী অসীমের দিকে ঘুরে বলল “কেন অসীমদা? কী হবে?”

উকিলের জেরা। কিছু ভাবছিল। কাজটা আচম্বিতে করেনি। ভেবেচিন্তেই মিঃ রহিমের সঙ্গে এই প্ল্যান। বর্ণালী বুঝতে পারছে অসীমের ভেতরে বেসুরো রাগ। কোথায় ছন্দপতন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এ অবস্থায় নিজে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, তাও বুঝতে পারছে না। সিডি হয়ত সাময়িক খ্যাতি দেবে। তার মধ্যে কী ডুবতে চায়?

অসীম ইতস্তত করেই বলল “দ্যাট ডে আই ডিস্কভারড এ স্লিপিং জিনিয়াস। সেদিন সন্ধেবেলা তোমার ব্যথায় মনে হয়েছিল, এভাবেই তোমার সত্তা বহিঃপ্রকাশ খুঁজছে। তাই...”

যা দেখা যায় না, যা কল্পনার পৃথিবীত ভাসমান ছায়া, তাকে বাস্তবের আঙিনায় দাঁড় করাতে চাইছে। নিজের বলয় থেকে এই বৃত্তে ফিরতে কী প্রস্তুত?

“কেউ জিনিয়াস নয়। গতের বাইরে অন্য কিছু ভাবলে হয় সে পাগল, নয়তো জিনিয়াস। আমাদের চিন্তাধারা কত সীমিত” প্রকারান্তরে অসীমকেই বিদ্রুপ করল।

অসীম নিজেকে সামলে নিল। জিনিয়াস বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এখানে বেমানান।

“মানুষের বাঁচার তো একটা অবলম্বন চাই। সম্বিত আরেকটু বড় হলে নিজের দুনিয়ায় চলে যাবে। সেদিন তুমি কী নিয়ে থাকবে?” কথাটা ভুল বলেনি। সত্যিই তো। তাকেও তো ভবিষ্যতের পাথেয় খুঁজে নিতে হবে। অসীম বলে চলল “ঈশ্বর কখন যে কার মধ্যে দিয়ে কী কাজ করিয়ে নিতে চান, কেউ কী বলতে পারে? এগুলো হয়ে যায়। তোমার কপাল। এক্সপোজারটা আসতই। আমি না হয়ে অন্য কেউ। ধরে নাও আমি উপলক্ষ মাত্র”

বর্ণালী ভাবছে। এটা পাথেয় বলেই বহুদিন পর সেদিন ৪ জুলাই তার কণ্ঠে বেজে উঠেছিল সুর। এই ক’দিনের সুরসাধনায় শান্তির আচ্ছাদন দেখছে। অলিখিত বিচারক অবশেষে তার ভারডিক্ট শোনাচ্ছে। তাঁর মতো করে। বেস বুঝতে পারছে, অসীমদা তার উত্তরের অপেক্ষায়। কতক্ষণ এভাবে নিঃশব্দে জানে না। ঈশ্বরের দূত অসীমদা। অবহেলা করা মানে, ঈশ্বরের দানকে উপেক্ষা করা।

ফিসফিস করে বলল “ঠিক আছে। আমি করব”

নতুন ধ্রুবতারা জ্বলছে। রোশনাই প্রখর না হলেও দূর থেকে কাছে। নতুন দিক দেখাচ্ছে।

বাইশ

যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অরুন্ধতী তীর খুঁজছে। অতীতের মূল্যবোধ না বর্তমানের মূল্যহীন দুনিয়াদারি দুয়ে পা দিয়ে নিজের নৌকো খোঁজার চেষ্টা। বুঝেছে দুটো নৌকোর কোনটাতেই সওয়ার হতে পারবে না। তৃতীয় বাহন।

জয়ন্ত পড়াশোনায় যত ভালোই হোক অস্তিত্বের সংজ্ঞাই জানে না। ক্ষমতাও নেই পথ দেখানোর। বাকি দুই ভিন্নধর্মী পুরুষ, অসীমদা অথবা প্রতীক। এদের একজন নিশানা দেখাতে পারবে। অসীমদার মধ্যে যুগধর্মী বাস্তবতা। প্রতীকের বনেদিয়ানার ভিত। দুজনেই সফল নায়ক। এরাই পরিবর্তনশীল সমাজের নিশানা দেখাতে পারবে।

"আজ কী ব্যস্ত, অসীমদা?"

চমকে উঠল অসীম। বিশেষ দরকার না হলে বড় একটা ফোন করে না। যদিও প্রায়শই স্বর্ণালীকে করে।

আশ্চর্য হল "কেন বলত?"

"দেখা হলে ভালো হত"

"বেশ তো। যে কোনও বাড়ি চলে এস"

"বাড়িতে নয়, অন্য কোথাও"

বুঝতে পারছে না কেন একা দেখা করতে চাইছে। মৃত্তিকার স্ক্যামে স্বর্ণালীর সঙ্গে সম্পর্কটা যখন আলগা সুতোয়, অরুন্ধতীর সঙ্গে একা দেখা করলে আরও কঠিন হতে পারে। এত বছরের সম্পর্ক কলেজ জীবন থেকে। নিশ্চয়ই কারণ আছে। ফেলা যায় না। মনে পড়ে না, ইদানীং ওর সঙ্গে একা দেখা হয়েছে কি না। শেষ কলেজ জীবনে। স্বর্ণালী কাজে ফেঁসে গেছিল। গড়ের মাঠে তিনজনে ফুচকা খাওয়ার প্ল্যান করেছিল। কথা ছিল, ভিক্টোরিয়ার সামনে দেখা করবে।

অরুন্ধতী ঘড়ি দেখে বলেছিল "এত দেরি করছে কেন? এখনও এল না"

"আমিও তাই ভাবছি" অসীম সায় দিয়েছিল।

এক ঘণ্টার ওপর যখন এল না, অসীম বলেছিল "তাহলে আর কী। চল বাড়ি যাই"

"এমা। আমি কী ফালতু? ফুচকাটা মিস হয়ে যাবে?"

"বেশ চল"

শুধু ফুচকা নয়, ওর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ কাটাবার ইচ্ছে। রঙিন জীবনের মধ্যে একাকিত্ব কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। প্রলেপ লাগাতে সেরকমভাবে কেউ আসেনি। ছিটেফোঁটা হলেও, ওর মধ্যেই পাওয়ার রেশ খুঁজছিল। স্বপ্নের মানুষটাকে পাওয়ার আশা ছেড়ে তার সান্নিধ্যে মুহূর্তকে উপভোগ। জীবনটা অনেক বড় হতে পারে, মুহূর্তই বা কম কীসের? দুজনে মুখোমুখি একা। মাঝে ফুচকাওয়ালা তবলচি। বাঁয়া থেকে ফুচকায় মশলা মিশিয়ে তেঁতুল জল পুরে ডাঁয়ায় তালপাতায় ওদের সার্ভ করছে। খাওয়া শেষে ভিক্টোরিয়ার লনে।

"স্বর্ণালীকে খু... উ... ব ভালোবাসেন, তাই না?"

"ভালোবাসা ব্যাপারটা বুঝি না। ওকে বিয়ে করব"

বোঝেনি, বিয়ে আর ভালোবাসার পার্থক্যটা। জয়ন্তর গলায় মালা পরিয়ে সমঝোতা করার চেষ্টা করেছিল। বৃথাই...

ফোনে জিজ্ঞেস করল "কোনও ক্লাবে?"

“ক্লাবেও নয়। অন্য কোথাও”

অরুন্ধতী নিশ্চয়ই নিভৃতে ব্যক্তিগত আলোচনা করতে ইচ্ছুক। ক্লাবে সম্ভব নয়।

“ঠিক আছে। আমার আলিপুরে ফ্ল্যাটে সন্ধেবেলায় চলে এস সাড়ে ছটায়। অফিস থেকে চলে যাব। ঠিকানাটা টেক্সট করে দিচ্ছি”

“ডান” ফোন কেটে দিল।

সাড়ে ছটার কিছুটা আগেই অরুন্ধতী ওখানে। অসীমদা তখনও পৌঁছয়নি। ফোন করেছিল ‘ট্র্যাফিকে ফেঁসে। আসছি... দেরি হয়ে গেল’ মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়ির ড্রাইভ ইনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ অরুন্ধতীর কানে এল কোকিলের ডাক। বসন্ত এসে গেছে?

“অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে? ইশ... ট্র্যাফিক জ্যামে ফেঁসে গেছিলাম” অসীমদা গাড়ি থেকে নামছে। লিফটে এগিয়ে ড্রাইভারকে বলল “খাওয়াটা ওপরে নিয়ে এস”

৩০০০ বর্গ ফিটের বিরাট ফ্ল্যাট। অব্যবহারে ধুলোয় সুদৃশ্য ইন্টিরিয়র একাকার। গোপালকে বলল “তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দাও। ধুলোয় টেকা যাচ্ছে না”

অসীম তদারকিতে ব্যস্ত। অরুন্ধতী ড্রয়িংরুমের পশ্চিমের জানলা খুলে দিল। আর কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে না। বসন্তের গোধূলি হারিয়েছে সন্ধ্যার আঁধারে। ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে তো শান্তিনিকেতনের মতো সন্ধ্যার চাঁদ দেখা যায় না। ওপাশে মেটিয়াবুরুজের ছোট ছোট দোকানের আলোগুলো টিমটিম করে জ্বলছে। যেমন মধ্যরাতের অন্ধকারে আলো ঝলমলে শহরকে প্লেন ল্যান্ডের আগে জানলা থেকে দেখায়। অরুন্ধতী নতুন রানওয়ে খুঁজছে উড়ন্ত গতিময় জীবনে।

“তুমি কী পশ্চিমের জানলা খুলে, দেখতে চাও সকালের সূর্য ওঠা পুবটাকে?” অরুন্ধতীর মনের প্রতিধ্বনি অসীমের কথায়। পুবের সাবেকিয়ানা আর পশ্চিমি ঝড়ো হাওয়ায় সে বিধ্বস্ত।

কিছু বলতে যাচ্ছিল। অসীমদা বাধা দিল “দাঁড়াও। খিদে পেয়েছে। আসার পথে খাবার কিনে এনেছি। চা না কফি?... ইশ, দুধটাই আনতে ভুলে গেছি”

“কোনও হার্ডড্রিঙ্কস নেই?”

“জানি না। দেখছি” বার ক্যাবিনেট দেখে বলল “জিন আছে। চলবে?” মাথা নাড়ল অরুন্ধতী “কোনও সফট ড্রিঙ্কস নেই। জল মিশিয়ে খেতে হবে”

“ফাইন। তাতেই হবে”

গোপালকে ড্রিঙ্কস দিতে বলে সোফায়। অরুন্ধতী প্রসাধন ছাড়াই এসেছে। সচরাচর ওকে এমন দেখেনি। সাদা ঢলঢলে সলওয়ার কামিজে, ববচুল পেছনে ঠেলে জিনে চুমুক দিল “কী জানি? কোনটা পুব আর কোনটা পশ্চিম সব গুলিয়ে যাচ্ছে”

“মানে?” বুঝতে পারছে না।

“তুমি তো স্ক্র্যাচ থেকে উঠেছ। তোমার কাছে কোনটা ইম্পরট্যান্ট, সংস্কার না দুনিয়াদারি?”

“মানে?”

“ইফ ইউ ওয়ার টু চুজ বিটুইন দ্য টু, হুইচ উড ইউ ফলো?”

“বোথ”

“ইউ ডিডন্ট গেট মাই কোয়েশ্চেন। আই রিপিট। ইফ ইউ ওয়ার টু চুজ বিটুইন দ্য টু, হুইচ উড ইউ ফলো? ইট হ্যাজ টু বি আইদার অর। কান্ট বি বোথ”

বুঝতে পারছে ব্যাপারটা লাইট নয়। অরুন্ধতী সিরিয়াস কিছু ডিসকাস করতে এসেছে। উপরি চটক, সুপারফিশিয়াল জ্ঞান দিয়ে বেরনো যাবে না। গ্রাসরুটে নেমে উত্তর দিতে হবে। মূল্যবোধের সামনে দাঁড় করিয়েছে। মূল্যবোধের ব্যাপ্তি একদিনে তৈরি হয় না। পারিবারিক মূল্যবোধ, সংস্কার থেকে জীবনযুদ্ধের লম্বা দৌড়ে রূপান্তর। পারিবারিক মূল্যবোধ পরখ করার সৌভাগ্য হয়নি। জ্ঞানবুদ্ধির উন্মোচনের আগেই মা-

বাবাকে হারিয়েছে। নীতি-দুর্নীতি বিচারের সময় হয়নি। নীতির রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে, ধোঁয়াশা সংস্কারের ধ্বজা উড়িয়ে, সাম্রাজ্য তৈরি হয় না।

"যদি একটাই উত্তর চাও, আমার মতে দুনিয়াদারি। ওটা না থাকলে দুনিয়ায় জায়গা করা শক্ত। পায়ের তলায় মাটি থাকলে সংস্কারটা নিজের মতো করে তৈরি করা যায়"

এরকম জবাব অসীমদার কাছে আশা করেনি। অসীমদার অবয়ব বেআবরু সোজাসাপ্টা প্রশ্নে। কলেজের স্বপ্নপুরুষ মায়ালোক ছেড়ে মাটিতে। আপেক্ষিকতার খোলস খুলে নগ্ন কায়া। মুখটা কঠিন। অসীম বুঝতে পারছে ওর ভেতরের আলোড়ন। মুখের রং ক্রমশ বেগুনি। স্থির চেয়ে আছে ওর দিকে। জিনটা ঢকঢক করে পুরো শেষ করে আবার ঢালল। তুমি নয় ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট, কৃতী ছাত্র, চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধার। কিছুক্ষণ আগেও ছিলে স্বপ্নপুরুষ। এই মুহূর্তে সংশয়ের ভূমিতেই নয়, এতদিনের ক্যানভাসের ছবিটাও মলিন হয়ে যাচ্ছে।

অসীম জানলার বাইরে তাকিয়ে "পশ্চিমের জানলা খুলে যতই দেখার চেষ্টা কর, পুবের অতীতই ভিত স্থাপন করে। মান চাই না মন" ফিরে অরুন্ধতীর পাশে বসল "তোমাদের মতো ঠান্ডা ঘরে বসে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ পড়িনি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে জীবনকে দেখেছি। শাস্ত্রে কী লেখা, তাও পড়িনি। একটা কথাই জানি। বেঁচে থাকাই আসল পথ। সেখানে নীতি নেই, দুনিয়াদারি"

গোপাল টেবিলে খাবার সাজিয়ে বলল "এখন সার্ভ করব?"

"না। তুমি চলে যাও। আমরা নিয়ে নেব" গোপাল ওদের রেখে বেরিয়ে গেল। বাবু সময়মত ড্রাইভ করে চলে যাবে। দেরি থাকলে ওকে আটকে রাখে না।

ফ্যাশন আন-লিমিটেডের ওই ছোট্ট ডিসিশনের পরিপ্রেক্ষিতে এক বৃহত্তর প্রশ্নের সামনে অরুন্ধতী। যা এতদিন অন্তঃসলিলা, আজ বসন্ত সন্ধ্যার আঁধার ভেদ করে জ্বলে উঠেছে চাঁদের মৃদু আলোকে।

"তোমার কাছে নীতি নেই?" অরুন্ধতী বিমূঢ়।

"নীতি তো আমি ঠিক করব" দৃঢ়ভাবে জবাব দিল।

অরুন্ধতী বুঝতে পারল না, এটা অসীমদার জীবনবোধ, না উন্নতির শিখরের অহং। অনেক সময় অহংটা মূল্যবোধের ওপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করে, যে কোনটা অন্তরের চেতনা আর কোনটা বাইরের মুখোশ, বোঝা মুস্কিল। এসেছিল দ্বন্দ্বের সুরাহা খুঁজতে। মনে হচ্ছে, অসীমদা ভেতর বাহির গুলিয়ে কনফিউজড।

অরুন্ধতী চুপ করে রইল। অসীমদার জায়গায় দাঁড়িয়ে সদর্পে বলে যায় 'নীতি আমি ঠিক করব', কিন্তু ফ্যাশন আনলিমিটেডের ছাপোষা কর্মচারীর পক্ষে তা বলা সহজ নয়। বললেই বা, শুনছে বা মানছেই বা কে?

ভেতরের কনভিকশন বলে দিলে আজও কেন অসীম বারান্দায় বসে ধ্রুবতারা খোঁজে? কেনই বা অন্ধকারে শুনতে চায় নতুন সুর? জানলার বাইরে তাকিয়ে আড়চোখে দেখল অরুন্ধতী জিন গিলছে, সিগারেটের পর সিগারেট ফুঁকছে। বুঝতে পারছে ওর মধ্যে তোলপাড় চলেছে। মৃত্তিকাকে নিয়ে নিজের তোলপাড়ই আকারে-ইঙ্গিতে ওর দিকে ঠেলে দিয়েছে। নিজের যন্ত্রণা একা না বইতে পেরে, অন্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার মধ্যেই সাময়িক মুক্তি।

মৃত্তিকার পুলিস ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্টটা শোনার পর থেকেই বিক্ষিপ্ত মন। ফাইল নিয়ে বসবে, হঠাৎ গৌতম অধিকারীর ফোন "স্যার, মৃত্তিকার ডেথ নিয়ে রিপোর্টটা এসেছে। উড ইউ মাইন্ড ইফ আই কাম অ্যান্ড শেয়ার ইট উইথ ইউ?"

"নট অ্যাট অল। মোস্ট ওয়েলকাম। হোয়েন ডু ইউ ওয়ান্ট টু কাম?"

"নাউ। ইফ ইউ আরেন্ট দ্যাট বিজি"

"কাম ওভার"

ফোনটা কাটার পর থেকেই কাজে মন বসাতে পারল না। নতুন কী সংবাদ আনছে গৌতম? উৎকণ্ঠায় চেম্বারে পায়চারি করেছে। সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দিয়েছে। গৌতম আসার পর সেক্রেটারিকে কফির অর্ডার "প্লিজ সি দ্যাট আই অ্যাম নট ডিস্টার্বড" অ্যাডিশনল কমিশনর অফ পুলিসের দিকে উদগ্রীব তাকিয়ে।

"ফাউন্ড দ্য কস অফ হার এডস। উনি আগে বাঘাযতীন রিফিউজি কলোনিতে থাকতেন। তারপর পাইকপাড়ায়। সেখানে থাকার সময় ওনার একবার খুব অসুখ হয়। এন্ডোমেট্রিওসিস উইথ সিভিয়ার ব্লিডিং। সি ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল। ওখানে ব্লাড ট্র্যান্সফিউশন দেওয়া হয়। সি কন্ট্র্যাক্টেড এডস ফ্রম দেয়ার"

অসুখের কথাটা অজানা। বিয়ের পর স্বর্ণালীকে নিয়ে হুটহাট এখানে-ওখানে বেড়াতে চলে যেত। সেই সময়ও হতে পারে কিংবা পরে। যখন কয়েকবার কন্টিনেন্ট বা স্টেটসে বেড়াতে গেছে। বোধহয় গায়নাকলোজিক্যাল প্রবলেম বলে অসীমকে জানায়নি। একদিক থেকে নিশ্চিন্ত। যে গৌতম ভুল বুঝবে না। মৃত্তিকার সততা নিয়েও সন্দেহ নেই। তারপরে যে কথাগুলো গৌতম বলল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। শোনার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় বসে। এরকম কিছু আশা করেনি। যদিও ব্যক্তিগত স্ক্যামের সততা প্রমাণিত, তবুও এটা আনএক্সপেক্টেড। ভবতেও পারছে না, মৃত্তিকা সম্বন্ধে।

"ঠিক বলছেন তো?"

"স্যার, কনফার্ম না করে কী আপনার কাছে আসব?"

সত্যিই তো। কনফার্ম না করে কী পুলিস বলবে? ছানবিন করেই এসেছে।

"সোমদত্তাকে চেনেন?"

"না"

"আপনি তো মৃত্তিকা দেবীকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন"

"হ্যাঁ। ঠিকই। চিনলেও এ কথা জানতাম না?"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি ওনার সবই জানেন"

কী বোঝাতে চাইছে বুঝল না। সেটাতেই বিচলিত। শুধু কী মৃত্তিকার ইতিহাস? না নেপথ্যে কাহিনিটাও শুনতে এসেছে? অসীম বুঝতে পারছে না। যতই স্যার স্যার করুক, আফটার অল পুলিস তো। সব সময়ই রহস্য খোঁজে।

সেখানেই বিড়ম্বনা।

সেখানেই চিন্তা।

সেখানেই সংশয়।

সেখানেই ভয়।

ভয়টা গৌতমকে নয়। সাজানো পৃথিবীর ভিতরে বুঝি মৃত্তিকার মৃত্যু ছোবল মারার চেষ্টা করছে। বহির্জগৎ থেকে অন্দরমহলে। রেশটা কতখানি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বর্ণালীর ব্যবহারে। যদ্দিন না তার সন্ধান মিলছে, তদ্দিন বিক্ষিপ্ত মন বর্মে ঢাকা। তার বহিঃপ্রকাশ দেখছে অরুন্ধতী।

"নীতি তো আমি ঠিক করব" এর পরে অরুন্ধতী আর কী বলবে?

"চল, খেয়ে নিই। তোমার তো বাড়ি ফিরতে হবে"

"হ্যাঁ চল"

অসীম উঠতে যাচ্ছিল। অরুন্ধতী বাধা দিল "তুমি বস। আমি রেডি করছি"

অরুন্ধতী জবাব পেয়ে গেছে। এতদিনের ভাস্কর্য ধীরেধীরে গলে খসে পড়ছে। কঠিন বাস্তবে দাঁড়িয়ে সে নতুন করে মানুষ চিনছে। বাইরের মুখোশ দেখে কত লোককেই বিচার করি। ঘটনার সামনে না এলে

সত্যিকারের চেনা যায় না। এই চেনার মধ্যেই নিজেকে দেখতে পারছে। যা এতদিন অধরা ছিল। আজ দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেকে নতুন করে চেনা। অজান্তে নতুন অভিষেক।

তেইশ

নিতাইয়ের মা অবাক। দাদাবাবু আজকে আবারও হুইস্কি চাইল। এতদিন দেখছে, সিগারেট পর্যন্ত খায় না। মদ কালেভদ্রে। কাজের শেষে বাড়ি ফিরে টিভি দেখা ছাড়া অন্য কোনও সাধ-আহ্লাদ নেই। এখন রোজ সন্ধেতে হুইস্কি। সুবিধার ঠেকছে না। দিদিমণিই বা কী? কাজের পর একদিনও সন্ধেবেলা বাড়িতে থাকে না। টুবলু যে কোন পরিবেশে বড় হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

ভাঙা মেরুদণ্ড সোজা করতে হুইস্কিতে চুমুক। বসার ঘর থেকে হাঁক দিল "টুবলু, ঠিক মতো পড়ছিস তো?"

"হ্যাঁ বাপি"

"দরকার হলে বলবি" পাশের ঘর নিরুত্তর।

অনেকটা হুইস্কি একসঙ্গে গিলে ফেলল। তরলটা গরল নয়, অমৃত। ভাঙা মেরুদণ্ডে মলম।

ঘর থাকতেও, সংসার নেই।

স্ত্রী থাকতেও, সহবাস নেই।

যৌবন থাকতেও, কামনা চরিতার্থের ক্ষমতা নেই।

অর্থ থাকতেও, ভাগ করার কেউ নেই।

নেশার মাদকতা হারানো মনোবলকে জাগিয়ে দিচ্ছে। না-পাওয়া দুনিয়া ধিক্কার জানাচ্ছে না। বিদ্রূপ করছে না। কটাক্ষ করছে না 'তুমি ব্যর্থ পুরুষ'। বাবা তো কখনও সেকথা বলেনি।

"তুই একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবি"

বুঝেছিল, পরীক্ষায় ভালো ফল করলেই সেখানে পৌঁছনো যায়। পৌঁছতে চেয়েছে পেশায় উত্তরণে। রাতের আঁধার যত বাড়ছে, হুইস্কিটা মাথায় ঠেকছে। অচেনা বল অনুভব করছে। মাথায় 'নির্জন আশ্রয়' অরফ্যানেজ হোমের কথা। এক সময় ওখানের বাসিন্দাদের কত সাহায্যই না করেছিল। কাস্টমসের কনফিস্কেটেড ইল্লিগ্যাল ওষুধ, বিদেশি জামাকাপড় দিয়ে। ওদের কৃতজ্ঞতাবোধ এখনও হারিয়ে যায়নি। রুচিশীল সমাজের কাছে যখন স্বীকৃতির আশা ক্ষীণ, এই অভাগারাই যোগ্য সম্মান দিতে পারবে।

অরুন্ধতীর সঙ্গে বিয়ে না হলেই ভালো হত। ওর কাছে তেমনভাবে সমাদৃত নয় জানে। অন্য সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করলে পারিবারিক জীবন বাঁচত। সচ্ছল পরিবারের মেয়েদের কাছে শিক্ষা, কর্মদক্ষতা গৌণ। মুখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা। শিক্ষার একমুখী অর্থ বুঝে কেন যে বাবা এই ভুলটা করেছিল?

তখনও বিয়ের মাদকতা ক্ষীণ হয়ে যায়নি। অরুন্ধতী একদিন বলেছিল "আমার স্বামীকে সবকিছুর ওপরে দেখতে চাই"

জয়ন্ত বিনম্র "সবাই কী, সব কিছু করতে পারে?"

"নিশ্চয়ই পারে" অরুন্ধতী দৃঢ়।

সেকথা মাথায় রেখে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। ফল কাজে দ্রুত পদোন্নতি। এত কম বয়সে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিগ্রহণ করেও, অরুন্ধতীর মনের কাছে পৌঁছতে পারেনি। উত্তরণের সাফাই না গাইলেও, প্রকারান্তরে কর্মদক্ষতা আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছে।

ব্যঙ্গের স্বরে অরুন্ধতীর টিপ্পনী "এ এমন কী? গভর্নমেন্টের চাকরি করলে প্রমোশন স্বাভাবিক। কৃতিত্বের কী আছে?"

মুহূর্তে কৃতিত্বের পারদটা নামিয়ে বর্তমানের সার্থকতার মাপকাঠিতে। সেখানে সে বেমানান। তবুও সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল “কৃতিত্বটা তোমার কাছে কী?”

“শুধু কাজে নয়, অর্থে, সামাজিক প্রতিপত্তিতে, সর্বচ্চ। তোমার সে মুরদ নেই”

কে বলল নেই? প্রমাণের নেশায় বিপথে অর্থ রোজকার। কিন্তু সেই অর্থে বসেও শূন্যতা।

নিতাইয়ের মা পাশের ঘর থেকে হাঁকল “বৌদিমনি কখন আসবে?”

“কেন?”

“মোবাইলে কার্ড চার্জ করতে হবে”

“বেশ তো, যাও”

“আপনাকে একা রেখে যাব না। পরে একদিন করব”

মন ডুকরে কেঁদে উঠল। কাজের লোকের অনুভূতি যে বিবাহিত স্ত্রীর থেকে বেশি চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল। চোখে জল এসে গেল। এ কোন সাজানো স্বর্গরাজ্যে? মাঝে মধ্যে মনে হয় সব ছেড়ে উদ্দেশ্যহীন বেরিয়ে পড়তে। অতীত আর বর্তমান দুটোকেই পেছনে ফেলে, অচিনপুরে। জীবনের তালগোল পাকানো ঠাট্টাগুলো যখন আশেপাশে ভিড় করে, মনে হয় পালিয়ে যায়। অচিনপুরের রাজকন্যার সোনার কাঠির স্পর্শের আশায়। আজ শুধু মাঝরাতে দুঃস্বপ্নের সহায়তা। মনে হয়, পালায় ইতিহাসের ধরাছোঁয়ার বাইরে, ভারী কালো পর্দার আড়ালে। বাঁচার তো অবলম্বন চাই।

পরের দিন অফিসের পর সোজা নির্জন আশ্রয়। সঙ্গে উপহারের থলি। নেওয়াতে নয়, দেওয়াতে। হোক পণ্যটা অসাধু উপায়ে একত্রিত। ক'জনই বা দুহাত খুলে দিতে পারে? তার কোনও মূল্য না থাকতে পারে। রক্তিমা বিদ্রুপ করতে পারে। তবুও কেউ আছে যারা এখনও মূল্য দেয়।

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম ডিভিশনে পাশ করার পর বাবা একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে ডেকেছিল “জতু এ ঘরে আয়”

ঘরে ঢুকতেই, নতুন ঘড়ি দিয়েছিল “দেখ তো, পছন্দ কি না”

মনটা পাওয়ার আনন্দে ভরে গেছিল। একবারও ভাবেনি বাবার মনের কথা। বাবার আনন্দটা যে দ্বিগুণ, এত বছর পর বুঝতে পারছে। পাওয়ার মধ্যে অপূর্ণতা থাকলেও, দেওয়ার মধ্যে নেই। দেওয়ার মাধুর্য অনুভব করছিল।

“অনেকদিন পর?” হোমের ইনচার্জ প্রমীলা দাসগুপ্ত জয়ন্তকে অভ্যর্থনা জানাল।

“কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আসা হয়নি। সব ভালো তো?”

“চলে যাচ্ছে। আপনি এলে মেয়েরা খুশি হয়। সব সময়ই ওদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসেন”

“এবারও” উপহারের থলি ওনার হাতে তুলে বলল “ডিস্ট্রিবিউট করে দেবেন”

“চা বলি?”

“আজ নয়। অন্য কোনওদিন”

“আপনিই ওগুলো ওদের হাতে দিয়ে দিন। ওরা খুশি হবে”

উপহার বিলি করতে হুড়মুড়িয়ে পড়ল মেয়েগুলো। ওরা ওগুলোতে মশগুল। জয়ন্ত ওদের চাহনিতে ফিল্টার করছে। অরফ্যানেজের হলে কী হবে। ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ডাগরডোগর। সাজগোজে থাকলে, চোখে লাগার মতো। যৌবনের আবেদন চাকচিক্য, জৌলুসে নয়, চোখের চাহনি, গঠনেও। শ্যামলা রঙেরও নিজস্ব মাধুর্য আছে। নয় রক্তিমার মতো মড, গৌরবর্ণা নয়। তাতে কী? অন্ধকারে যখন মজে মন, কে বা হাড়ি, কে বা ডোম। তাদের অভ্যর্থনার মধ্যেও আরেক ধরনের পাওয়া। ধন্যবাদের বন্যা, জয়জয়কার। গতানুগতিক জীবনে ছন্দপতন।

আগে বেশ কয়েকবার এসেছে উপহার নিয়ে। কেন, নিজেও জানে না। তখনও কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজে বদলি হয়নি। ইনল্যান্ড রেভিনিউতে। হঠাৎ একদিন প্রমীলা দেবী উপস্থিত। হাতে বিল “এই বিলটা গত

সপ্তাহে পেয়েছি। আমাদের সব ট্যাক্স ক্লিয়ার। এ বিলটা কেন? নিশ্চয়ই গণ্ডগোল হয়েছে”

“অফহ্যান্ড বলতে পারব না। রেখে যান। ইনভেস্টিগেট করে দেখব। পরের সপ্তাহে আসুন” জয়ন্ত বিলটা রেখে বলেছিল।

পরের সপ্তাহে আবার প্রমীলা দেবী। ফাইলটা খুলে বলেছিল “বেহালায় নারী নিকেতন?”

“অরফ্যানেজ হোম। আমাদের কোথায় অত টাকা যে বাড়তি ট্যাক্স দেব?”

“লাস্ট পেমেন্টের রিসিটটা এনেছেন?”

প্রমীলা জয়ন্তর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল “আপ্টুডেট পেমেন্ট করা আছে। দেখুন”

সত্যিই তো। পেমেন্ট আপ্টুডেট। কোথাও গড়বড় হয়েছে। ব্রজবাবুকে ডাকতেই, উনি বিলগুলো নিয়ে চলে গেলেন “একটু সময় দিন স্যার। দেখে বলছি”। আধঘণ্টা পর ফেরত “স্যার বেহালায় নারী নিকেতন বিদ্যামন্দির আছে। ওরা ডিফল্টার। যে বিল পাঠিয়েছে, বিদ্যামন্দির শব্দটা ওভারলুক করেছে। ঠিক করে দিচ্ছি, স্যার”

ব্রজবাবু বেরিয়ে যেতে, প্রমীলা দাসগুপ্তকে বলেছিল “আমাদেরই ভুল। কোনও ট্যাক্স দিতে হবে না। কোথায় আপনাদের নারী নিকেতন?”

“বেহালায়। আমরা ডোনেশনে চালাই। কোথায় আমাদের এত টাকা? একদিন আসুন না আমাদের ওখানে। ভালো লাগবে” ঠিকানা ফোন নম্বর রেখে চলে গেছিল।

জয়ন্ত নামকেওয়াস্তে রেখে দিয়েছিল। পরে একদিন বেহালায় একটা কাজে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায়, ভাবল, কেনই না একবার চক্কর মেরে আসে। প্রমীলা দেবী ওকে দেখে উৎফুল্ল “কী ভালো লাগছে আপনি এলেন”

চা খাইয়েছিল। ঘুরে ঘুরে হোমটা দেখিয়েছিল। বেশ অনেকটা জমি নিয়ে হোম। একদিকে মেয়েদের থাকার হোস্টেল। অন্যদিকে অ্যাসবেস্টসের শেড দেওয়া কারখানা। সেখানে কেউ সেলাই করছে। কেউবা হাতের কাজের নানাবিধ সামগ্রী তৈরি করছে।

“এরা খুব ট্যালেন্টেড। এখানে আমরা শুধু অ্যাডাল্টদের রাখি। অন্যান্য বাচ্চাদের রাখার সিস্টার কন্সার্নগুলো এখানে পাঠিয়ে দেয়। এরা যে হাতের কাজ করে, সেগুলো মেটিয়াবুরুজ কিংবা অন্য কোথাও বিক্রি করি। তাই দিয়ে হোমে কিছু রোজগারও হয়, ওদের হাতখরচও ওখান থেকে দিতে পারি। যদিও তেমন কিছু নয়। যৎসামান্য। তবুও ওরা তাতেই খুশি”

ইম্প্রেসিভ। সরকার তো এসব কুটিরশিল্পের ওপরই এখন বেশি করে জোর দিচ্ছে। এদের ডেডিকেশন দেখে আশ্চর্য লেগেছিল। আহাঃ! অরুন্ধতীর যদি সংসারে এদের মতো ডেডিকেশন থাকত। জীবনটা অন্য রকম হত। পড়াশোনার মধ্যে ওর যে ডেডিকেশন ছিল, সংসার বা জয়ন্তর প্রতি তার ছিটেফোঁটাও নেই। একাগ্রতার মধ্যেই শান্তি, তৃপ্তি, পরিপূর্ণতা। ফলটা বাড়তি। তারপর, যখনই একা অসহায় লাগত, চলে আসত। ওদের না-পাওয়ার মধ্যে কোথায় শান্তি বোঝেনি। কিন্তু আছে। পরে যখন কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজে বদলি হল, কনফিস্কেড মালগুলো বিতরণ করে অস্তিত্বের নতুন সংজ্ঞা। শান্তিটা ওদের দেখে না অস্তিত্বের কদরে, জানে না। তবু বারবার আসা। এবারেরটা অবশ্য অন্য। রক্তিমার শ্লেষ, অরুন্ধতীর অবজ্ঞা বিদ্বেষে মরিয়া।

তৃপ্তি চাই। শান্তি চাই। মুক্তি চাই।

যেমন সাবাই নিজের মতো করে খোঁজে সেও খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। সে নীলোৎপলের টাকা, রক্তিমা কিংবা দানধ্যানে হোক। শান্তিটাই আসল, পথটা নয়। সন্ধে কাটিয়ে যখন বাড়িতে, মনটা ভরে গেছে। না থাক অরুন্ধতী। ক্ষতি নেই। আজ হুইস্কির প্রয়োজন নেই। নেশাটা হুইস্কির চেয়েও দামি। পরিতৃপ্তির রসদ। অনেক বেশি জীবনদায়ি। সেই নেশায় ডুব দিল জয়ন্ত।

চব্বিশ

মিঃ রহিমের কন্ট্র্যাক্ট ফর্ম পড়ে আছে। বর্ণালী ভেবেছিল না করে দেবে। আবার একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ অসীমদা অফিস ফেরত হাজির। তখন সবে সান্ধ্য স্নান সেরে বেরিয়েছে। ভেজা চুল পেছনে ঠেলে, হাউসকোটের দড়ি বেঁধে দরজা খুলে দিল।

"হঠাৎ, ফোন না করে?"

"এখানে আসতে গেলে সবসময় ফোন করতে হবে?"

"একদমই নয়" একগাল হেসে বলল "বস। চিরুনিটা নিয়ে আসি। স্নান সেরে বেরলাম"

অসীম চুল আঁচড়ান বর্ণালীকে বলল "কী ঠিক করলে?"

"কী ব্যাপারে?"

"রেকর্ডিং কন্ট্র্যাক্ট"

"ওসবে জড়িও না। নাম করে কামানোর জন্য গান শিখিনি"

"জানি। এভাবে দেখছ কেন? এটা ভবিষ্যতের পাথেয়। ঠিক আছে। রেকর্ডিং-এর কথা পরে। যদি তোমার সোলো প্রোগ্রাম অরগ্যানাইজ করি, আপত্তি থাকার কারণ দেখছি না। এই সুবাদে রেওয়াজও হয়ে যাবে"

বর্ণালী ভাবল। সত্যি তো। প্রোগ্রাম করতে তো বাধা নেই। সোলো প্রোগ্রামে দুঘণ্টায় অনেকগুলো গান। সেই সুবাদে একটানা রেওয়াজও হবে, আবার জনসমক্ষের জন্য আগের তালিমও।

চিরুনিটা সাইড টেবিলে রেখে বলল "ঠিক আছে"

'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি কোন নব চঞ্চল ছন্দে

মোর অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয় স্পন্দে...'

বর্ণালীর সুরের আত্মপ্রকাশ কলামন্দিরের রিভার্ব সাউন্ড সিস্টেমে আরও দরদিয়া। নতুন কণ্ঠের রাবীন্দ্রিক তপস্যা ভরিয়ে দিচ্ছে শ্রোতাদের। সুর কবিগুরুর ভাবকথাকে প্রদক্ষিণ করছে, চেনা লয়ে।

শঙ্কিত হয়ে অসীমকে বলেছিল "বড্ড ভয় করছে"

"ভয়ের কী আছে? সবাইকেই প্রথম পারফরম্যান্স দিতে হয়। ঠিক উতরে যাবে"

সকালের রেওয়াজ বা একলা খালি গলায় গান গাওয়া এক। আর হল ভর্তি লোকের সামনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সঙ্গে গাওয়া অন্য। অনেক তফাত। মেট্রোনোমে গলা সেধেছে। সাউন্ড মনিটরিং-এর কিছুই জানে না। বিচলিতভাবে কিবোর্ড প্লেয়ার সুবিমল সাহাকে বলল "কিছুই জানি না সাউন্ড মনিটরিং"

"কিচ্ছু ভাববেন না দিদি। আমি সব দেখে নিচ্ছি। চুপচাপ বসে গানগুলো ঠিক করে নিন। কোন স্কেলে ধরবেন বলে দেবেন" সুবিমল আশ্বস্ত করল।

কলামন্দিরের ১২০০ সিট ভর্তি। বুঝতে পারছে না অনামী গায়িকাকে শুনতে এত ভিড় কী ভাবে? দেখেছে পোস্টার, হোর্ডিং, মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন। ফেসবুক করে না। তাই আলাদা কোনও আমন্ত্রণ নেই। বাঁ দিকের প্রেসের আসন পরিপূর্ণ। ক্যামেরা, মাইক নিয়ে রিপোর্টাররা হাজির। এসব ঘটল কী করে? নিশ্চয়ই অসীমদার অদৃশ্য হাত।

স্বর্ণালী তুলিকে নিয়ে প্রথম সারিতে। অসীম স্টেজের পাশে কারও সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। তুলির আনন্দ দ্বিগুণ। মাসির গান এই প্রথম হলে শুনছে। মায়ের কাছে বহুবার শুনেছে, মাসি একসময় গাইত। বাড়িতে মায়ের বহু অনুরধেও গায়নি। আজ প্রথম শুনবে। কী যে ভালো লাগছে। স্বর্ণালী নিঃস্পৃহ। অসীমের থেকে দূরে সরে গেছে এই ক'মাসে। মৃত্তিকাদির স্ক্যাম ধামাচাপা পড়লেও, এখনও মেনে নিতে পারছে না তাদের

সম্পর্কের স্বাভাবিকতা। যা রটে, তার কিছুটাও তো বটে। ইদানীং দিদির প্রতি অতিরিক্ত উৎসাহও চোখ এড়ায়নি। মাত্রাতিরিক্ত। আগ বাড়িয়ে প্রোগ্রাম অরগ্যানাইজ। মনে হয়েছে অসীম বাড়াবাড়ি করছে। যদিও মুখে প্রকাশ করেনি। হাজার হোক দিদি তো। বিজিতদা চলে যাওয়ার পর থেকে কী আছে জীবনে? এইটুকুতে যদি কিছু পায়, তাতেই আনন্দ। ছোটবেলা থেকে দিদি তো দিয়েই এসেছে। বিনিময় কোনওদিনও চায়নি। যদি এই আনন্দটুকু দিদির জীবনকে ভরাট করতে পারে, ওর থেকে বেশি কেউ খুশি হবে না।

ঘণ্টা বেজে আলো-আঁধারি। অন্ধকারে পর্দা খুলতেই আলোর ফোকাস দেবাশিস বসুর মুখে। হাতে মাইক, সাদা চুড়িদার, বাসন্তী পাঞ্জাবি। চিরপরিচিত উদাত্ত কণ্ঠে সম্বোধনঃ

‘যার আলোতে পথটি চলা
যার বোধিতে কথা বলা
প্রিয় তিনি; পূর্ণ প্রাণের মিতা
সুখের দিনে রঙের মেলায়
দুখের দিনে তপের বেলায়
কবিই সাথি – একক সঞ্চয়িতা’

উপস্থাপনার শেষে নমস্কারান্তে দৃঢ়, বলিষ্ঠ, দরদি বর্ণালীর কবিবন্দনা। রেওয়াজের জন্য প্রথম গানেও জড়তা নেই। সাবলীল সুরসাগরে ভেসে ভুলে গেছে, সামনে হাজার দর্শক। ডুবে গেছে সশব্দ পূজায়। অন্ধকার মিশে গেছে নির্জনের একাকী নিভৃতে। হারানো দীপ আবার জ্বলে উঠছে সহস্র শ্রোতার মুগ্ধতায়। ঘোরে গেয়ে চলেছে। খোয়াইয়ের চাঁদনি আকাশে নক্ষত্র খোঁজা।

একটা... দুটো... তিনটে... ধীরে ধীরে রোশনাইয়ে মেতে উঠছে, নিভৃত অন্তরের সন্ধ্যারতি। তার এতদিনের সাধনার নৈবেদ্য। অন্তরের অর্ঘ্য। সুর সেখানে মিশেছে বেদনার উপাসনায়। সামনে কেউ নেই – অসীমদা, স্বর্ণালী, তুলি, সম্বিত বা বিজিত। হলভর্তি দর্শকও নয়। গভীর অন্ধকারে পূর্ণতার আবরণ। ওখানেই শান্তি। ওখানেই মায়ালোক। অন্ধকারকে আর ভয় নেই। পালাতেও চাইছে না। বরণ করতে চাইছে।

কোনও মন্ত্রে নয়। অসীমের বিভোর স্বপ্নেও নয়। মায়া পৃথিবীর প্রকাশ্য দীপালোকে। অন্ধকার আলো মিলেমিশে একাকার, নব-অনুভূতির আঙ্গিকে। জীবাত্মার এই আলোক দর্শনই পরমাত্মাকে চেনার অভিষেক। আজ যেন তার পরম ক্ষণ।

কণ্ঠে সুরের ঝর্ণাধারা ‘এ কি লাবণ্যে পুণ্য প্রাণ, প্রাণেশ হে...’ ‘যদি তারে নাই চিনি গো...’ ‘চিত্ত পিপাসিত রে...’ ‘দখিন হাওয়া জাগো জাগো, জাগাও আমায়...’

বিজিতের মৃত্যুর পর কতবার অসীম গাইতে বলেছে। কিছুতেই রাজি হত না। বিজিতের চিরবিদায়ের সুর এতদিন তার বর্ণহীন জীবনের সব তান কেড়ে নিয়েছে। ফেরাতে চায়নি। ফেরেওনি। সেদিন নিরালা অন্ধকারে দুঃখের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার দ্বার খুলে দিল। শশিভূষণ দে স্ট্রিটের বর্ণালী নতুন করে খুঁজে পেল ব্যথার সাগর থকে আলোকিত পথে। নতুন মন্ত্রে। নতুন পূজার অর্ঘ্যে। নৈবেদ্য সাজাতে অচেনা–অজানা লোকে। মর্তলোককে নতুন করে পেতে।

গান তখনও শেষ হয়নি। দেবাশিস স্টেজে। গান থামিয়ে দেবাশিস বসুকে দেখছে, বলে চলেছেঃ

“এতক্ষণ আপনারা বর্ণালীর গান শুনলেন। শুনতে শুনতে মনে একটা ছবি আঁকা হয়ে গেল – শব্দ ছবি।
লাল হয়ে যাক লাজুক কিশোরী
লাল সে তো শেষ বিকেলের আকাশ
মাটি লাল করে আর নয় কোনও নাম
বোধি প্রাঙ্গণে হাসুক কেবল
পূর্ণ প্রেমের পলাশ”

বর্ণালীর দিকে ইঙ্গিত "শেষ হয়েও যা শেষ হয় না, সেই আজকের সারথি। গেয়ে যাও তুমি আজ বিদায় বেলার শেষ গানের সন্ধ্যারতি"

বর্ণালীর পুজো তখনও অপূর্ণ। গেয়ে চলেছে দিনশেষের বিদায়বেলার ছন্দমালা 'বরিষ ধারা মাঝে শান্তির বাণী'

বর্ণালীর গান শেষ। বেরিয়ে আসছে মুগ্ধ শ্রোতারা। মন্ত্রমুগ্ধ স্বর্ণালীও। তুলির হাত ধরে সাইড-উইং দিয়ে গ্রিনরুমে। অরুন্ধতী ইতি-উতি চাইছে। বুঝতে পারছে বর্ণালীর আরেক যাত্রার শুরু। নিজে এই যুগসন্ধিক্ষণে অকূল সমুদ্রে। বর্ণালীর পূর্ণতায় নিজের শূন্যতার রাগ লোকের ভিড়েও। নক্ষত্রের নাম বহন করেও তাকে খুঁজছে শূন্যতার মধ্যে।

"ধুস শালা, জীবনটা দিনগত পাপক্ষয়, যদ্দিন না কেওড়াতলায়" কলেজ জীবনে সৌম্য ঠাট্টা করত।

"এত ডিপ্রেসিভ কেন?" উঠতি বয়সে বুঝতে পারত না।

এখন মনে হচ্ছে, ডিপ্রেশন নয়। গতানুগতিকতা থেকে ধূমকেতুর মতো বেরিয়ে সামগ্রিকভাবে জীবনকে দেখা। হয়ত বিচ্ছিন্নভাবে জীবনটাকে দেখেওছিল। তবে জীবনে থেকেও মুক্ত। যুগের তালে তাল মিলিয়ে সব কিছুই করেছে মনের মতো করে। নিয়মের আপেক্ষিক বেড়াজালে সামাজিক ভূষণ না দিয়ে। আজ সৌম্য কোথায়, জানে না। হয়ত এক উলঙ্গ পৃথিবীতে জীবনের গান শোনাচ্ছে। হারিয়ে গেছে, মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আপনভোলা জগতে।

যদি আবার দেখা হত, জিজ্ঞেস করত "পেলি বাঁচার রসদ?"

আজ কাউকে জিজ্ঞেস করার নেই। সবাই জীবন খুঁজছে গোলকধাঁধায়। সৌম্যই স্বতন্ত্র। জীবনকে খুঁজেছিল তার বাইরে।

একদিন বলেছিল "তোরা শালা সব বোকা। স্পন্দন খুঁজছিস জীবনের গণ্ডিতে। কিসসু পাবি না। হারিয়ে যাবি এক্কাদোক্কা খেলায়"

বড্ড চাওয়া। বড্ড খিদে। পাওয়ার লোভ। না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব।

এখানেই অরুন্ধতী। সৌম্যকে বিয়ে করলে ভালো হত। কিন্তু ও যে বিয়ে করার পাবলিক নয়। সেখানেই অঙ্কের গোলমাল। যাকে বিয়ে করা উচিত, সে এল না। যার গলায় মালা দিল সে জীবনকেই দেখল না। এটাই ট্র্যাজেডি। গতস্য শোচনা নাস্তি।

ফাঁকা হলে ওকে একা দেখে অসীম এগিয়ে বলল "একা?"

"স্বর্ণালী, বর্ণালীর সঙ্গে কথা বলতে গেছে। তাই বসেছিলাম"

অসীমের মনে হল ও নির্জনতা খুঁজছে। তার উপস্থিতিও বাড়তি। বর্ণালীর শেষ গানের কথা ভাবছিল 'বরিষ ধারা মাঝে শান্তির বাণী'। সৌম্য কোথায় জানে না। মানুষ অজান্তেই সত্য বলে ফেলে। ভাবি পাগলামি। হয়ত ঊর্ধ্ব দর্শন।

স্বর্ণালী, বর্ণালী, তুলি স্টেজ থেকে বেরিয়ে এল।

"তুই এখানে একলা? অসীম, ওকে ভেতরে আনলে না কেন?" স্বর্ণালীর জিজ্ঞাসা।

"ভিড় খালি না হওয়া পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি কে কোথায়"

অরুন্ধতী বর্ণালীর হাত ধরে বলল "দারুণ গেয়েছ। শেষ গানটা ফ্যান্টাস্টিক। মন ছুঁয়ে গেছে"

লাজুক হাসল বর্ণালী। এত প্রশংসায় ওর কোনও অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নেই। যেমন ছোটবেলা থেকেই দেখছে। শান্ত, সংযত, ধীর, অবিচলিত। মাঝেমধ্যে মনে হয় এত ঝঞ্ঝার পরেও ওর সংযমে ভাটা নেই? অরুন্ধতী দেখেনি। যদি ওর কাছে জানতে পারত, নিজের দ্বন্দ্বের সুরাহা হত।

বর্ণালী বলল "ভাবিনি, গানের অনুষ্ঠান করব। অসীমদার জোরাজুরিতেই এই প্রথম পাবলিক ফাংশনে"

"বেশ করেছ। না করলে কি এমনভাবে সারা সন্ধে তোমার গান শুনতে পারতাম"

তুলি পাশ থেকে বলল "মাসি খু... উ... ব ভালো গায়"

স্বর্ণালীর মনে হল, ঐশ্বর্যময় সংসারে নিজের বলে তো এখনও কিছু করতে পারেনি। প্রাসাদ, সোসাইটির ঘেরাটোপে নিজস্বতা প্রশ্নের সম্মুখীন। তুলির কথাতেই স্পষ্ট।

হঠাৎ অসীম প্রপোজ করল "লেটস সেলিব্রেট। চল, কোথাও গিয়ে সেলিব্রেট করি"

"কোথায়?" তুলি বাবার দিকে তাকিয়ে।

"স্যাটারডে ক্লাব অর ট্যাঞ্জারিন্স। দুটোই কাছে। উই ক্যান হ্যাভ কন্টিনেটাল অর চাইনিজ"

"আবার এসব কেন অসীমদা?" বর্ণালী ইতস্তত করছিল।

অরুন্ধতী বাধা দিল "অসীমদা যখন খাওয়াচ্ছে, আপত্তি কর না"

প্রত্যেকে ভুলতে চায় একাকিত্ব।

অরুন্ধতী লবস্টার মুখে পুরে বলল "এমন যদি হত। দিদির গান গরজিয়াস ডিনার নিয়ে, সব ভোলা যেত"

পচিশ

ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে না। এখনও ঘুমিয়ে। হাউসকোট ড্রেসিং-টেবিলের স্টুলে ফেলে অরুন্ধতী বাথরুমে। রাতের বাসি বিবস্ত্র শরীর শাওয়ারের তলায় ভিজছে। দেহের পাপ ধুয়ে মুছে ড্রেন দিয়ে বেরচ্ছে। পাপটা দেহে না সামাজিক বলয়ে ওর একান্ত অস্তিত্বে, জানে না।

ফিরতে রাত হয়েছিল। আবার ফ্যাশন আনলিমিটেডের পার্টি। পূর্ণেন্দু সেনের সং সেজে ব্যবসার নামে এক্কাদোক্কা খেলা। ঢলানি, অভিনয়। চাকরি বলে কথা। বাড়ি ফিরে আরেক দৃশ্য। জয়ন্ত ঘুময়নি। ড্রয়িংরুমে ব্লুফিল্ম দেখছে। জানে না রোজ রাতে এভাবে ব্লুফিল্ম দেখে কি না। ইচ্ছেও নেই। একটাই চিন্তা। যাই করুক, যাতে টুবলু ঘুমবার পর। আজকাল একঘরেও শোয় না। তাই কখন ঘুমতে যাচ্ছে, কখন উঠছে, মাথাব্যথা নেই।

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে আলমারি থেকে পাট করা কচি কলাপাতা টাঙ্গাইল শাড়ি বের করল। শাড়িটা কদ্দিন পরা হয়নি। কয়েক বছর আগে শখ করে কেনা। শখ এতদিন আলমারি-বন্দি, ডিজাইনার ড্রেসের প্রাচুর্য। প্রসাধনহীন গাড়ির চাবি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল, উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যে। বিবেকানন্দ সেতু পার হয়ে, সাঁতরাগাছি স্টেশন পেরিয়ে, কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে। আজ তাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। একা নিজের মতো করে কাটাতে চায়। সমাজ, জয়ন্ত থেকে দূরে। পশ্চিমে গাড়িটা ছুটছে। পুবের রোদের ঝলক ঘাড়ে। ছোটবেলায় বাবা বলত 'সকালের রোদটা শরীরের পক্ষে ভালো'। বারান্দায় বসে রোদ পোয়ালে মনটা ভরে যায়' পেছনে থাক রোদ। লরিগুলোর পেছনে সন্তর্পণে ড্রাইভ করছে। ওদেরই যত তাড়া। পোস্তা থেকে আটটার মধ্যে কলকাতা ছাড়তে হবে লম্বা সফরে।

সকালে অজানা মন খারাপ। এলোমেলো আধছেঁড়া স্বপ্ন মাথায়। বিসর্গ পীঠের আলো-আঁধারি স্মৃতি হয়ে আজ্ঞাচক্রে লুকোচুরি খেলছে। কয়েকদিন থেকেই কিছু ভালো লাগছে না। মানুষের শরীর, পুরুষের শ্বাস, সামাজিক দায়বদ্ধতা, উঠতি নেশার ফুলঝুরি। জানলার ফাঁক দিয়ে পাখির কলতানেও মনে হচ্ছিল সে পরাধীন, নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। এমনকী নিজের মতো করে মুহূর্তটাকে খুঁজে নেওয়ার সময়টুকু পায়নি। নিয়মমাফিক ভদ্রমহিলা সাজতে হবে। তারর থেকেও কষ্টকর, নিয়মমাফিক হাসা, কাঁদা, প্রেমের নাটক, ঘর চালানো, সংসার রক্ষা। সামাজিক চেতনাকে নাগপাশে বেঁধে ফেলতে চাইছে। তারপর একদিন টুক করে মরে যাবে। কী লাভ, এই রুটিন-জীবন ভালোবেসে? তার থেকে বেড়িয়ে পড়া ভালো। সহস্রার থেকে বিদ্রোহের ডাক দামামা বাজাচ্ছে – আজ নয় কেন? অপূর্ণতা কুরেকুরে খাচ্ছে। মেয়েগুলোর কী গতি হয়েছে জানে না। হয়ত হয়েছে বা হবে। আবার হারিয়েও যেতে পারে। প্রবহমান ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে চায় না। কক্ষ থেকে হঠাৎই বিচ্ছিন্ন। বাহ্যিক দিক দিয়ে না হলেও মানসিক বিদ্রোহের লহরা।

লটারির পর পূর্ণেন্দু সেনের পঞ্চমী পূজা শেষ। বর্তমান সভ্যতার অগস্ত্য যাত্রা। বাংলার গণ্যমান্য জঘন্য ব্যক্তিরা তুষ্ট কি না জানা নেই। জানতেও চায় না। পূর্ণেন্দু সেন খুশি, ভাবে আচরণে প্রচ্ছন্ন। স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের আর বিশ্বাস করে না। প্রয়োজনে স্বপ্ন বিক্রি করে, কাজ ফুরলে ফানুস উড়িয়ে দিতে এদের জুড়ি নেই।

ফ্যাশন আনলিমিডের হয়ে পূর্ণেন্দু সেনকে জিজ্ঞেস করেছিল "স্যার, ওই পাঁচটা মেয়ে যদি জিজ্ঞেস করে উন্নতির ব্যাপারে কী করছি, ওদের কী বলব?"

"কেউ কি জিজ্ঞেস করেছে?"

"এখনও করেনি। একদিন তো করবে"

“রিভার্ট ব্যাক টু মি হোয়েন দ্য টাইম কামস”

আর প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি। সময় এলে দেখা যাবে। ভেবে কী হবে? ভাবনাটা অন্য। মেয়েদের নিয়ে নয়। ওই ঘটনা দিব্যচক্ষু খুলে দিয়েছে। প্রগতিশীল সত্তায় করাঘাত।

“কলকাতায় এসেছি। তুমি ফ্রি?” ফোনের অপেক্ষাতেই ছিল।

কাল সকালে প্রতীকের ফোন পেয়ে ধড়ে প্রাণ পেয়েছিল। বেশ অনেকদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। যদিও মুম্বাইতে থাকে, বেশিভাগ সময়ই ব্যবসা নিয়ে বিদেশে। এ সময়ই ফোন করবে ভাবতে পারেনি।

“সব সময়ই ফ্রি টু ফিট ইনটু ইওর টাইম”

“হোয়াট অ্যাবাউট টুডে? লাঞ্চ সামহোয়্যার?”

সন্ধেবেলা ফ্যাশন আনলিমিডের পার্টি। তখন সম্ভব নয় জেনেই প্রতীকের কথায় রাজি।

“স্যাটার্ডে ক্লাব। কোয়াইট নিয়ার টু মাই প্লেস। অ্যাট ওয়ান ও ক্লক” ফোনটা কেটে দিল।

সাঁতরাগাছি পার হয়ে একটা ধাবায় গাড়ি থামাল। চায়ের সময়। গাড়িটা ধাবার পাশে পার্ক করে পা টানটান করল। ভাগ্যিস শাড়ি পরেছিল। রিল্যাক্সড ভাবে ড্রাইভ করা যায়। জিনস পরলে তাড়াতাড়ি পায়ে টান ধরে। বিয়ের পর, প্রথম দু বছর নামকা ওয়াস্তে ম্যারেজ অ্যানিভারসারি পালন। কবেকার কথা। বিয়ে এখন পাতলা সুতোয়।

ধাবার বাচ্চা ছেলেটা টিনের থালায় চায়ের কাপ এগিয়ে বলল “বাবু জিজ্ঞেস করছিল কিছু খাবেন? গরম গরম চিকেন পকোড়া আছে। দেব?”

“বেশ দে” ধাবার বাইরের বেঞ্চিতে বসল।

প্রতীকের সঙ্গে দেখা স্যাটার্ডে ক্লাবে। সাদা প্যান্টের ওপর লাল-কালো ডোরা কাটা গেঞ্জি। ক্যাসুয়াল।

“বিয়ার বলব?”

“বিয়ার?! এই দুপুরে?”

“তাহলে কী হুইস্কি খাবে?” মুচকি হেসে বেয়ারাকে ইঙ্গিত “মেমসাব সে অর্ডার লে লো” অরুন্ধতীর কোর্টে বল।

“দো বিয়ার আউর কুছ স্ন্যাক্স। মসলা চাট হয়?”

“বলিয়ে তো কর দেগা” বেয়ারা চলে যেতে প্রতীককে বলল “হঠাৎ কলকাতায়?”

“কতগুলো হসপিট্যালে বিজনেস ডিল। মেলে মোটামুটি কনফার্মড। পারচেজ অফিসারদের ভেট দিতে। কালকে”

অরুন্ধতীর দিকে তাকাতেই ওর অল হোয়াইট ড্রেসে চোখ। সাদা স্ল্যাক্সের ওপর সাদা লেসের টপস। নটিংহ্যাম লেস নয় তো? ওই লেসের নিজস্ব ক্লাস আছে। সবার থেকে সিংগল আউট করা যায়। সে কথায় না গিয়ে হেসে বলল “আজ মলিন বেশ কেন? বিকেলের পার্টিতে আসছ?”

মুচকি হেসে জবাব “যাব না কেন? তুমিও কি ইনভাইটেড?”

“পূর্ণেন্দু সেন নিজে ফোন করেছিলেন। হাউ ক্যান আই রিফিউজ হিম?”

বেয়ারা গ্লাসে বিয়ার ঢেলে বলল “মসলা চাট ঔর ফ্রায়েড মাসরুম অভি লাতা”

চুমুক দিয়ে অরুন্ধতী বলল “রিয়েলি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, হাউ ইউ ল্যান্ড ইন দিস পার্টিস। আমার নয় চাকরি। ফ্যাশন আনলিমিটেডের পার্টি হলে তো থাকতেই হবে। তুমি আদার ব্যাপারি। জাহাজ ভর্তি সুন্দরীদের ভিড়ে কী করছ বুঝি না”

“সব কিছু বোঝার নয়। কাজে এসেছিলাম। ইভনিং-এ পার্টি অ্যাটেন্ড করলে সময়ও কেটে যাবে। কপালে থাকলে কয়েকটা বিজনেস ডিলও। নট ইন্টারেস্টেড ইন ইওর বিউটিস” বেশ কিছুটা বিয়ার গিলল।

প্রতীক ঘুঘু ব্যবসাদার সেটা খুব ভালোই জানে। অফ অল পার্সেন্স হওয়াই পূর্ণেন্দু সেন? খটকা লাগলেও প্রকাশ করল না।

“একটা উত্তর দাও তো। গিভেন দ্য চয়েস বিটুইন ভ্যালুস অ্যান্ড বিজনেস, হুইচ উড ইউ চুজ?”

ঢোক গিলল প্রতীক। লাইট কনভারসেশনের মধ্যে দুম করে এমন সিরিয়াস ফিলসফি কেন? আরও বিয়ার ঢকঢক করে গিলে বলল “হোয়াই দিস কোয়েশ্চেন?”

“জাস্ট ক্যাসুয়ালি। অনেস্টলি আনসার। হোয়াট উড ইউ ডু?” সিগারেটের ধোঁয়া হাওয়ায় ছুড়ে।

বেগতিক। উত্তর একটা দিতেই হবে “ইউ ওয়ান্ট মাই হনেস্ট ওপিনিয়ন?”

“আই ডু”

“আই রেস্পেক্ট আওয়ার ট্র্যাডিশনল ভ্যালুজ। অনার দেম উইথ মাই লাইফ। দ্যাটজ অ্যাজ ফার অ্যাজ মি অ্যাজ এ পার্সন। মাই ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড রিয়ারিং ফ্যামিলি। ব্যবসার ব্যাপারে আই গো উইথ দ্যা টাইড। যে দেবতার যে পুজো। এনিথিং ইজ ফেয়ার টু গেট মাই মিনস”

ছ্যাঁত করে উঠল অরুন্ধতীর বুক। অসীমও অন্যভাবে বলেছিল। প্রতীক আরেকভাবে একই কথা বলল। তাহলে ফ্যাশন আনলিমিটেডের মেয়েদের কী দোষ? অরুন্ধতী কী দুনিয়াদারিতে পিছিয়ে? অস্বস্তিকর নীরবতা। হলের কোনায় একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক টিকটিক করছে। লক্ষ করেনি। টিকটিক শব্দটা চাইমে রূপান্তরিত। মায়াময় ভাসছে। দূরান্তের অচেনা মন্ত্রে দীক্ষিত করছে। চেনা অথচ না-জানা রাগে। আবরণ নিমেষে নিরাকার থেকে সাকার চাইমিং শব্দে। যেন না-শোনা ওঙ্কারধ্বনি। অনেকটা রবিবারের চার্চের মতো। এক সময় থেমেও গেল।

“মেমসাব চিকেন পকোড়া” সম্বিত ফিরল ছেলেটার কথায়। প্লেটটা নামিয়ে বলল “আরেক কাপ চা দেব?”

“দে”

ওই ঘটনার পর থেকেই ফ্যাশন আনলিমিটেডের পার্টিগুলো প্রাণহীন। কাল রাতেরটাও ব্যতিক্রম নয়।

প্রতীকের সঙ্গে দেখা করে বাড়িতে ঘুম। জয়ন্ত অফিসে। টুবলু স্কুলে। শান্ত পরিবেশে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। উঠে, স্নান সেরে সন্ধের ডিজাইনারে স্বভূমিতে হাজির সাতটায়। পূর্ণেন্দু সেন আরও আধঘণ্টা পরে। ওকে একপাশে ডেকে বলেছিল “যে মেয়েরা ভলেন্টিয়ার করেছিল ওদের জন্য খাস্তগিরকে খাতির করো। নামগুলো মনে আছে?”

“নাম দিয়ে কী হবে স্যার? নেশায় নামগুলো কী মনে থাকবে?”

“বেশ। অন্তত ডিলটা করে নিও”

পূর্ণেন্দু সেন লক্ষ করল অরুন্ধতীর মুখ থমথমে। কিছুদিন আগের উচ্ছ্বল অরুন্ধতী কেমন প্রাণহীন নিঃসাড়, রোবটিক। সেনের রিমোট কন্ট্রোলে আলোকিত করছে স্বভূমির ব্যাঙ্কয়েট হল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেন স্যারের আজ্ঞা পালন। লিপস্টিক মেখে মেয়েছেলের দালালি পোষাচ্ছে না। ক্লান্ত। ঠিক কি ভুল পরের কথা। কাজটাই দুর্বিষহ হয়ে যাচ্ছে। সোনাগাছির মাসি আর নিজের মধ্যে পার্থক্য দেখছে না। রাদ্যার সফিস্টিকেটেড পিম্প। ফুর্তি করবে শহরের গণ্যমান্য বাবুরা। আর ভরতুকি দিতে হবে হাফগেরস্ত সেজে। প্রতীক দূর থেকে দেখছিল। মস্করা করেই বলল “বিমিং অ্যাজ এভার”

“কাট দ্য ক্র্যাপ” চাপা স্বরে গর্জে উঠল “বুড়ো ভামটা এসেছে?”

“কে?”

“তোমাদের মুম্বাই মিডিয়া এজেন্সির দিকপাল খাস্তগির?”

ব্যাঙ্কয়েটের একপ্রান্তে দেখিয়ে বলল “ওই তো মহিলাদের সঙ্গে”

“আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে। নিশ্চয়ই খাস্তগিরের কথা ভেবে নয়। মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। নইলে ওদের মতো আনুপূর্ব অতিবৈতনিক-রা মেরে ফেলত” লিপস্টিকের প্রলেপ বুলিয়ে বলল “যাই, বসের আজ্ঞা পালন করি। কতক্ষণ আর এই ভামটার সঙ্গে ঢলাঢলি করা যায়। কীসের এত মধু বুঝি না। ভায়গ্রা দিয়েও কিসসু হবে না”

“ভয়ারিজম। এস্ট্যাবলিশড সোসাইটির শৌখিন রোগ। রাগের কিছু নেই। দ্যাটজ ইওর জব”

লাল সালোয়ার কামিজ ঠিক করে মুচকি হেসে মহিলা পরিবৃত খাস্তগিরের দিকে এগোল। লাল রং শুধু ষাঁড়দেরই আকৃষ্ট করে। কেন করে তার কারণ খোঁজা বৃথা।

অরুন্ধতীকে দেখে খাস্তগির বলল "হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন মাই চার্মিং লেডি?"

"হোয়ার এলস? হিয়ার ওনলি" ফ্যাশন আনলিমিটেডের সুন্দরীদের থেকে চোখ ঘুরিয়ে খাস্তগিরকে বলল "হোয়েন ইউ ফিনিস উই ক্যান সিট ডাউন অ্যাট এ কোয়ায়েট কর্নার ফর এ ড্রিঙ্ক"

"নাউ?"

"নো রাস। আই অ্যাম অ্যারাউন্ড। ক্যারি অন"

খাস্তগির ঘুঘু বিজনেসম্যান। পেটে কয়েক পেগ না পড়লে ডিলটা করতে পারবে না। তাকে সান্ধ্য আসরে বাসর খুঁজতে দিয়ে সরে এল। লাল সালোয়ারে দোদুল্যমান নিতম্বের দিকে এক পলক তাকিয়ে, দৃষ্টি ফেরাল এক স্বল্পবসনার বুকের গভীরে। যে কাজ এতকাল উদ্দীপনায় করেছে, সেটাই এখন বোঝা। সেন স্যারের ব্যবসায়িক অঙ্ক বুঝবার পর, লালে লাল অরুন্ধতীর দাবাগ্নিতে বরফজল। পার্টি, হট্টগোল, ঢলাঢলি, মেকি সভ্যতার মাদক এখানেই। সবাই কিছু পাওয়ার আশায় ছুটছে। ঠিক যেমন পোকাগুলো আগুনের দিকে ছোটে। এরাও নিজের মতো মরতে চলেছে। এই গোলকধাঁধার পৃথিবী কতই না ছোট। একদিন যা ছিল কাঙ্ক্ষিত, আজ সেটাই কাঠগড়ায়। অতৃপ্তিকে পাথেয় করে।

পাঁচজন উচ্চাভিলাষী সম্ভাবনাময় তারকাদের ডেকে এক কোণে বসল। কর্ত্রীর মতো ঠান্ডা মাথায়, নিচু গলায় বোঝাতে লাগল খাস্তগিরের নেকনজরের অঙ্ক। ওরা সব কিছু দিতে প্রস্তুত। দিলেও যে সেখানে পৌঁছবে, এমন গ্যারান্টি নেই। সে সাপ-লুডো শেখাতে ব্যস্ত। ফ্যাশন আনলিমিটেডের সম্রাজ্ঞী।

ছোট্ট ছেলেটি আরেকটা চা নামিয়ে বলল "চায়ে গরম। দিদি আপনাকে মায়ের মতো লাগছে"

এই প্রথম ওর দিকে ভালো করে চাইল। খাকি হাফ-প্যান্ট, খালি গা। গরিব পরিবারে জন্মালে এটাই এদের ভাগ্য লিখন।

"তোর মা কোথায়?"

"সগগে" আঙুল উঁচু করে আকাশে দেখাল।

"বাবা?"

"জানি না"

"তার মানে?"

"বাবাকে কখনও দেখিনি"

"থাকিস কোথায়?"

"এই হারুদার ধাবায়" আঙুল তুলে দেখাল "উই যে পেছনের ঘর, উখানেই থাকি"

"বাড়িতে কে কে আছে?"

"আমার কেউ নেই। মা মরে গেল। পাড়ার পল্টুদা হারুদাকে বলে ইখানে কাজ ঠিক করে দিল। ইখানেই থাকি। ইটাই ঘর"

ছেলেটির জন্য দুঃখ হল। ওর বর্তমানও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। দুঃখও নেই। কালকের কথা ভাবার অবকাশও নেই। উঠতি স্বপ্ন দেখারও নেই। হারাবারও নেই। উঠতি তারকাদের ওপরে ওঠার লীলার সঙ্গে কত তফাত। কিছু না থাকতেও ওর যা আছে, অনেকেরই নেই।

"তোর নাম কী?"

"স্বপন"

স্বপন মানে স্বপ্ন। কে ওকে স্বপ্নের বাহক করে জন্ম দিয়েছিল, কে জানে? নিজের স্বপ্ন না থাকতেও, স্বপ্নের ধ্বজা বহন করছে ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সম্বল করে। কার স্বপ্ন? উত্তর পাওয়া মুশকিল। ওর মায়ের না ঈশ্বরের?

দুটো পকোড়া এগিয়ে বলল "এখানে অনেক। খেতে পারব না। তুই দুটো খেয়ে নে"

স্বপন হাত নেড়ে প্রতিবাদ করল "না, হারুদা বকবে"

"বকবে কেন?"

"কাস্টমারের কাছ থেকে কিছু খাওয়া নেওয়া বারণ। আমি ভিখিরি নই। হারুদা খেতে দেয়"

স্বপনের কিছু না থাকতেও যা আছে, অনেকেরই নেই। সভ্যতার ফুলঝুরির আলোকে অনেকেই ভুলে গেছে। অরুন্ধতীও। আজ এই ছেলেটি তাকে আরেক চেতনা দিচ্ছে। আত্মমর্যাদার। লোভহীন জীবনের। অকপটে পরকে ভালোবাসার। অরুন্ধতীর হঠাৎ মনে হল সে বড় নিঃস্ব, অসহায়। প্রাচুর্য যা দিতে পারেনি, এই ছেলেটি তাকে তাই দিয়েছে। এই শূন্যতায় পূর্ণতা খোঁজাই শান্তির ধর্ম। আজ যেন নব রূপে সাজছে। নতুন মন্ত্রে। এই অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেটি চেতনাকে উলঙ্গ করে দিয়েছে প্রখর দিবালোকে।

"তুই আমায় মা বলেছিস। মা কী ছেলেকে ভিক্ষা দেয়? নে... নে... এ দুটো নে"

সূর্য এখন অনেকখানি ওপরে। রোদের আঁচও লাগছে। এবার যেতে হবে। স্বপন কিছুতেই নেবে না। চা শেষ করে উঠে পড়ল। গাড়িতে উঠে দাম মিটিয়ে বলল "হারুদা খাবার নিতে বারণ করেছে। মায়ের দেওয়া অন্য কিছু নিতে তো করেনি"

পাঁচশো টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে বলল "তুই মা বলে ডেকেছিস। পুজোতে কিছু কেনার জন্য দিলাম। না হলে, মা কিন্তু খুব দুঃখ পাবে"

ছেলেটি একগাল হেসে বলল "আবার আসবেন। আমাকে এখানে সবসময়ই পাবেন"

গাড়ি ড্রাইভ করে বেরতে মনে হল, ওই আন্তরিকতা, হাসি কী পাঁচশো টাকায় কেনা যায়? যায় না। কী বোকাই না সে। হঠাৎ মনে হল সে ভীষণ নিঃস্ব। তার দেওয়ার মতো কিছুই নেই। শূন্যতা তাকে ভীষণভাবে গ্রাস করেছে। ছেলেটির লাজুক হাসিতে যে পূর্ণতা, তা দেওয়ার মধ্যেই, পাওয়াতে নয়।

ভেবেছিল শের-ই-পাঞ্জাবে ব্রেকফাস্ট করবে। চিকেন পকোড়া খেয়ে পেট এত ভরে গেছে, খেতেও ইচ্ছে করছে না। কয়েকটা কাগজে মুড়ে নিয়েও এসেছে। শের-ই-পাঞ্জাবে ড্রাইভিং ব্রেক নিয়ে এক কাপ কফি খেল। সেই ফাঁকে কাবাবও প্যাক করে নিল, যদি পরে খিদে পায়। কোলাঘাট পার হয়ে মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে। ভাবছিল মন্দারমনি না তাজপুর। সেখানেও সুসভ্য বিলাসিতার আয়োজন। মানে আবার উচ্ছিষ্ট সভ্যদের নাগপাশে। ওখানে নিজেকে পাবে না। পাবে নতুন উদ্দীপনায় সভ্যতার ভগ্নাংশকে। না থাক। খড়গপুরের দিকে যাওয়া যাক। পরে ভাবা যাবে।

স্বভূমির ব্যাঙ্কয়েটের কোনায় বসে ওই পাঁচটি মেয়েকে খাস্তগিরকে বাগে আনার মন্ত্র শেখাচ্ছিল।

"দেয়ার আর সার্টেন থিংস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইন দ্য গেম। টু উইন ওভার ইওর মেন্টর। বিলিভ মি ইটজ নট অলওয়েজ সেক্স। অ্যাজ ফর খাস্তগির, দ্য জেন্টেলম্যান আই ওয়াজ টকিং, আই হ্যাভ ডাউটস হোয়েদার হি ইজ অ্যাট অল কেপেবল। ইন দ্যাট কেস, হোয়াট উড ইউ ডু?"

সবাই চুপ। ওরা শিখেছে এগোতে গেলে দেহকে পণ্য করে তুলতে। সব মেয়েদের দেহের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সেটাই তো শেখেনি। অরুন্ধতী উত্তরের আশায় বসে। না পেয়ে বলে চলল "সো ইউ সি, ইউ হ্যাভ ওনলি লারন্ট হাফ দ্য গেম। ফাইভ অফ ইউ গেট ক্লোজার টু মিঃ খাস্তগির হু অ্যাট দ্য মোমেন্ট ইজ ইওর ট্রাম্প কার্ড। হি মাইট মেক পেটি অ্যাডভান্সেস। আই অ্যাসুয়র ইউ আফটার এ ফিউ ড্রিঙ্কস হি ইজ ইনকেপেবল অফ ডুইং এনিথিং ইন পাবলিক, অর লেটার আফটারওয়ার্ডস। ট্রাই টু ইমপ্রেস হিম বাই ইওর চার্মস। হোয়াইল ইউ এনগেজ হিম, আই উইল মুভ দ্য আদার চিক্স ফ্রম হিম। অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট আই উইল মুভ হিম আওয়ে ফ্রম ইউ অল অ্যান্ড প্লে মাই কার্ডস"

কাজ হল। খেলাটা ওর থেকে আর ভালো কেউ জানে না। এমনকী পূর্ণেন্দু সেনও নয়। কথামতো এক সময় হাজির হল খাস্তগিরের কাছে "ওঃ মিস্টার খাস্তগির, এত সুন্দরীদের পেয়ে আমার কথা ভুলেই গেছেন"

"নেভার। তোমাকে ভুলি কী করে? দ্য কুইন অফ দ্য পার্টি!"

"ইফ ইউ সো ফিল, অ্যাটলিস্ট স্পেয়ার মি সাম টাইম"

অবশেষে মেয়েগুলোকে ছেড়ে ভডকা হাতে রং দরবারের এক কোণের সোফায় বসল।

"ভাগ্যিস রেস্কিউ করলে। ওরা ছাড়ছিল না" বেশ বুঝতে পারছে পেটে কয়েক পেগ। মনে মনে হাসল। ওরা ছাড়ছিল না। না, তুমি ওদের ছাড়ছিলে না? বুড়ো বয়সের ভীমরতি আছে বলেই ফ্যাশন আনলিমিটেডের মতো সংস্থাগুলো চলছে। তবুও প্রশ্নটা থেকেই যায় 'কটা মেয়ে ভোগ করলে, বলা যায় আর বেশি নয়' মনের কথা মনেই থেকে গেছে। সে তো আর বব ডিলান নয়।

"আপনি কিন্তু আমাকে আর দেখছেন না" আক্ষেপ করে বলল।

"কেন... কেন... কে বলল?"

ভাবছিল এই ন্যাকামির আসরে আর কদ্দিন সাপলুডো চালাবে? চাকরিটা ছেড়ে দেবে কি না ভাবছিল। প্রতীকের অনেক বিজনেস। ওখানে কাজ পাওয়া কী মুশকিল হবে?

"আমার তো তাই মনে হচ্ছে"

জড়ানো গলায় বলল "তোমার জন্য কী করতে হবে? আমি তো জীবন দিতেও প্রস্তুত"

একটু হেসে বলল "না, না ওকথা মুখেও আনবেন না। আপনি চলে গেলে আমাদের দেখবে কে?"

খাস্তগির ওর কাঁধে হাত ছড়িয়ে, মুখটা গালের কাছে নিয়ে বলল "কী করতে হবে ম্যাডাম?"

"যে পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে ছিলেন, কেমন লাগল?"

"কোনও মেয়েকেই খারাপ লাগে না। ওদের..."

"এনিথিং স্পেশাল?"

"ডেফিনিটলি ফর টু-নাইট"

"কুড বি ফর মেনি নাইটস ইফ ইউ উইস। ইউ হ্যাভ গুড লিঙ্কস উইথ দ্য মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, ডোন্ট ইউ?"

"টু সাম এক্সটেন্ট"

"এই পাঁচটি মেয়েকে, আই মিন এক একজনকে, এক একটা ফিল্মে ব্রেক দিতে হবে"

"এর আগে তো এমন রিকোয়েস্ট করনি"

"করিনি। এই প্রথম করছি" খাস্তগিরের গায় ঢলে বলল "রাখবেন না?" খাস্তগির ইতস্তত করছে দেখে বলল "অ্যাট এনি পার্সন্ট অফ ইওর চয়েস"

ভডকা শেষ। বেয়ারার ট্রে থেকে আরেকটা তুলে বলল "তোমার সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক" নিবিড়ভাবে অরুন্ধতীর পাশ ঘেঁসে বসল।

"জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক এ জন্মেই শেষ করুন মেয়েগুলোর সদ্গতি করে"

নীরবতায় পেগে চুমুক দিয়ে বলল "জো হুকুম জাঁহাপনা"

অরুন্ধতী ঝুঁকে চটিটা ঠিক করার ভান করল। খাস্তগির যাতে লো-কাট দিয়ে স্তনের যতটা সম্ভব অবলীলায় দেখতে পারে। মুখ ঘুরিয়ে বলল "তাহলে ধরে নিতে পারি কনফার্মড?"

"আমার দিক থেকে। দেখি কানেরিয়াকে বলে"

"তাহলে কাল কন্ট্র্যাক্টটা পাঠিয়ে দেব" উঠে পড়ল।

আধবোজা চোখ তুলে খাস্তগির বলল "কোথায় যাচ্ছ? দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং"

"আমি তো আছিই" প্রতীকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল "উনি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। লেট মি অ্যাটেন্ড হিম। আফটার অল ইটজ দ্য পার্টি অফ ফ্যাশন আনলিমিটেড। হ্যাভ টু লুক আফটার এভরিওয়ান"

প্রায় বুঁদ খাস্তগিরকে সোফায় গা ছড়াতে দিয়ে প্রতীকের দিকে।

"পালিয়ে এলে?" প্রতীক ঠাট্টা করল।

পালিয়েছিল কি না, জানা নেই। তবে আজ সত্যি বেরিয়ে পড়েছে পালাতে। খড়গপুরের রাউন্ড অ্যাবাউটে এসে ভাবল কোনদিকে। বাঁয়ে খড়গপুর, ডাইনে মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, বিষ্ণুপুর। বাঁ দিকে আরেক সভ্যতা। ডান দিকে জঙ্গল। জঙ্গলই হাতছানি দিচ্ছে। কিছু সময়ের জন্য সভ্যতা থেকে পালিয়ে একা কাটানো যাবে। মেদিনীপুর ছাড়িয়ে আরবারি অভয়ারণ্যে। কয়েক কিলোমিটার ভেতরে ফরেস্ট বাংলোতে গাড়ি থামল। এই নির্জন নিরিবিলিতেই কাটাতে চায় প্রহসনের বিবাহবার্ষিকী। একা নিভৃতে, নিরালায়।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ভাবছিল, পালাতে বেড়িয়েছে। ছেলেটির কথা নাড়িয়ে দিয়েছে।

পালাবে কোথায়?

নিজের কাছ থেকে?

ছাব্বিশ

লাজুক কিশোরী স্বগর্বে আত্মপ্রকাশ করেছে বাসন্তী মহিমায় সুরের ডালি ভরে। বর্ণালীর জীবনে রেশ না পড়লেও, রেশ থেকে গেছে শ্রোতাদের হৃদয়ে, গুণমুগ্ধ ক্রিটিকদের রিভিউতে। ইলেক্ট্রনিক, প্রেস মিডিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সত্যি কী ভালো গেয়েছে? না এখানেও অসীমদার হাত। আজকাল পাবলিসিটির যুগ। সেটাই কী আসীমদা কাজে লাগাতে চেয়েছে ওকে সিডি করতে রাজি করাতে? একটা দ্বিধা, একটা সংশয়। গুলিয়ে যাচ্ছে। চেনা বৃত্ত থেকে ছিটকে বার করে এনেছে দোটানার দোদুল্যমান মানদণ্ডে। অন্য কোথাও। অন্য কোনওখানে। জাগতিক এক্কাদোক্কার অঙ্কে। অথচ এর মধ্যে ঢুকতে চায়নি। চেনা পৃথিবীকে, না-জানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। ক্রম পরিবর্তনশীল জীবনের সীমান্তরেখার না-ছোঁয়া সুদূরে। নাম-না-জানা তেপান্তরে।

সেদিনের অনুষ্ঠানের পর বেশ কয়েকটা ফোন, নিউজ কভারেজে। রবিবারের সকালে বারান্দায় বসন্তের মিষ্টি রোদের আমেজ পোয়াতে, খবরের কাগজে ওর সম্বন্ধে লেখাগুলো পড়ছিল।

মোবাইল বেজে উঠল “সেদিন অসাধারণ গেয়েছ। পড়ে দেখ সব কাগজে ভূয়সী প্রশংসা”

“পড়ছিলাম”

“যার যখন সময় আসে, ঈশ্বর এমনিতেই দেন। তোমার সময় এসে গেছে”

“হু...ম...” অস্ফুট উত্তর।

“এবার সিডি বার করায় না বল না” অসীমদার অনুরোধ।

নাম হলে, যশ বাড়লে আর্থিক বিকাশ হবে। শান্ত অস্তিত্বটাকে ঢেউয়ের ঝাপটে টালমাটাল করবে না তো? বাইরের দুনিয়ায় কোথায় দাঁড়িয়ে আগে ঠাহর করতে হবে।

ছোটবেলায় মা কেবলই বলত “জীবনে সফল হওয়াই আসল”

মা কী সফলতার মানে জানত? বর্ণালী কী জানে? আজ যদি বিজিত বেঁচে থাকত, সফলতার মানে খোঁজার চেষ্টা করত। কিন্তু যে লোকটা এক নিমেষে হারিয়ে গেল অজানা অন্ধকারে, তাকে খোঁজা যেমন বৃথা, এই মুহূর্তে এখানে বসে, জীবনের মানে বোঝা তার থেকে বেশি কঠিন। ওর মৃত্যুর পর মনে হয়েছে খোঁজার চেষ্টাই বৃথা। দুঃখের কারণ। ক্ষণভঙ্গুর জীবনে বেশি কিছু না খোঁজাই ভালো। বরং শান্তিকে সাধারণ নাগরিকের মতোই পর্যবেক্ষণ শ্রেয়।

উত্তর না পেয়ে অসীম বলল “হ্যালো... আছ তো?”

“আছি অসীমদা”

“তাহলে আর কি। এবার থেকে রেকর্ডিং-এর প্রিপারেশন শুরু করে দাও। ... রাখছি। বেরোতে হবে। র‍্যাডিসন ফোর্টে ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স”

ফোন কাটতেই স্টুলে ফোনটা রেখে হাঁক “সম্বিত... সম্বিত...”

সম্বিত হাজির। খবরের কাগজ হাতে বলল “এতদিন পর গানের দুনিয়ায় ঢোকা ঠিক?”

মায়ের দ্বিধায় বুঝতে পারল পাবলিসিটির পর ভেতরের আলোড়ন। ছোটবেলা থেকে দেখছে। দোনামনার কারণটা বোঝার চেষ্টা করছে। মা সব সময়ই প্রচার বিমুখ। অনাড়ম্বর, শান্ত, স্নিগ্ধ প্রতিচ্ছায়া। প্রচারের আলো কী ভাবাচ্ছে? খবরের কাগজের প্রশংসা সংশয়ের আবর্ত সৃষ্টি করেছে। বহির্বিশ্বে প্রবেশ নিয়ে। জীবন যতক্ষণ সরল, চিন্তা কম। উত্তরণের অভিলাশেই জটিলতা। সেটাই কুড়ে খাচ্ছে। সেতুবন্ধন মোহ না সত্য প্রতিষ্ঠা, ভাবার চেষ্টা।

ছোটবেলায় মা বলত "তোকে কিছু দিলে, অন্যদের দিয়ে দিস"

"অন্যরা বেশি আনন্দ পাবে, তাই"

"তা বলে, সবকিছু স্বর্ণাকে দিয়ে দিবি?"

"ওতো আমার ছোট। দিদি হয়ে না দিলে কে দেবে?"

"তা বলে, নিজের জন্য কিছু রাখবি না?"

"সবই তো নিজের"

অন্যকে আনন্দ দেওয়া প্রধান, না নাম, যশ, প্রতিপত্তি মুখ্য, দোনামনায় কাগজের প্রশংসাও গ্রহণ করতে পারছে না।

সম্বিত বলল "এত ভাবছ কেন? তুমি খুব ভালো গেয়েছ। কিন্তু তুমি তো কেরিয়ার করতে গাইছ না। আনন্দ পাঁচজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিচ্ছ। এতেই শান্তি ভাব। নামটাকে পেছনে সরিয়ে"

ঘরে চলে গেল। কমবয়সি ছেলে। কী ভেবে বলল, বোধগম্য হল না। তার এই দোলাচল নিয়ে হয়ত নিজেও ভাবছিল। তার মতো করেই বলল। অজান্তে জীবনের গূঢ় তত্ত্বই বলে ফেলেছে। অল্পবয়স্ক ছেলে যত সহজ, খোলা মনে, কথাগুলো বলতে পারে, পরিণত মানুষেরা অত সহজে মেনে নিতে পারে না। প্রথাগত সংস্কার ভাবায়। বর্ণালীর লজ্জা করছিল। বিজিতকে হারানোর দুঃখে সেদিন দু-কলি বেরিয়েছিল। সেটা যে অসীমদা এই পর্যায় নিয়ে যাবে, ভাবেও পারেনি। মন চাইছিল, তাই সকালে রেওয়াজ। উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। মনের দোসরকে নতুন করে পেতে। সুর সাধনার নির্মল আনন্দে।

রেওয়াজ করতে দেখে সম্বিত বলত "রেওয়াজ কর। তুমি ভালো গাও"

সুযোগ হয়নি ভালোমন্দ বিচারের। গান ভালো লাগত, তাই গাওয়া। তাকে আঁকড়ে আবার নতুন করে বাঁচতে চাইছে। অসীমদা হয়ত অনুভূতিটা আঁচ করতে পারে। চাইছে ও অস্তিত্বটা ফিরে পাক জাগতিক অঙ্কে। তাই কলামন্দিরে ফাংশন। রহিমকে দিয়ে সিডি করার চেষ্টা। অসীমদা জাগতিক বলয়ে আবদ্ধ। ওকেও ফেলতে চাইছে তার ঘেরাটোপে। এত ভেবে কী হবে? অসীমদা বলেছিল বলেই কলামন্দিরে গান। কে কী লিখল, মিডিয়া কী বিচার করল, ভেবে কী হবে? যত ভাবনা, তত অশান্তি। কাগজগুলো বারান্দার টেবিলে ফেলে, ভাবনা দূরে সরিয়ে কিচেনে। রান্নার কাজ বাকি। শেষ করে, স্নান সেরে বেরোতে হবে। চুলে মেহেন্দি করার দিন। মাঝেমধ্যে চুলে মেহেন্দি করতে ভালোবাসে। রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিনে। আজ রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচারে বিকেলে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দর বক্তৃতা। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

বেশ অনেকদিন পর বর্ণালী সেজেছে। আয়নায় অবয়বটা দেখল। ৫' ৫" গড়নে নৈসর্গিক লালিত্য। ফিগারটা এই বয়সেও পুষ্ট, পরিপূর্ণ। ৩৪-২৬-৩৬। মুখ লম্বাটে হলেও দেহের গঠনের সঙ্গে মানিয়ে যায়। নিখুঁত দাঁতের সেটিং। নাকটা একটু ছোট। কম বয়েসে বোঁচা নাকের জন্য অনেক কথা শুনতে হয়েছে। এখন মনে হয় সেটা খুঁত নয়, মুখের বৈশিষ্ট্য। রং মাঝারি, ফর্সা বলা যায় না, কালোও নয়। কাঁধে ছাড়ানো চুল পনিটেল বাঁধা। কিছু কপালে ছড়িয়ে। হালকা প্রসাধন। ওর সৌন্দর্যের চাবিকাঠি চোখে, আকর্ষণের মূল। বাদামি ঘেঁষা আইরিশ দৃষ্টিতে অতলান্ত ভাব। শাড়ি পড়েনি। কালো টাইট জিনস, মাটি রঙের সুতির কুর্তা। ফ্যাব ইন্ডিয়া থেকে গত বছর কিনেছিল। ফ্যাব ইন্ডিয়ার জামাকাপড় বরাবরই প্রিয়। অন্য ব্র্যান্ড বিশেষ পছন্দ নয়। আরেকবার আয়নায় দেখে ফ্ল্যাট হিল চপ্পল গলিয়ে গাড়ির চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেল। বেশিরভাগ দিন সাউথ পয়েন্টে পড়াতেই কেটে যায়। বাড়ি ফিরে ঘরের কাজ। অন্যদিকে তাকাবার সময় নেই।

বিজিতের মৃত্যুর পর অনেকদিন কিছু করেনি। সারাদিন ঘরে। নিছক স্বামী হারানোর দুঃখে? ওরা বলে, শোক তিনদিন। বেডরুমে বিজিতের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকত। যখন ভীষণ লোনলি লাগত ছবির সঙ্গে কথা বলত। স্বর্ণালী বা অসীমদার অজানা।

স্বর্ণালীই একদিন বলল "বিয়ে যখন করবি না, এভাবে ঘরে বসে সময় কাটাবি কী করে? তার চেয়ে কোথাও চাকরি কর"

সত্যি তো। এভাবে সারাজীবন কাটানো যায়? তখন কিছু দর্শনের বইও পড়েছিল। বিজিত মারা যাওয়ার পর আত্মা, পরলোক নিয়ে পড়াশোনাও। সেসব তেমন আকৃষ্ট করেনি। কিছুদিন উপনিষদ নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি। বুঝতে পারেনি। বিজিতের মৃত্যুর পর এরিক ফন দ্যানিকানের বইগুলো আবার পড়ল। মন কিছু খুঁজছে। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিলসফিতে মাস্টার্স, ঘরে বসে থাকবে, এ হয়? শেষমেশ সাউথ পয়েন্ট স্কুলে চাকরি পেয়ে গেল। সম্বিত নিয়মিত স্কুলে। স্কুলের টাইমিং-এর সঙ্গে মিলতে দ্বিধা কাটিয়ে কাজে।

"ভালোই করেছিস। এভাবে ঘরে বসে কদ্দিন কাটাবি?"

"শেষ পর্যন্ত চাকরিটা নিয়েই নিলাম। সময় কেটে যাবে"

"সঙ্গে উপরি রোজগারও। সম্বিত বড় হচ্ছে। জমানো টাকার সুদে ভরসা না করে চাকরিই তোকে বাঁচিয়ে রাখবে"

স্বর্ণালী ঠিকই বলেছিল। কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। চাকরিটা শুধু আর্থিক স্বাধীনতাই দেয়নি, মানসিক বিস্তৃতিও। বাইরের পৃথিবীকে কাছ থেকে দেখা। পাঁচজনের সঙ্গে মেশা। বন্ধ জগৎটা খুলতে শুরু করেছিল। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বরাবরই আগ্রহ। বাবা সন্ধেবেলা কথামৃত পড়তেন "তোরা তো এসব পড়বি না। জীবনের সার কথা কত সহজেই বলে গেছেন। তখন বোঝেনি। এখন চুম্বকের মতো টানে। কিছু সময় রামকৃষ্ণ মিশনে কাটালে শান্তি পাওয়া যায়। তাই মাঝেমধ্যে চলে আসে।

রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট থেকে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দর বক্তৃতা শুনে যখন ফিরল ন'টা বেজে গেছে। খাওয়া শেষে ঘুম আসছে না। ঠিক করে উঠতে পারেনি কন্ট্র্যাক্টে সই করবে কি না। সম্বিতের কথাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে 'পাঁচজনের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিচ্ছ'। তাহলে সিডি করতে বাধা কোথায়? করলেই তো রাতারাতি স্টার হয়ে যাচ্ছে না। অসীমদাও খুশি হবে। চর্চাটও থাকবে। ঈশ্বর অসীমদার মধ্যে দিয়েই তাকে এপথে টানছে। তাঁর দান অমান্য করা মানে, তাকে অবজ্ঞা, অসম্মান। সেটা ঠিক হবে না। বিজিতের মৃত্যুতে ভাগ্য অন্য বাঁকে ফেলেছিল। এখন নয় আরেকটা মোড়। চৌরাস্তা তো নয়। দুটোই রাস্তা - হ্যা অথবা না।

নিঝুম অন্ধকার যেন অন্য মন্ত্র শোনাচ্ছে। সকালের ধোঁয়াশা অনেক পরিষ্কার। আলো না থাকলেও, অন্ধকার আর গাঢ় নয়। জানলার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে। স্বচ্ছ আকাশে তারারা নিষ্পলক দৃষ্টিতে কোনও কিছুর অপেক্ষায়। ধ্রবতারা খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা না করে তারাগুলোর মধ্যে ডুব দিল। চারপাশ অন্ধকারের চাদর মুড়ে ঘাপটি মেরে বসে, যেন এক্ষুণি চাদর ফেলে হইহই করে লাফিয়ে উঠবে। ঘটনাটা ঘটার অপেক্ষা। আকাশটাও কেমন গুম মেরে। যেন সেও কোনও ঘটনার অপেক্ষা করছে। একটু অবাক হল। আকাশের, বিশেষত রাতের আকাশের নানা রূপ দেখেছে। আজকের আকাশটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। হঠাৎ চোখ পড়ল পুব আকাশের দিকে। পুব দিকটা কখন আলোয় আলোময়, খেয়ালই করেনি। চোখ পড়তেই দেখল, পুব আকাশটা হয়ে উঠেছে স্বর্গলোকের উৎসববাড়ি। বা তার প্রবেশদ্বার। আলোয় সাজানো প্রবেশদ্বারের ভেতরেই ঝলমল করছে আনন্দময় উৎসব।

মুগ্ধ তাকিয়ে রইল। চোখের সামনে ধীরে খুলে যাচ্ছে উৎসববাড়ির প্রবেশদ্বারের পর্দা। সেই মহাজাগতিক পর্দার পিছন থেকে আবির্ভূত হল বিশাল মোহময় আনন্দময় চাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আনন্দের মহাপ্লাবন। এতক্ষণ স্তব্ধ চোখে তাকানো তারাগুলো হঠাৎই মহানন্দে হাততালি দিয়ে হইহই করে, দ্বিগুণ জোরে মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করল। ওপাশের রবীন্দ্র সরোবরের এতক্ষণ চুপচাপ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসা ঝোপঝাড়গুলো হঠাৎই একসঙ্গে তাদের সারা গায়ে জোনাকির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে দিল। ধীরে ধীরে আকাশগাঙে আনন্দের মধুকর ডিঙা ভাসিয়ে হাসতে হাসতে মাথার উপর এসে দাঁড়াল অপার্থিব আনন্দময় চাঁদ।

সেই স্রোতে ভাসতে তার মন অদ্ভুত আনন্দে ভরে গেল। মুগ্ধ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো …'

চরাচরের আনন্দসাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে সে তার ঝঞ্ঝা পেরনো, নশ্বর দেহ নিয়েই আনন্দ হয়ে গেল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল পাখির কলকাকলিতে। ভোর হয়ে গেছে। বাথরুম সেরে অসীমদাকে ফোন "ঠিক আছে, তুমি যখন চাও"

"সত্যি করবে?"

বর্ণালী চুপ। ভাবনা, ভয়, আনন্দে। কিছুক্ষণ। ধীরে বলল "তোমার ঋণ কী করে শোধ করব?"

ওপ্রান্তে অসীমের মুখে প্রশস্তির হাসি। জাজ শুনানি শুনিয়ে দিয়েছে। প্রহসনের স্বরে বলল "তুমি কী ভাবছ, তোমার কাছে পাওয়ার লোভে এসব করছি?"

প্রহসনটা বুকে বিঁধল। এমা, ছিঃ ছিঃ। অসীমদা এমন ভাবল।

"বর্ণা, মানুষ বড্ড বিচিত্র। সব কিছুই স্বার্থ ঘেরা। তার বাইরেও কিছু থাকতে পারে ভাবতে পারে না। ধরে নাও, এটা আমার এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত"

বর্ণালীর মুখ সকালের আলোর আভার মতো লাল। লজ্জায়, অপমানে, অজানা ভয়। বোঝার মতো অবস্থায় নেই, অসীমদার কীসের প্রায়শ্চিত্ত। নিজের ভারেই ক্লান্ত। অন্যের ভার বওয়া স্বপ্নাতীত।

ওকে চুপ থাকতে দেখে বলল "বুধবার ফ্রি। পাঁচটায় রহিমকে নিয়ে আসব। কন্ট্র্যাক্টটা এর মধ্যে ভালো করে পড়ে নিও"

ফোন কেটে দিল। অসার বসে। ঘরের কাজের কথা ভুলে গেছে। সম্বিত ফিরল ছেলের ডাকে "চা দিলে না মা?"

"এক্ষুনি করে আনছি" কিচেনের দিকে পা বাড়াল। যাই করুক না কেন সম্বিত আগে। বাকি সব পরে। যতক্ষণ না নিজের দুনিয়ায় চলে যায়, এটাই তার প্রধান কর্তব্য। গান, সিডি তুলনায় শৌখিনতা। অবসরের আশ্রয়। এখনও এটাই তার পৃথিবী।

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল।

ইহকাল পরকাল।

সাতাশ

চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধার শূন্যে ভাসছে। অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে রক্তিম প্রত্যুষ স্বপনেরও বাইরে। শুধু বর্ণালীর সম্মতিই এর মধ্যে একটু বা প্রলেপ। ওর শান্তিতে অসীমের হরিপরি কিছু যে হবে, তা নয়। স্টেলমেটের মধ্যে ওর শান্তির মধ্যেই নিজের পাওয়াটা খোঁজা। রোজ সকালে জগিং করত। এখন আর এনার্জি নেই। ইচ্ছেও নেই। এতদিনের পাটিগণিতের মতো জীবনে ভাটা। রাতে ঘুম হয় না। সকালে লেথার্জি। প্রত্যুষে প্রাণ ভরে শ্বাস নেওয়াতেও আগ্রহ নেই।

মৃত্তিকার মৃত্যু না স্বর্ণালী থেকে দূরত্ব? দুটোই। এতদিন যে ধ্রুবতারা খুঁজছিল, দেখা পাওয়া তো দূরের, ঘন মেঘের ধোঁয়াশায়। ও নিয়ে ভাবার সময় নেই। মৃত্তিকার আকস্মিক মৃত্যু যেন সুনামি, সাময়িক স্ক্যামটা স্বর্ণালিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কাছে কী ছিল? না, ভাবত। সম্পর্কটা বোধহয় সামাজিক বলয়ে বন্দি ছিল। সব সম্পর্কই এমন সুপারফিশিয়াল? যাকে এত বেশি গুরুত্ব দিই। চলার পথে এমন কত সম্পর্ক সাময়িকভাবে তৈরি হয়। সম্পর্কের গুরুত্ব ফুরিয়ে গেলে ম্লান হয়ে যায়। পড়ে থাকে স্মৃতি। নতুন বাধনে অন্য কোনও গীতি। এই স্মৃতি গীতির চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে কেটে যায় জীবন। মৃত্যুতে সবই বিস্মৃতি। এক খোলস ছেড়ে আরেক খোলসের সংস্কৃতি। কালচক্রের এই নীতি।

সম্পর্কের মায়াজালে তো সবাই - স্বর্ণালী, অরুন্ধতী, হয়ত মৃত্তিকাও। একমাত্র বর্ণালীই পৃথক। বারবার বন্ধন প্রত্যাখ্যান করেছে। সেখানেই ওর স্বাতন্ত্র্য। গানের ফাংশন থেকে সিডি প্রকাশে অনীহা। জড়াতে চায় না। জড়ালেই সমস্যা। জড়ালেই দুঃখ। বন্ধনমুক্ত হওয়াই কী শান্তির চাবিকাঠি? তাহলে তো উত্তরটা বর্ণালীই দিতে পারবে।

"দাদাবাবু চা দেব?" মাসি বারান্দায় এসে প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল অসীম। কাল রাতে খাওয়ার পর স্বর্ণালীর কথায় চমকে উঠেছিল "দিদিকে লাইমলাইটে আনার চেষ্টা করছ কেন?"

ব্যঙ্গ না থাকলেও কথায় সুস্পষ্ট শ্লেষ। বুঝেও না বুঝে বলল "বিজিতকে ভোলার যখন চেষ্টা করছে, সেদিন জ্ঞান শুনে মনে হল ওখানেই শান্তি পাবে। কিছুদিন পর সম্বিতও বাইরে পড়তে চলে যাবে। তখন কী নিয়ে থাকবে?"

"এতদিন পর!"

"সেদিন বিজতের মৃত্যুদিনেই তো এতদিন পর গান শুনলাম। মনে হল এটাই ওর বাঁচার রসদ"

"দিদি তো বরাবরই ভালো গায়। কই, আগে তো ওকে নিয়ে এত মাতামাতি করনি?"

মৃত্তিকা থেকে বর্ণালী। এত বছর ঘর করার পরও এসব শুনতে হচ্ছে। স্বর্ণালীর হয়েছেটা কী? সবেতেই সন্দেহ। এ যেন অন্য স্বর্ণালী। মিডল এজ ক্রাইসিস? ওর তো এখনও মেনপজের সময় হয়নি। শুনেছে হরমোনের তারতম্যে মেয়েরা অদ্ভুত আচরণ করে। অস্বস্তিকর আচরণ। কী জবাব দেবে?

"কষ্টের মুখোমুখি হওনি। মানেও বুঝবে না। পেতে পেতে, না-পাওয়াটা যে কত দুঃখের ভুলেই গেছ। তোমার স্বামী সংসার সব ইন্ট্যাক্ট। বুঝবে কী করে অসম্পূর্ণতা?"

"কতবার তো বলেছিলাম বিয়ে করতে। করল না। বিয়ে করলেই ল্যাটা চুকে যেত। যেচেই তো একাকিত্ব বেছে নিয়েছে"

স্বর্ণালীর শ্লেষের কারণ বুঝতে পারছে না। বর্ণালী তো চিরকালই ওকে সবকিছু ছেড়ে এসেছে। পেতে পেতে মাথাটাই ঘুরে গেছে। পাওয়াটাই যেন ওর জীবনের নিয়ম, দাবি। না পেলেই ক্ষোভ, ধিক্কার।

সাইকোটিক হয়ে যাচ্ছে না তো? না কি, আষ্টেপৃষ্ঠে সামাজিক বন্দি হাঁপিয়ে ওকে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে। কে বলেছে বন্দি থাকতে? মনের জানলা খুলে দাও। খাঁচার পাখি আকাশে ভাসবে অজানা দিকে।

সেখানে বদ্ধতা নেই, মুক্তি।

সেখানে জড়তা নেই, শান্তি।

সেখানে একা হয়েও তৃপ্তি।

চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে ব্যাপ্তি।

সেখানেই পরিতৃপ্তি।

যার সিরিয়াল, ক্লাব, সিনেমায় জীবনের পূর্ণতা, তাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। যে হারায়নি, সে কী করে বুঝবে হারানোর ব্যথা? যার পাওয়া তার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ, অসীমকে বিয়ে করলেও তার নাগাল পাওয়া যে দুরূহ, কথাতেই প্রমাণ।

"যার যেমন ইচ্ছে, রুচি, সংস্কার। তার মধ্যেই যতটুকু পাওয়া। আর কারও জন্যে তো নয়, তোমার নিজের বোনের জন্যই করছি"

খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। কথাতে কথা বাড়ে। বাড়িয়ে লাভ নেই। আগুনে ঘি ঢালা। অশান্তির ওপর আরও অশান্তি। এই মুহূর্তে অসীমের সে মনের অবস্থা নেই। কথায় না জড়িয়ে, একা থাকাতেই সাংসারিক মঙ্গল।

আজ-ই বর্ণালী কন্ট্র্যাক্ট সই করেছে। ইতস্তত করে বলেছিল "পারব?"

"না হলে কী উনি এমনি এমনি সই করাচ্ছেন? ব্যবসা করছেন। জনসেবা নয়। কন্ট্র্যাক্টটা পড়ে সই করে দাও"

নীরব কয়েক মুহূর্ত। বর্ণালী উঠে বলেছিল "চশমাটা নিয়ে আসি"

যদিও মনে তুফান। ঠিক করছে তো? একটাই সান্ত্বনা, সম্বিত সম্মতি দিয়েছে। নইলে হয়ত না-ই করে দিত। জীবন তাকে বারবার বাঁকে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যখন দোনামনায় দোদুল্যমান, ঠান্ডা মাথায় ভাবতেই পথ খুলে গেছে। সে পথেই হেঁটেছে। বিজিতের মৃত্যুর পর ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল। অ্যামেরিকা না কলকাতা? তখন ধীর স্থির ভাবে কলকাতায় ফেরার ডিসিশন নিয়েছিল। সম্বিত ছোট। মতামতের বয়স হয়নি। আজ হয়েছে। সায়ও দিয়েছে।

তুফান উঠেছিল আচমকা অসীমদার মিঃ রহিমকে নিয়ে আগমনে। ঘরে ঢুকে বলেছিল "কন্ট্র্যাক্টটা সই করাতে এলাম"

"আগে বলবে তো?"

"সেদিন তো ফোনে ইয়েস বললে। মিঃ রহিমও আর দেরি করতে চাইছিল না"

তুফানটা হঠাৎ ডিসিশনে। ভাবার সময় পায়নি। একদিকে ভালোই। আরও কত চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেত। যেখানে ভাবনা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, ঈশ্বর হঠাৎ-ই সে সুযোগ না দিয়ে কাজটা করিয়ে নেন। চশমাটা আনতে গিয়ে মনে হল, এতদিন তো এভাবেই জীবন কাটল। বৈচিত্র্যহীন। এখন যদি সেখানে একটু রং লাগে, ক্ষতি কী?

কন্ট্র্যাক্টটা পড়ে সই করে দিল। মিঃ রহিমও। সাক্ষীর সই করতে গিয়ে অসীম খুঁটিয়ে কন্ট্র্যাক্টটা পড়ল। যেমন বিজনেস ডিলে পড়ে। বিশেষ করে ভাষার মারপ্যাঁচ। রহিম চলে যেতে বর্ণালী বলল 'একটু বস। চা করে আনি" চায়ের কাপ এগিয়ে বলল "এসব করতে গেলে কেন? আমায় ঋণী করে দিলে"

অসীম অন্যমনস্ক। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাচটা মুছল। এটা যদি ও দয়া, দাক্ষিণ্য, করুণা হিসেবে নেয়, আর মুখ দেখাতে পারবে না। মৃত্তিকার সুপ্ত ইচ্ছেকে স্বীকৃতি না দেওয়াতে ব্যর্থতা প্রকট। চাওয়া ছাড়া কী মানুষ বাঁচতে পারে? মৃত্তিকা পারেনি। ভুল বুঝেছে। বর্ণালী না ভুল বোঝে।

অন্ধকারে সাঁতার কাটা অসীমের মুখে এক ঝলক হাসি "তুমি কী ভাবছ কিছু পাওয়ার আশায়?" চায় চুমুক "মানুষ বিচিত্র জীব। সম্পর্কগুলো চাওয়া-পাওয়ার খাঁচায় বন্দি। তার বাইরেও কিছু থাকতে পারে, ভুলে যায়। জানে না। বিশ্বাস করতে চায় না। এর বাইরে নিঃস্বার্থ সম্পর্কেও আনন্দ আছে। হিসেবের বাইরে। কোনও অংশে কম নয়"

লজ্জায় বর্ণালীর মুখ লাল। এমা! এভাবে তো ভাবেনি। জীবন হয়ত দারিদ্র্য থেকে উঠে আসা অসীমদাকে, এভাবেই দুনিয়া দেখতে শিখিয়েছে। এখন সব সম্পর্কের মধ্যেই সেই হিসেবের শঙ্কা। ভীষণ দুঃখ হল। অসীমদাও তাকে ভুল বুঝল। নিজের অজান্তেই চোখে জল। শাড়ি দিয়ে চোখ মুছল। অসীম বুঝতে পারল, জাগতিক সত্য বলতে গিয়ে ওকে কোথায় আঘাত দিয়েছে। উঠে পাশে বসল। হাতটা ওর হাতে রেখে চাপ দিল। স্পর্শে বর্ণালীর দেহে বিদ্যুতের শিহরণ। আকাশের তারা ওর কাজলকালো চোখে চিকচিক করছে। মুখ নিচু বসে।

"আমার দিকে তাকাও বর্ণা। ছোটবেলা থেকে তো কেবল স্বার্থের সঙ্গেই খেলেছি। এখনও খেলছি। বাইরের মানুষ গুটিকয়েক, হাতে গোনা। অজান্তেই তোমায় দুঃখ দিয়ে ফেললাম। একমাত্র মৃত্তিকাই ছিল স্বার্থের দুনিয়ার বাইরে। ও চলে যাওয়ার পর অসহায় লাগছে। আমি বড্ড একা। তোমার আনন্দই আমার আশ্রয়"

অসীমের অন্তর যেন কিছু চাইছে। কিছু একটা, যা স্বর্ণালী দিতে অপারগ। নিভৃত আশ্রয়। মৃত্তিকাদির মৃত্যুর পর যা শূন্য। চাওয়াটা সাংসারিক নয়, মানসিক। তা দিতে পারলেই ঋণ শোধ। অন্যান্য দিনের চেয়ে অসীমদা অনেক আবেগপ্রবণ। হাতটা ওর হাত থেকে সরিয়ে নিল "বস। আসছি"

কতক্ষণ বাথরুম থেকে বেরিয়ে একা ঘরে অন্ধকারে বসে ছিল, খেয়াল নেই। হুঁশ হতে, ফেরত এসে দেখে অসীমদা চলে গেছে। কন্ট্র্যাক্ট নয়। অন্য কিছু। নাড়িয়ে দিয়েছে ওকে। তুফান যদি বা থেমেছিল। অসীমদার যাওয়ার পর সুনামির শুরু। অসাধারণ ঝড়। নাড়িয়ে দিচ্ছে তার সত্তাকে, বিবেককে, সংস্কারকে। সুনামির দাপটে পালতোলা নৌকো এলোমেলো। এখন ঝড়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ না তীরে পৌঁছয়। তীরের রেখা দেখার চেষ্টা বৃথা। যখন সুনামি থামবে, কোথাও তো গিয়ে ভিড়বে।

ততক্ষণ প্রতীক্ষা...

সুনামি অসীমের মধ্যেও। স্বর্ণালীর শ্লেষও অসহ্য। যেন কাছের হয়েও অনেক দূরের। অসীমের আর কাছকে দেখার দরকার নেই। আগে বারান্দায় বসে, ঝিঁঝি পোকার শব্দের মধ্যে তারা খোঁজার চেষ্টা করত। এখন আর শান্ত নীরবতায় নয়। বর্ণালীর চাপা কান্নায়।

অন্ধকার ঘরে একা। চেয়ে আছে আকাশের দিকে। গভীর রাতের আকাশ অদ্ভুত রহস্যময়। এভাবে কখনও দেখেনি, অনুভব করেনি। অজানা অচেনা অন্য আকাশ। আকাশ জুড়ে অজস্র তারার দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাদের মধ্যে সপ্তর্ষি মন্ডল। ক্যাসিওপিয়া। মাঝ আকাশে দুই ডানা দুদিকে ছড়িয়ে উড়ছে ধপধপে সিগনাস। দর্পিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কালপুরুষ ওরায়ন। এক হাতে ধনুক, অন্য হাতে তির। কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে তীক্ষ্ণ তরবারি। ঝকঝক করছে নীলাভ রিজেল। পায়ের কাছে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে লুব্ধক। অজস্র নাম-না-জানা তারাগুলো ভিড়ে ঠেলাঠেলি।

সবাই অধীর প্রতীক্ষায়। একটু পরেই আসবেন মহান অস্তিত্ব। রাজার রাজা। অন্যদিকে তাকাল। আরও স্তম্ভিত। ওদিকে ম্লান আলো ছড়িয়ে। সেই আলোর প্রদীপ হাতে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে পরম রহস্যময় চাঁদ। এমন কখনও দেখেনি। এ এক অন্য চাঁদ। ম্লান গেরুয়া-হলুদ আলোর আলখাল্লায় সর্বশরীর ঢেকে আকাশগঙ্গার রাজপথ ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে। তার আলোয় আকাশে ছড়ানো তারাগুলোর দিকে দুহাত বাড়িয়ে বিলোচ্ছে করুণার ঝর্নাধারা। যেন অজস্র নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারাগুলোকে দুহাত বাড়িয়ে নিজের আলোর আশ্রয়ে টেনে নিচ্ছে। এভাবে কখনও দেখেনি। চিরচেনা চাঁদের এই রূপ আগে কখনও লক্ষ করেনি। এই চাঁদ যেন আড়াই হাজার বছর আগের এক সর্বত্যাগী রাজপুত্র। পৃথিবীর মানুষ, মনুষ্যেতর সব

প্রাণীর দুঃখে যাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। যাদের মুক্তির জন্য তিনি সর্বসুখ ত্যাগ করে তুলে নিয়েছিলেন কাষায়বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র। চীবরধারী সেই পরম কারুণিক বুদ্ধদেব স্বয়ং আজ চাঁদের রূপ ধরে আকাশ-শ্রাবস্তির পথে নেমে এসেছেন নিরন্তর দুঃখের আগুনে অনন্তের আশায় ধিকিধিকি জ্বলা তারাদের মুক্তি দিতে।

অসীমের দুচোখ বেয়ে নেমে এল আশ্চর্য কান্না। বিশ্বজনীন পরম করুণাময় সেই কান্নার নোনতা জলের স্বাদভরা মুখে আকাশের দিকে ভেজা চোখ তুলে ফিসফিস করলঃ

'নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্য'

আঠাশ

“করে দিতে পারবে না?” অরুন্ধতীর প্রশ্নে ওর দিকে তাকাল। চোখ চিকচিক নতুন স্বপ্নে। নতুন চাওয়ায়। এর আগে এভাবে দেখেনি ওকে।

“পারব না কেন?”

প্রতীকের উত্তরে অরুন্ধতী ওর পাশে নিবিড় হয়ে বলল “সুব্রত সিংহর সঙ্গে আলাপটা জরুরি” আরও নিবিড়ভাবে ঘেঁষে বলল “তোমার সঙ্গে কেমন আলাপ?”

“হয়ে যাবে” সংক্ষিপ্ত প্রতীক। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত দিনগুলোর স্মৃতি আর্কাইভ থেকে ক্যাশে।

অরুন্ধতীর ঠেকানো স্তনে এই বয়সে যত না উষ্ণতা, স্বরে অনেক বেশি। মেয়েরা বড় হয়ে গেলে, উষ্ণতার ব্যঞ্জনাও ধ্রুবতারা পালটায়। প্রতীকের এখন সেই দশা। কম বয়সে হলে দৈহিক আকর্ষণ স্বরের উষ্ণতাকে ছাপিয়ে যেত। অরুন্ধতী পুরনো ক্লিসে খেলা খেলছে। প্রতীকের চাহিদা হ্রাস পেলেও, ওর তো এখনও অত বয়স হয়নি। অতৃপ্ত মেয়েদের দেহের খিদে থেকেই যায়। অরুন্ধতীই বা বাদ কেন। যার সঙ্গে ঘর করছে, তার সঙ্গে না আছে মনের মিল, না দেহের টান।

“কী করে হয়ে যাবে?” অরুন্ধতী উদগ্রীব।

“অত প্রশ্ন করার কী আছে? বললাম হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। একজনকে ম্যানেজ করতে হবে, এই তো? ব্যাস, করে দেব। প্রশ্নের এত কি আছে? আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। কার গাছ, কত আম দেয়, আম পাড়তে কী করতে হয়, কীভাবে বিকয়, এসব জেনে কী লাভ?”

অরুন্ধতী চুপ। সার কথাটা বলে দিয়েছে প্রতীক। প্রতীক কী থট রিডিং করতে পারে? মনে মনে তাইতো চাইছিল। তবু সংশয়ের জন্যই প্রশ্ন। সুব্রত সিংহকে ম্যানেজ করতে পারলে ফ্যাশন আনলিমিটেড ছাড়ার কথা ভাবতে পারবে। এখন সেটাই মুখ্য। যে স্বপ্ন নিয়ে কাজে ঢুকেছিল, সেই স্বপ্ন পূর্ণেন্দু সেনের দৌলতে হাওয়ায়। আজকের দিনে বেঁচে থাকার পাথেয় হলেও, অরুন্ধতীর নয়। মেয়েগুলো বড় ব্রেক চায়। অরুন্ধতী নয়। মেয়েছেলের দালালি করে তো নয়ই। অল্পেতেই তুষ্ট, স্বনির্ভর হলে। জয়ন্ত যে পথে এগোচ্ছে, ঘরটা ক'দিন টিকবে, যথেষ্ট সন্দেহ। একবার ধরা পড়লে সিবিআই চক্করে পড়তে কতক্ষণ? সরকারি চাকুরে। উত্তর অজানা নয়। যত খারাপ-ই লাগুক না কেন, টুবলুর কথা ভেবে অল্টারনেটিভ ঠিক না করে, এ মুহূর্তে চাকরি ছাড়াটা বোকামো। তাই প্রতীক।

সুব্রত সিংহ উঁচু খেলোয়াড়। ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির এক নম্বর। সেখানে হয়ত সর্বেসর্বা হবে না, ভালো মায়না পেলে, ক্ষতি কী? হায়েস্ট পজিশনে থাকার হ্যাপা অনেক। স্বাধীনতা থাকলেও, অনেক কঠিন ডিসিশন নিতে হয়, যা নিচু পজিশনের লোককে নিতে হয় না। হুকুম তামিল করেই খালাস।

“হঠাৎ চাকরি ছাড়ার কথা ভাবছ কেন? তুমি তো ফ্যাশন আনলিমিটেডের রানি”

“তাই দিচ্ছি কুরবানি” ঘটনাটা বলল প্রতীককে। নইলে ও বুঝবে না।

“হুম... চক্কর সব জায়গায়ই এক। তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে সেটাই প্রশ্ন। ব্যবসা করি বলেই বুঝি। নীতি আর ব্যবসা এক পুকুরে জল খায় না। সর্বত্র আপস। কতটা পোষা কুত্তা হবে, তোমার নিজের। আমার সেদিক থেকে সুবিধে। কারও জন্য করি না। মন যতখানি সায় দেয়, ততটুকুই। নইলে নয়”

গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটা টিকটিক করছে। অরুন্ধতীর ভেতরটাও।

প্রতীক বার ক্যাবিনেট থেকে ড্রিঙ্ক বার করে ওর হাতে দিয়ে বলল “রিল্যাক্স। ঈশ্বর প্রবলেম ক্রিয়েট করে সলিউশনের জন্য। আমারাই খালি জানি না”

ডিঙ্কসে চুমুক। সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে বলল “মন মানলে তো সব-ই হয়ে যেত। মানুষ তো। দেবতা নই। সিদ্ধ পুরুষও নই। যার প্রবলেম সেই বোঝে” কথায় দীর্ঘশ্বাস।

“বলেছি তো হয়ে যাবে। বুঝলাম না আমার ফার্মে কেন নয়”

“এখনও পেনসনের বয়স হয়নি। তাছাড়া তোমার লাইনের কতটুকু জানি? এ লাইনের আদবকায়দা এতদিনে শিখে গেছি”

“শিখেছ কী? এতদিনে পূর্ণেন্দু সেনকে চিনলে? বদ্যি। আগেই আঁচ করা উচিত ছিল। বদ্যিরা ব্যবসা ভালো বোঝে বলেই তো ওদের ওই গোত্র”

“খাসনবিশের সঙ্গে একটু ঢলাঢলি। পার্টি। ঠিক আছে। মেয়েছেলের দালালি করার জন্য লেখাপড়া শিখিনি”

“তাই তোমাদের মতো মেয়েদের চাকরি করা উচিত। প্রফেসারি, আইএএস, কতকিছু করতে পারতে। সব ছেড়ে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি। যাদের কিছু আর করার নেই তারাই শো-বিজ। যাদের ক্ষমতা আছে তারা কী এ লাইনে যায়?”

“এখন এটাই সংস্কৃতি। লাইমলাইট। এই এজে মানি”

“যদ্দিন যৌবন আছে, করে নেওয়া। চলে গেলে তো পুঁছবে না”

“যুগটা পালটে গেছে। কেউ অপেক্ষা করতে চায় না। এখন-ই চাই। যত কম এফর্টে। ওই কয়েক বছর। যা পারো কামিয়ে নাও। পরে ওর সুদে রিল্যাক্স কর”

প্রতীক ড্রিঙ্কে চুমুক দিয়ে বলল “অন্য একটা কথা ভাবছিলাম। যদিও-বা সুব্রত সিং করে দেয়, পূর্ণেন্দু সেন কাঠি দেবে না তো?”

অরুন্ধতী বিরক্ত হয়ে বলল “কাঠি দেওয়ার কী আছে? বেটার চাকরি পেলে যে কেউ যেতেই পারে। আফটার অল, সুব্রত সিংহর ফার্ম নাম্বার ওয়ান, অস্বীকার করার তো কিছু নেই”

“হলেই বা। সেন তো। ওর পেয়ারের এমডি বিনা কারণে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, হজম করতে অসুবিধা হতে পারে”

“চাকরি করি। ক্রীতদাস নই” অহং স্পষ্ট।

সুব্রত সিংহর সঙ্গে পার্টিতে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি। মুম্বাইয়ের ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডের চাবিকাঠি ওর মুঠোয়। জানে, মুম্বাই রিলোকেট করতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে টুবলুকে বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে দেবে, ঠিক করেই নেমেছে। এমনিতেই বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিল। নিজের লাইফস্টাইলে জয়ন্তর ওপর ভরসা করতে পারছিল না। হি উড বি বেটার অফ ইন আ হেলদি সারাউন্ডিং।

“দেখি রাজি করাতে পারি কি না। তোমার সিভিটা মেল করে দিও”

একলা থাকাতে শান্তি। মুম্বাই হলে প্রতীককেও কাছে পাবে। যদিও মাসের ফিফটি পার্সেন্ট ও বাইরে। তবুও মাধেমধ্যে দেখা করা। মনের কথা বলা। সেক্স। সব কিছুরই চাহিদা আছে। কার নেই? অরুন্ধতীই বা বাদ কেন। যেখানে মনের মিল নেই, সেখানে সেক্স করতেও ইচ্ছে করে না। কেন যে জয়ন্ত সেকথা বোঝে না? কলেজ জীবনে এ দিকটা যত বৈচিত্র্যময় ছিল, এখন তো শুধু প্রতীক।

সেদিনও খাস্তগিরের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর হয়ে খেলে এসেছে। মেয়েগুলোকে ছেড়ে ভডকা হাতে অরুন্ধতীর পাশে। বুঝতে পারছে বেশ কয়েক পেগে কথগুলো জড়ানো “অ্যাট লাস্ট আই অ্যাম ফ্রি। ওরা ছাড়ছিলই না”

অরুন্ধতী হাসল। ছাড়ছিল না, না তুমি ওদের পিক অ্যান্ড চুজ করছিলে। মেয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বুড়ো হয় গেল, চুলকানি কমল না। ক'জনের সঙ্গে শুলে বলা যায়, আর নয়। কিছু লোকের লিবিডো মজ্জায়। বয়সের সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোরশনাল নয়। বাড়লেও, কমার কোনও লক্ষ্মণ নেই। সেই এক-ই তো। কীসে যে আনন্দ, বুঝে উঠতে পারে না।

খাস্তগিরকে পাশে বসতে দিয়ে আর চোখে দেখল প্রতীক কাছেই একজনের সঙ্গে কথা বলছে। বডি-গার্ড মজুত।

আদুরে, ন্যাকা স্বরে বলল "আপনি কিন্তু আমাদের দেখছেন না"

"কেন? কে বলল?"

"আমি" ভডাকায় চুমুক দিল অরুন্ধতী।

"তোমার জন্য কী করতে পারি? আমি তো জীবন দিতেও প্রস্তুত" জড়ানো স্বর।

"এতটা করতে হবে না। আপনি চলে গেলে আমাদের দেখবে কে?"

খাস্তগির ওর কাঁধে হাত ছড়িয়ে গালের কাছে মুখ এনে বলল "আর কী করতে হবে?"

"মেয়েগুলোর প্লেসমেন্ট। আপনি না দেখলে ব্যবসা লাটে উঠবে"

"বেশ। কানোরিয়াকে বলে দেব। পার্সেন্ট কিন্তু বেশি দিতে হবে" জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক।

"মিঃ খাস্তগির... আপনার সঙ্গে আমার কী পার্সেন্টের সম্পর্ক?"

গ্লাস শেষ করে খাস্তগির সামনের বেয়ারা থেকে আরেকটা নিয়ে বলল "তোমার সঙ্গে তো জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক" নিবিড় হল অরুন্ধতীর দিকে।

"জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক নয় এ জন্মেই চুকালেন, পার্সেন্ট বাদ দিয়ে"

কিছুক্ষণ নীরব। হুইস্কিতে চুমুক "জো হুকুম"

"কানোরিয়ার পার্সেন্ট কত?"

"টুয়েন্টি"

ঝুঁকল চটি ঠিক করার আছিলায়, যাতে সালওয়ারের ওপর দিয়ে ওর স্তনের খাঁজ দেখতে পারে "ফিফটিন। আপনি বললে কানোরিয়া না করতে পারবে না"

খাস্তগিরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভডকা মাথায় চড়ছে। উত্তর দিতেও কষ্ট। অরুন্ধতী বেশ বুঝতে পাছে আজকের পিকের হাল। হুঁশ থাকবে তো? কিছু করা তো কল্পনারও বাইরে। অন্যখানে যা দিতে হবে, তার জন্য তো প্রস্তুত। এখানে অন্তত ঢলাঢলি করতেও হবে না। কালী হোটেলে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া। ওরা যাই চাক না কেন, যেখানে প্রয়োজন নেই, সেখানে ওদের শিল্ড করছে। এটুকুতেই শান্তি। বিবেকের কাছে।

"ফিফটিন তাহলে। কালকে কন্ট্র্যাক্টটা পাঠিয়ে দেব" উঠে পড়ল।

ঢুলু ঢুলু চোখে খাস্তগিরের প্রশ্ন "যাচ্ছ কোথায়? দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং"

"যাব কোথায়? এখানেই আছি" প্রতীকের দিকে আঙুল "উনি অনেকক্ষণ কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছেন। বসুন। আসছি"

বুঁদ খাস্তগিরকে সোফায় ঢলে পড়তে দিয়ে সরে গেল।

"পালিয়ে এলে?" প্রতীক হাসল।

কথাগুলো মনে হতেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এখানে নয় ওদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় পূর্ণেন্দু সেন রথী-মহারথীদের ভেট দেবে ওদের? তখন ও নেই। কিংবা থাকলেও কিছু করতে পারবে না। বিবেকের দংশন কী শিক্ষা, রুচিতে? না কি, যুগের তালে নিজেকে 'এগিয়ে' নিয়ে না যেতে পারায়? যে কারণেই হোক, মন যেখানে সায় দেয় না, সেখানে নেই। যেমন নেই জয়ন্তর দুনিয়ায়। যখন ঠিক করেছে ফ্যাশন আনলিমিটেড ছাড়বে, ছাড়বেই। সুব্রত সিংহ নইলে ভালো, নইলে অন্য কোথাও। টাকা কামাতে হবে। যেখান থেকেই হোক। যা মন চাইবে, তাই করবে।

"মুম্বাই রিলোকেট করতে অসুবিধা নেই। তুমিও তো ওখানে"

ম্যালেরিয়ার পর থেকে ওর প্রতি প্রতীকের দুর্বলতা অজানা নয়। সেটাও যদি কাজে লাগে। সব হাতিয়ার নিয়েই চেষ্টা করা। প্রতীকও ভাবছে, একা জীবনে কাছাকাছি অরুন্ধতী থাকলে ওর পক্ষেও লাভ। সুব্রত

সিংহের কাছে কথাটা এমনভাবে পাড়তে হবে পূর্ণেন্দু সেনের বক্তব্যকে নস্যাৎ করে। ফন্দিটা যুতসই হওয়া চাই। যাতে সুব্রত নিতে বাধ্য হয়। দেখা যাক। কাজটা হলে বোঝা যাবে।

ছাব্বিশ

এবার রক্তিমা নয়। নীলিমার সঙ্গে সন্ধে কাটিয়ে যখন জয়ন্ত ফিরল, মন উৎফুল্ল। রক্তিমার কটাক্ষ 'আপনি যে ঢোড়া সাপ তা কী নীলোৎপল জানে?' এখন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে নয়। নীলিমার কোমল স্পর্শ দগদগে ঘায়ে মলম। সাওয়ারের ঠান্ডা জল দেহমন জুড়িয়ে দিল। অরুন্ধতী-টুবলু স্বর্ণালী-তুলির সঙ্গে উইকেন্ডে মন্দারমণিপুর বেড়াতে গেছে। বাড়ি ফাঁকা। খেয়েই এসেছে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাকি গ্লেনমর‍্যাঙ্গিটার নেশা দিয়ে সেলিব্রেট করে। আলমারিতে ব্রিফকেস খুলে দেখল। আজকের ভেট যথাস্থানেই। পাজামা পাঞ্জাবিতে সোফায়, স্কচে চুমুক।

বাড়ি ফাঁকা বলে কিঙ্কর এখানেই টাকাটা দিয়ে গেছে। ওদের জার্মানি থেকে বড় শিপমেন্ট আসছে। ডিউটি চেকিং ছাড়াই পাস করিয়ে দিতে হবে। বড় ইমপোর্ট মানে অনেক আমদানি। সঙ্গে নীলিমা। কামিনী কাঞ্চনে মন উৎফুল্ল। অরুন্ধতী-টুবলুর অনুপস্থিতিতে পূর্ণ স্বাধীনতা।

বেশ কয়েকদিন কিঙ্করের অফিসে যাতায়াত "অনেক টাকার মাল। দেখবেন স্যার"

"এখানে নয়, অন্য কোথাও কথা হবে"

দেখা নয়, ফোনেই ডিল পাক্কা। বিকেলে কিঙ্কর বাড়ি বয়ে এসে টাকাটা দিয়ে গেছে। গোনার সময় পায়নি। আলমারি থেকে অ্যাটাচি বার করে টেবিলে ছড়িয়ে। গুনতে হবে। একদিনে কয়েক লাখ ক'জন কামাতে পারে? লাখপতি জয়ন্ত খুশি হবে না তো, কে হবে? চুলয় যাক অরুন্ধতী। বেঁচে থাকুক টাকার আমদানি। বেঁচে থাকুক নীলিমার মতো আরও। আসতে থাকুক টাকা। সঙ্গে নীলিমা, অবন্তিকা, পল্লবী। আলোয় ভরিয়ে দিক জীবন। কেটে যাক একার কালিমা। রক্তিমা ছাড়াই আলোকিত নিশানা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবছিল নির্জন আশ্রয়ের মেয়েগুলোর মধ্যে কয়েকজনকে শয্যাসঙ্গী করবে। প্রমীলা দাসগুপ্তকে বাগে আনতে খুব কষ্ট হত না। হাতে টাকা থাকলে, লোককে বাগে আনতে কতক্ষণ? সবার-ই কোনও না কোনও উইক পয়েন্ট আছে। বেশিভাগের টাকা। কারও নাম, যশ, প্রতিপত্তি। যতই হম্বিতম্বি করুক, সবাই ভিখারি। খালি ভিক্ষার ব্যঞ্জনা জানা আবশ্যক। চাওয়াই মানুষকে কাঙাল করে, দেওয়া নয়। এখন এসব মেয়েদের নিয়ে নাম খোয়াতে হবে না, এতেই শান্তি। যৌবনের স্ফুরণ অনেক সময় বেসামাল করে দেয়। শ্রেয়র সংজ্ঞা লোপ পায়। ঈশ্বরের কৃপা, জয়ন্তর ক্ষেত্রে তার আগেই লাগাম টেনেছে।

রক্তিমার চেয়ে নীলিমা অনেক প্রফেশনাল। সোজা বিছানায় তোলেনি। দুজনে জেডব্লিউ ম্যারিয়টে ডিনারের সঙ্গে অনেক গল্প করেছে। তারতম্য বুঝতে পারছে। কামাতে তো ওরা দুজন এই পথে। কিন্তু ক্লাস আলাদা। সোনাগাছি আর ফাইভস্টার এসকর্ট এক হল? নীলোৎপল আর কিঙ্করের মধ্যে যা তফাত, এদের মধ্যেও। নীলোৎপল ছোট ব্যবসায়ী। কিঙ্কর কোটির। ভেটের যেমন আধিক্য, ক্লাসেরও ফারাক। নীলিমার সঙ্গে না কাটালে বুঝতই না সে ঢোঁড়া সাপ না কেউটে। অনেকদিনের অনভ্যাসের ফলে হুট করে যে করতে নেই, রক্তিমা শেখেনি। নীলিমা জানে কেউটেকে কীভাবে জাগাতে হয়। এটাই প্রফেশনালিজম। ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট করা। সময়টা কোনও ফ্যাক্টর নয়।

নীল সিকোয়েন্স শাড়িতে নীলিমা সেলেবদের থেকেও উজ্জ্বল। কপালে নীল টিপ, গলায় মুক্তোর মালা। কানেও মুক্তো। বাঙালিয়ানা থাকলেও ক্লাসি। হোটেলের লবিতেই অপেক্ষা করছিল। পূর্বপরিকল্পিত কথা অনুযায়ী রিসেপশনিস্টের ইঙ্গিতে এগিয়ে এসে বলল "আমি নীলিমা। কিঙ্কর পাঠিয়েছে। খেয়ে এসেছেন?"

মাথা নাড়ল জয়ন্ত। অফিসের পর টাকা আসবে বলে নিতাইয়ের মাকে অফ করে দিয়েছিল। অ্যাটাচিটা আলমারিতে ঢুকিয়ে, ফ্রেস হয়ে ম্যারিয়টে।

“চলুন খেতে খেতে গল্প করি” ভিন্টেজ এশিয়াতে। গ্রুমড। জানে কাকে নিয়ে কোথায় বসতে হবে। জয়ন্তর মতো ভেতো বাঙালিকে অন্য পরিবেশে ফেললে অ্যাক্লিমাইটেজন করতেই সময় নষ্ট। তা না করে গল্প করো। মেক হিম অ্যাট ইজ। জড়তা থাকলে সফলতা দেরিতে। কাটালে তাড়াতাড়ি। তাই জড়তা কাটাও, সময় বাঁচাও। ক্ষণিকের ইমোশন না থাকলে দৈহিক সঙ্গমও সফল হয় না।

ডিম সাম, চিকেন ওয়ান্টন ইন সুপিরিয়র ব্রথ অর্ডার দিয়ে বলল “রিল্যাক্স... নয় আমাকে বাড়ির এজকন মনে করলেন। স্ত্রী নই, বন্ধু বা প্রেমিকা হতে তো বাধা নেই” জয়ন্ত কোনও কথা বলছে না দেখে বলল “কী হল? বন্ধু হতে চান না। তাহলে আর কী। খেয়ে বাড়ি যাই”

এর আগে তো কোনও নারী এত নিবিড় করে বলেনি। ছোটবেলার চাওয়া আজ সামনে। যা অরুন্ধতীর কাছ থেকেও পায়নি। মনে হল নীলিমা খুব কাছের। পরে কী করল, পরের। ওর সঙ্গটাও প্রাপ্তি।

“না, না যাবেন কেন? হব বলেই তো এসেছি। আশার চেয়েও বেশি। কী আর বলি। চাকরি করি। সংসার করি। বউ-বাচ্চা আছে”

“বাচ্চার বয়স কত? নাম কী?”

“সাত। টুবলু। ওরা উইকেন্ডে মন্দারমণিপুর গেছে”

“বেশ তো। মাঝে মাঝে ভ্যারাইটি লাগে। ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ। রোজ তো ভাত-মাছ-চচ্চড়ি খান। আজকের মতো চাইনিজ নয়। স্বাদ পালটালে মন ভালো থাকে। জীবনের রস পাওয়া যায়”

কত সহজে কথাগুলো বলল। আহাঃ, জয়ন্ত যদি ওর মতো কথা বলতে পারত। কিংবা অরুন্ধতী এভাবে আপন করে নিত। তাহলে জীবনটাই অন্যরকম হত। গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন নীলিমা।

“ঠিকই বলেছেন”

“আহা, আবার কেন? বন্ধু, প্রেমিকাকে কী কেউ আপনি বলে? স্রেফ তুমি। মানে উইকএন্ড ফ্রি। ঝাড়া হাত-পা। ফেরার তাড়া নেই। কোনও হবি আছে?”

“নাঃ”

বাবা খালি পড়েই মানুষ হতে শিখিয়েছে। মানুষ হওয়ার সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার কোনও যোগ নেই। জীবনকে সব দিক দিয়ে জেনে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সার্থকতা। কেবল কমিশনার অফ এক্সাইজের গদিতে সীমাবদ্ধ নয়। পড়া ছাড়াও যে অন্যান্য অনেক কিছু আছে জীবনে, শেখেনি। পড়া, কাজ, রোজগার, সংসার। সীমার বেষ্টনীতে ক্ষণিক জীবন। তাই নিয়ে মাতামাতি, কাদা ছোড়া, ওঠা বসা। বাঁচার মানে খোঁজা। বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। মানসিক বন্দি তার মধ্যেই মুক্তি খোঁজে। সমাজের কেউকেটা যত, অস্তিত্ব সংকট তত। সর্বদাই নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টায় কখন যে ঢংটা সং হয়ে দাঁড়ায়, ক’জন বোঝে?

“কাজের পর কাটান কী করে?”

“টিভি দেখে” সংক্ষিপ্ত উত্তর।

“সিনেমা, সিরিয়াল?’

“ওই যা টিভিতে। হলে যাওয়া হয়ে ওঠে না”

“বন্ধু-বান্ধব?”

“খুব বেশি নেই”

“বেশ। আজ থেকে একজন তো হল”

ডিমসামে কামড় দিয়ে বলল “বেশ ভালো খেতে”

“না জিজ্ঞেস করেই অর্ডার দিয়েছি। দু’জনের ভালোলাগা দেখুন কেমন মিলে গেল। মানে আমি আপনার বন্ধু”

বেশ লাগছে মেয়েটিকে। কত সহজেই আপন করে নিয়েছে। ক’জনই বা পারে এই কম আলাপে আপন করে নিতে। মেয়েদের প্রতি জড়তা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। কলেজ জীবনে এরকম কেউ এলে, জীবনটাই অন্য

রকম হত। কিছুক্ষণ আগে কিঙ্করের টাকা বোঝাই অ্যাটাচির থেকে কম নয়।

জয়ন্ত হাসল "আপনি?"

"আমি কী? নাম তো জানেন। থাকি কাছেই, বোসপুকুরে। বাবা, মা, ভাই। ছোট্ট সংসার"

বলতে পারল না, বাবা স্ট্রোকে পঙ্গু। ভাই স্কুলে। সংসার চলে ওর কামাইতে। সামাজিক মুখোশের আড়ালে আসল মানুষটাকে ক'জনই বা দেখে, চিনতে চায়? সবাই সামাজিক পুতুল দেখে অভ্যস্ত। মানুষ নয়। রোবটের মতো কিলবিল করছে চেনা চৌহদ্দিতে। সীমার বলয়ে। অন্ধকারেই বাস। দুঃখ, আনন্দ, উচ্ছ্বাস। খুঁজছে শান্তির আভাস।

"এ পথে?"

"থাক না ও কথা। মুহূর্তটাকে নষ্ট কর না। এই রে, তুমি বলে ফেললাম"

"বন্ধু বেলে ডেকেছেন। বেশ করেছেন"

এই প্রথম জয়ন্তর বক্তব্য। এটাই চাইছিল নীলিমা। জীবনের কালিমা পড়ে থাক আঁধারে। আলোকিত হোক ক্ষণকাল তৃপ্তির আলোতে। তৃপ্তি ভোগে, নইলে দুর্যোগ।

"আর কিছু অর্ডার দেব?"

"এখন না। পরে"

"বেশ থাক। আপনাকে দেখে টায়ার্ড লাগছে। আফিস থেকে সোজা?"

"না, বাড়ি ঘুরে"

নীলিমা মুখ দেখেই ধরে ফেলে। অনুভূতি না থাকলে সম্ভব? এতটুকু যদি অরুন্ধতীর থাকত... আগে পরিচয় হলে একেই... তখন হয়ত ওকে এপথে নামতে হত না।

"চলুন ঘরে গিয়ে রিল্যাক্স করি"

ঘরে ঢুকেই পর্দাটা খুলে দিল। পড়ন্ত বিকেলে শহরের অন্য রূপ। জানলা দিয়ে কলকাতার বার্ডস আই ভিউ। সন্ধের জমজমাট শহরে আলোর রোশনাই। বাইপাসে গাড়িগুলো হুশ-হুশ করে ছোটার ফাঁকে গেঁথে যাচ্ছে রিয়ার লাইটের মালা। সূর্য দেখা না গেলেও 'গাড়িধূলির' আলো আঁধারি লুকোচুরি। জানলার পাশের সোফায় বসে তাকিয়ে থাকলেই সময় কেটে যায়। পুবের কলকাতায় মানুষের ভিড় না থাকলেও শুক্রবারের সান্ধ্য শহর নতুন সাজে।

"হুইস্কি?"

"খুব কম খাই"

"তাহলে কী? বাকারডি, না জিন?"

দুটো সাদা হলেও ক্লাসের তফাত। মেয়েরা জিন খায়, ছেলেরা রাম। রাম না খেলে পৌরুষ থাকে! অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তত হচ্ছে। রক্তিমার শ্লেষ যাতে শুনতে না হয়। দেহমনকে সেভাবেই সাজাচ্ছে। সিংহ যাতে নীলিমায় হারিয়ে না যায়।

"বাকারডি উইথ কোক"

অর্ডার দিয়ে নীলিমা উলটো সোফায়। আঁচলটা আলগা। বুকের একাংশ ব্লাউজে ঢাকা। জয়ন্তর দেখার ইচ্ছে থাকলেও জড়তা। মধ্যবিত্ত রক্ষণশীলতা। ইচ্ছেটাকে না দমিয়ে দেখে নিল। ছিপছিপে নীলিমার বুক গড়নের থেকে ভরাট। লো-কাট ব্লাউজে ফর্সা শরীরের অনেকখানি এমনিই বাইরে। শাড়ির ফাঁক দিয়ে নাভির অংশ দেখা যাচ্ছে। লিপস্টিক, হাল্কা মেকআপ। কর্নার ল্যাম্পের আলোয় মুক্তোর হার চিকচিক। মিষ্টি গ্ল্যামার।

অনেক সময় অতিরিক্ত মেক-আপ মাধুর্যে প্রলেপ দিয়ে কৃত্রিম করে। অনেক মেয়ে বোঝে না। বেশি সাজলেই সুন্দর লাগে না। পুরুষেরা মুচকি হাসে। মহিলারা আত্মতুষ্টিতে ভাসে।

"বেশ লাগছে। তুমি সিগারেট খাও না?"

"না। কম বয়সে এক-দুবার ট্রাই করে কাশির দমকে আর খাইনি। একদিক দিয়ে ভালো। এখন তো বেশিরভাগ হোটেলেই নো-স্মোকিং"

কোনও তাড়া নেই। ড্রিঙ্কের সঙ্গে সসেজ ককটেল। এভাবেই তো শুক্রবারের সন্ধ্যা রিল্যাক্স করার জন্য। বুঝতে পারছে, দোষটা তার নয়, রক্তিমার। তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই সব পণ্ড করে দিয়েছে। শেষে কি না তাকেই ঢোঁড়া সাপ বলে খালাস। রক্তিমার লালিমায় মাদকতা থাকলেও নীলিমার নীলে গভীরতা। যা অন্তর ছুঁয়ে যায়। অন্তরের গভীরতাতেই আকর্ষণ। নীলিমা ক্রমশই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। আকর্ষণটাও বাড়ছে।

"টিভিতে কী দেখতে বেশি ভালো লাগে?"

"নিউজ। রিয়্যালিটি শো, সারেগামা বা দাদাগিরি"

"সিরিয়াল নয়?"

"দেখি না। তুমি?"

"সন্ধেতে সময় কই। সন্ধেতেই তো কাজ। সকালে ঘরের কাজ। মায়ের বয়স হয়েছে। হাঁটুর ব্যথা। যতটা পারি সাহায্য করি" নীলিমা স্বাভাবিক।

নীরবতায় সূর্য হারিয়ে গেল। বাইরের আকাশে গুম মারা অদ্ভুত স্তব্ধতা। থমথম করছে। চাঁদ তখনও ওঠেনি। পুবের আকাশে ঘন মেঘের আস্তরন। ধোঁয়াটে। তারাগুলো মিটমিট করছে লো-ওয়াট বালবের মতো। হাওয়ায় বাইপাসের ওধারের গাছগুলো দুলছে। চাঁদ ঢাকা মেঘটা কাপড়চোপড় সামলাতে শশব্যস্ত। চাঁদও সেই সুযোগে টুক করে মাথা বার করে চেয়ে ফিচ করে হাসল। ততক্ষণে মেঘের কাপড় ঠিক শেষ। কুমির হয়ে টপ করে চাঁদটাকে গিলে ফেলল। পরমুহূর্তেই চাঁদ কুমিরের পেট ফেটে বাইরে। মেঘটা হঠাৎ ড্র্যাগনের মতো দাঁত বার করে তেড়ে গেল চাঁদের দিকে। চাঁদও টুপ করে ড্রাগনের লেজের পেছনে লোকাল। ফিচকে চাঁদের সাহসি হাসি। ওরা দুজনেই দেখছে এই মজার খেলা। সাহসী চাঁদ, রাগী মেঘের লুকোচুরি। তারাগুলো হাসিতে লুটোপুটি।

চাঁদের এই লুকোচুরিতে, লক্ষ করেনি উলটো দিকে নীলিমা নেই। ঘাড় ঘোরাতেই দেখল বাথরুম থেকে বেরচ্ছে। শাড়ি নয়, ফিনফিনে নীল সিল্কের নাইটি। নাইটি কোত্থেকে এল? হাতে হ্যান্ডব্যাগ ছাড়া তো সঙ্গে কিছু দেখেনি। অস্পষ্ট হলেও দেহের কাঙ্ক্ষিত অংশগুলো স্পষ্ট। বিছানায় দেহটাকে এলাতেই নিচের অংশ নাইটির আড়েল থেকে বেরিয়ে। অনেকটা লুকোচুরি খেলা চাঁদের মতো। উপারাংশের নাইটি সরে গিয়ে স্তনের অংশও সেই লুকোচুরি খেলায়। অপেক্ষা করছে জয়ন্তর জন্য।

বেশিক্ষণ করতে হয়নি। কিছুক্ষণেই ওর পাশে। দেহ নিয়ে খেলছে, আদর করছে। অনেকদিনের কামনা বাস্তবে। জয়ন্ত সাহসী চাঁদের মতো নীলিমায়। রাগী মেঘের রক্তিমা থেকে অনেক দূরে। এই খেলায় কখন বিবস্ত্র, কখন ক্লাইম্যাক্সে প্লাবন, বুঝতে পারেনি। নেশাটা মাথায় হলেও তৃপ্তিটা অকল্পনীয়।

ক্ষীণ হয়ে আসা নেশা গ্লেনমর‍্যাঙ্গির টপ আপে। অ্যাটাচি থেকে টাকা বার করে টেবিলে সাজিয়ে গুনছে। নীলিমার স্পর্শ এখনও লেগে দেহে। ওর সুবাস, সুভাষ গভীরে। কাঞ্চন সামনে। জাগতিক কামনার পূর্ণতা। যত খুশি ঘুরুক, যার সঙ্গে ঘুরুক অরুন্ধতী। নীলিমাই ইহলোকের তৃপ্তির সদ্গতি। চুলয় যাক অরুন্ধতী। বেঁচে থাক এমন শয়ে শয়ে নীলিমার মধ্যে তৃপ্তি।

হঠাৎ কলিং বেল। এত রাতে কে?

"কে?"

"সিবিআই"

দরজা খুলে দিল "জয়ন্ত চৌধুরী?"

"ইয়েস"

"ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। এই টাকাগুলো কোত্থেকে পেলেন?"

"এগুলো আমার"

“মাইনে কী ক্যাশে পান?” জয়ন্ত চুপ। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে সিবিআই অফিসারের দিকে “নোটগুলোয় স্পেশাল পাউডার দেওয়া। জল দিলেই লাল হয়ে যাবে। দেখবেন?” বলেই নোটে হুইস্কি ঢালতেই লাল। জয়ন্তর কাল। সব কাল। ইহ থেকে পর এতদিনের উত্তরণকে থাপ্পড় মারছে।

“চলুন আমাদের সঙ্গে”

“আমার স্ত্রীকে ফোন করতে পারি?”

“বাই অল মিন্স। গো অ্যাহেড”

মোবাইলে অরুন্ধতীকে “সিবিআই আমায় অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে”

চমকালেও এটা যে হওয়ার ছিল জানত। সে যখন মন্দারমণিপুরে তখন এমন ঘটবে ভাবেনি। পাশে টুবলু ঘুমিয়ে। ভাগ্যিস। অন্য ঘরে স্বর্ণালী-তুলি “এখন তো অনেক রাত। কাল সকালে ফেরত আসব”

ফোন কেটে ভাবল, রাত তো বহুক্ষণ। কালকের সকালে রাত ছাড়া দিন দেখতে পারছে না। যখন টুবলু জিজ্ঞেস করবে ‘বাবা কেন জেলে?’ কী জবাব দেবে? জয়ন্তর চেয়েও বেশি টুবলূর জন্য চিন্তা। কোন মুখে বলবে ‘তোর বাবা ঘুষখোর’। জাগতিক তৃপ্তির জন্য চেনা পরিচয় অচেনা। মানুষই তো জানে না সত্যের ঠিকানা। এখন আর চেনা-অচেনা নয়। স্বাধীন চিন্তা তো বন্ধনের ক্রীতদাস। এখন করছে পরিহাস। যা ভাবছে তাই তার পৃথিবী। বাকিটা বন্ধন চেতনার অবলুপ্তি।

সময় হয়েছে নিজেকে বোঝার, চেনার। টুবলুর ভবিষ্যৎ ভাবার। যতই দুনিয়াদার মায়ের মন। সন্তানের জন্য ভাবে সর্বক্ষণ।

এতদিনের আলো আঁধারি লুকোচুরির মধ্যে অরুন্ধতীও দেখতে চাইছে আগামীকে।

ঘুম থেকে জেগে।

দুনিয়াকে।

সেই সঙ্গে নিজেকেও।

সাতাশ

“হঠাৎ জয়ন্তদাকে অ্যারেস্ট? বুঝতে পারছি না” ফেরার পথে স্বর্ণালীর প্রশ্ন।

“আমিও বুঝতে পারছি না” বলল বটে, যদিও বেশ বুঝতে পারছে।

কাল রাতে ফোন পাওয়ার পর, মন্দারমণিপুর থেকে তড়িঘড়ি চেক আউট। স্বামী অ্যারেস্টেড। অরুন্ধতীকে ফিরতেই হবে। সাজানো দুনিয়া হঠাৎ ওলটপালট। ফ্যাশন আনলিমিটেডের চাকরির অশান্তির ওপর এই হ্যাপা। গোদের ওপর বিষফোড়া। সেদিনই বুঝেছিল জয়ন্ত যে পথে নেমেছে যে কোনও মুহূর্তে পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। হঠাৎ এই সময় খাঁড়াটা নামবে, ভাবেনি। মেয়েছেলের দালালি আর উচ্চপদস্থ গভর্নমেন্ট অফিসারের ঘুষ নেওয়ার মধ্যে বিস্তর তফাত। টুবলুকে কী জবাব দেবে? এর মধ্যে টুবলু থাকলে ওর মানসিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকারক। ওকে এই অ্যাটমসফিয়ার থেকে অন্য কোথাও সরাতে হবে। কোথায়? নিজেই যেখানে জানে না কোথায় দাঁড়িয়ে, কোন চাকরি করবে, ওকেই বা কী করে রিলোকেট করবে। চেনা বলয় থেকে শূন্যে।

পাশের সিটে স্বর্ণালী জিজ্ঞেস করল “কী করবি, ভাবলি?”

“গিয়ে ব্যাপারটা জানতে হবে। কোন চার্জে। তারপর উকিলের সঙ্গে দেখা। অসীমদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে চেনা উকিল যদি থাকে”

“নিশ্চয়ই আছে। এত বড় বিজনেস চালাচ্ছে, থাকবে না”

“বিজনেসের উকিল অন্য। যারা কর্পোরেট ল্য নিয়ে ডিল করে। এটা ক্রিমিন্যাল উকিল লাগবে”

“ও বলতে পারবে”

বাড়ির পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠেছিল স্বর্ণালী। মৃত্তিকার মৃত্যুতে অসীমের স্ক্যাম। দিদির প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি। দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। উইকেন্ডের জন্য পালাতে চাইছিল। বৃহস্পতিবার হঠাৎই অরুন্ধতীকে ফোন “হাঁপিয়ে উঠেছি। চল কোথাও উইকেন্ডে ঘুরে আসি”

অরুন্ধতীরও একই দশা “বেশ চল। কোথায়?”

“কোথাও একটা। কয়েক ঘণ্টা ড্রাইভ”

“মন্দারমণিপুর?”

“বেশ, ওখানেই চল। তুলিকেও নিয়ে যাই। কয়েকদিন ধরেই ঘ্যানঘ্যান করছে বেড়াতে যাবে”

“টুবলুকেও নিয়ে নিই”

তাই মন্দারমণিপুর। কিন্তু সে আর হল কই। কালকে লাঞ্চটাইমে পৌঁছে, আজ ব্রেকফাস্ট খেয়ে ব্যাক। প্ল্যান ছিল রবিবার লাঞ্চ খেয়ে ফিরবে। হোয়াট ম্যান প্রপজেস, গড ডিস্পসেস। স্বর্ণালীর সমস্যাটা মানসিক। অরুন্ধতীর রিয়্যালিস্টিক। রিয়্যালিস্টিক সমস্যা সর্বদাই মানসিকের ওপর প্রাধান্য পায়। এটাই জাগতিক নিয়ম। অথচ মানসিক ব্যাপ্তি চারিত্রিক কাঠামো তৈরি করে। যার থেকেই কর্মকাণ্ডের বিকাশ। কার্যক্ষেত্রে সেটাই গৌণ হয়ে যায় যতক্ষণ না ঝড় সব লন্ডভন্ড করে দেয়। ফিরে আসতে হয় মানসিক গঠনে। ঝড়ের মোকাবিলার জন্য তো বটেই। আগামীর দিশাও খুঁজতে। অরুন্ধতীর মানসিক সমস্যা হঠাৎই রিয়্যালিস্টিক ঝড়ে ওলটপালট।

জয়ন্তর সঙ্গে মানসিকতার মিল নেই। তবুও সংসার ভাঙতে চায়নি টুবলুর কথা ভেবে। ভাঙা সংসারে ছেলেমেয়েদের মানসিক বিস্তৃতি স্বভাবিক হয় না, যা হয় পূর্ণ সংসারে। পরে প্রভাব ফেলে জীবনের চলার পথে। ভাঙা ঘর শিশুদের মানসিক অপূর্ণতা প্রকাশ পায় ইন্টার-পারসোন্যাল রিলেশনশিপে, বৈবাহিক জীবন

থেকে চিন্তাধারার বিন্যাসে, ইন্টার‍্যাকশনে। টুবলুকে সেই ডামাডোলে ফেলতে চায়নি। এখন মনে হচ্ছে ভবিতব্য সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে। মানসিক সামঞ্জস্যে ক'টা বিয়ে হয়? সবই তো দুনিয়াদারির অঙ্কে। এর মধ্যে কিছু টেকে, কিছু ভাঙে। এই টেকা, ভাঙা-গড়ার মধ্যেই পার হয়ে যায় জীবন। শূন্যতাকে পূর্ণতায় সাজাতে। যখন সেই মেকি পূর্ণতা আবার শূন্যতায় ঠেকে, তখনই হুঁশ হয় মায়াময় কুহক থেকে বেরোবার।

অন্য জগতে।

অসীমের খোঁজে।

অবচেতন থেকে চেতানায় আরোহণ।

তুলি টুবলু পেছনের সিটে গল্প করে যাচ্ছে। তুলিই প্রধান বক্তা। মেয়েটা অনর্গল বকবক করে যেতে পারে। স্কুলের বাইরে বিশাল প্রাসাদে একেবারেই একা। কথা বলার লোক নেই। কাউকে পেলে কথা থামতে চায় না। স্বর্ণালী আরেকটা ছেলে চেয়েছিল। সে সময় চাকরি ছেড়ে অসীমের নতুন ব্যবসা। সেই ডামাডোলের সময় অসীমই চায়নি। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। পরে চ্যাটার্জি গ্রুপকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হয়ে ওঠেনি। ক্ষোভ থাকলেও, স্বর্ণালী প্রকাশ করেনি। যখন উত্তরণ হল, তখন সহবাসের আকাঙ্ক্ষা গৌণ। এখন মনে হচ্ছে জোর করাই শ্রেয় ছিল। তুলি তাহলে সর্বসময়ের সঙ্গী পেত।

বিবেকানন্দ সেতু পার হয়ে কলকাতায় ঢুকছে। গাড়ি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডে, রেস কোর্সের উলটো দিকে ট্র্যাফিক লাইটে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ প্রতীকের ফোন।

"কথা বলা যাবে?"

"বল। ড্রাইভ করছি। আপাতত গাড়ি ট্র্যাফিক লাইটে"

"সুব্রত সিংহ ইন্টারেস্টেড। তোমার নাম আগেই জানত। হি ইজ ইন্টারেস্টেড। মুম্বাইতে ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে"

"জানি না কবে পারব। কাল রাতে জয়ন্তকে সিবিআই অ্যারেস্ট করেছে। মন্দারমণিপুরে ছিলাম। ফিরছি। বাড়ি ফিরে খোঁজখবর নিয়ে ফোন করছি" ফোন কেটে দিল।

বাড়িতে ফ্রেস হয়ে প্রতীককে ফোন "স্বর্ণালীর সঙ্গে কাল মন্দারমণিপুর গেছিলাম। রাতে ফোন। জয়ন্তকে সিবিআই অ্যারেস্ট করেছে। বুঝতে পারছি না কী করব"

"সিবিআই অ্যারেস্ট নন-বেলেবল। দেখা করে চার্জেসগুলো জান। তারপর ভাবা যাবে"

"তাই করব। বুঝতেই পারছ, এদিকের ঝামেলা না মিটলে টুবলুকে ছেড়ে সুব্রত সিংহর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারছি না"

"বেশ। আমি ওকে বলে দেব, কাজে ফেঁসে আছ। কিছুদিন পর করবে। জয়ন্তর ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানিও। অবস্থা বুঝে ব্যাবস্থা"

প্রতীক ফোন কেটে দেওয়ার পর অরুন্ধতী বসে রইল। জয়ন্তর ফোনে রিং করতে, সুইচড অফ। বোধহয় কনফিস্কেট করেছে। নেট ঘেঁটে সিবিআইয়ের নম্বর খুঁজে ফোন।

"উই আর ইন্টারোগেটিং হিম ইন সল্ট লেক সিজিও কমপ্লেক্স"

"হোয়াট আর দ্য চার্জেস"

"কান্ট টেল ইউ অন ফোন"

ফোন কেটে দিল। টুবলুকে নিতাইয়ের মার কাছে রেখে সল্ট লেক। বেশ বুঝতে পারছে, জয়ন্তর হিল্লে না হওয়া পর্যন্ত নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এগবার ফুরসত নেই। হোয়েন ইট রেন্স, ইট পোরস। বর্ষার ঘনঘটায় বিধ্বস্ত। সব গোলমেলে। কারও সঙ্গে খোলামেলা কথা না বললে মনের ভাঁড় হাল্কা হবে না।

কার সঙ্গে? একমাত্র অসীমদা ছাড়া আর কে আছে?

আঠাস

“স্বর্ণালীর কাছে নিশ্চয়ই শুনেছ জয়ন্তকে সিবিআই অ্যারেস্ট করেছে। ফ্রি আছ? দেখা করব”

“বিকেলে বাড়ি চলে এস”

“না, না। বাড়িতে নয়। একা, আলিপুরে। কনফিডেন্সিয়াল”

“বেশ। সাড়ে ছ’টা। দেরি হলে ওয়েট করো”

ঠিক সাড়ে ছ’টায় অসীমের আলিপুরের ফ্ল্যাটে। সেদিনের মতো আজকে দেরিতে নয়। অসীমদা অ্যাজ বিফর টাইম। দরজা খুলে বলল “গোপালকে ছেড়ে দিয়েছি। উইকএন্ডে ও পৈতৃক বাড়ি সুভাষগ্রামে ফ্যামিলির সঙ্গে কাটায়। ফিরতে রাত হলে, অসুবিধা হবে। বাড়ি তো দূরে নয়। ড্রাইভ করে চলে যাব। অল অ্যালোন। এস”

সাধারণ টাঙাইল শাড়িতে অরুন্ধতী অনাড়ম্বর। চুলগুলো এলোমেলো মুখে লুটিয়ে। চেহারা দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না ভীষণ মানসিক চাপে। হওয়ারই কথা। স্বামী অ্যারেস্টেড। এমনিতেই বর্ণালীর সঙ্গে একটু বেশি দেখা করায় স্বর্ণালী বিরক্ত। যদি জানতে পারে অরুন্ধতীর সঙ্গে নিভৃতে আলিপুরের ফ্ল্যাটে, কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দেবে। হঠাৎই যেন অসীমের মহিলা সংস্পর্শে বিচলিত। সব যেন ওর চেনা অঙ্কের বাইরে। মহিলা সংস্পর্শ সামাজিক রীতির বাইরে হলেই চরিত্র বিশ্লেষণ। নিয়মের গণ্ডিতে ফেলার চেষ্টা। অবৈধ সম্পর্ক। পুরুষ-নারীর সামাজিক সম্পর্কের বাইরে একটাই সম্পর্ক। সংকীর্ণতা ছাড়া আর কী!

কলেজ জীবন থেকে আজ অবধি, অরুন্ধতীর আচরণে কখনো অশালীনতা দেখেনি। গোপনীয় কিছু থাকতেই পারে। যা সবার সামনে শেয়ার করা যায় না। জয়ন্তর সঙ্গে ওর সম্পর্কের কিছু ব্যাক্তিগত দিক থাকতেই পারে। তাতে অন্যায় কোথায়, জানে না। তবুও সামাজিক শিকলে বন্দি স্বর্ণালী তার চেতনায় চেনা ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করে। অচৈতন্যকে চেতনা দেয় কার সাধ্যি?

“যাওয়ার আগে অবশ্য ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। প্যারিস কাফেতে খাওয়ার অর্ডার দেওয়া আছে। সময়মত দিয়ে যাবে”

“তোমার এখানে তোয়ালে আছে?”

“আছে বৈকি। বাথরুমেই। কেন?”

“স্নান করে আসি। সোজা সিজিও কমপ্লেক্স থেকে এখানে। প্যাচপ্যাচ করছে”

অরুন্ধতী বাথরুমে। বিবস্ত্র সাওয়ারের তলায় মনে হল, অসীমদার সেক্স লাইফ কী নিল? স্বর্ণালীকে জিজ্ঞেস করা যায় না। জয়ন্তর সঙ্গে তো অনেকদিন আগেই ইতি। যেখানে মনের মিল নেই, সেখানে সেক্স যে কত কষ্টকর, একমাত্র প্রস্টিটিউট ছাড়া আর কে বোঝে? যতটুকে দেখা, অসীমদার সঙ্গে স্বর্ণালীর মানসিক তারতম্য স্পষ্ট। তাই মনে হল। প্রতীকের সঙ্গে মানসিক রিদম। দৈহিকটা ফুলফিলিং। দেহের চাহিদা না মিটলে কী মনের জানলা খোলা যায়? কী সব যা তা ভাবছে। জয়ন্ত কাস্টডিতে। চাকরি নিয়ে অখুশি। এই টালমাটালে সেক্স! ভাবলেও হাসি পায়। বাথরুম থেকে চুল মুছে বেরিয়ে দেখল অসীমদা জানলাগুলো খুলছে। বাইরের ফুরফুরে হওয়ার স্নিগ্ধতা।

“তোমার এসি ভালো লাগে না?”

“ছোটবেলায় কোথায় এসি? পুকুরের ফুরফুরে হাওয়া ছাড়া। প্রকৃতিকে পেতাম। এখন এই কংক্রিট জাঙ্গলে প্রকৃতি কোথায়? এই জানলার বাতাসটুকু ছাড়া?”

অরুন্ধতী জানলার পাশে। বাইরে গাঢ় অন্ধকারে দূরের বাড়িগুলোর লাইট জ্বলছে। পূর্ণিমার চাঁদ হারিয়েছে অমাবস্যার কোলে। বর্ণহীন অন্ধকারে। অসীমদা ঠিকই বলেছে। হওয়াটা ক্লান্ত দেহে মলমের মতো থেরাপিউটিক। অসীম ওর দিকে তাকিয়ে। আলোড়নটা আঁচ করা কঠিন নয়।

"ভডকা?"

"হুইস্কি। আছে?"

লাগুভ্যালিনে বরফ দিয়ে বলল "অন দ্য রক্স"

রিল্যাক্স না করলে অকপটে সব কথা খুলে বলতে পারবে না। দুজনেই ড্রিঙ্কস নিয়ে বারান্দার সোফায়।

"কী হল সিজিও কমপ্লেক্সে?"

"কী আর হবে? ওরা কাস্টডিতে রেখেছে। সোমবার কোর্টে তুলবে" দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুন্ধতী ধোঁয়া ছুড়ল হাওয়ায়।

"সিবিআই অ্যারেস্ট নন-বেলেবল। উকিলের সঙ্গে কথা বলা যেতেই পারে"

"কী হবে কথা বলে? ওরা তো ফলস চার্জে অ্যারেস্ট করেনি। জেনুইন। কথাগুলো স্বর্ণালীর সামনে ডিসকাস করতে চাই না বলেই এখানে"

অসীম চুপ। বাকিটা শোনার প্রতীক্ষায়। ঢকঢক করে বেশ কিছুটা সিঙ্গল মল্ট গিলে অরুন্ধতী উদাস তাকিয়ে অন্ধকারে। দূরের বাড়িগুলোর আলো অন্ধকারে মালা গাঁথছে। ক্ষীণ ভেসে আসছে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা। চাঁদ জ্বলজ্বলে আকাশ। আজ কী পূর্ণিমা? হবে হয়ত। ওর জীবনে পূর্ণিমা অমাবস্যা মিলেমিশে একাকার। কতক্ষণ চুপ করে ড্রিঙ্ক করছে, খেয়াল নেই।

"এটা তো হতই একদিন। আজ নয় কাল। টাকা রোজগারের নেশায় মেতে উঠেছিল। তুমি যা ব্যবসা করে পারো, গভর্নমেন্টের চাকরি করে কী বড়লোক হওয়া যায়? যত সিনিয়ার পজিশনে থাকুক"

"দরকার কী বেশি টাকার? মায়না তো খারাপ নয়। বড় কোয়াটার। হেসেখেলে চলে যায়"

"কে বোঝাবে? র‍্যাটরেসের কী শেষ আছে? চাকরিটা ছেড়ে দেব ভাবছিলাম। এই সময়েই এটা হওয়ার ছিল"

"চাকরি ছাড়বে কেন?"

"মেয়েছেলের দালালি আর পোষাচ্ছে না। র‍্যাটরেসেও ক্লান্ত। আই নিড রেস্পাইট। ভাবছি কোন দিকে এগব?"

"জয়ন্তকে ছাড়াবার বন্দোবস্ত করতে হবে তো?"

"ওরা কী প্রমাণ ছাড়া ধরেছে? প্রুভড হলে চাকরি যাবে। বছর চারেকের জেলও হতে পারে। অনেকদিন থেকেই অসহ্য। নেহাত টুবলুর কথা ভেবে সংসারটা টিকিয়ে রেখেছি। এখন মনে হচ্ছে আর টানা যাবে না। বিয়েটাই ভুল। বুঝলেও এতদিন টেনেছি। আর নয়। আসলে ইন্টেলেকচুয়াল হারমনি না থাকলে টানা মুশকিল"

"ও তো ভালো স্টুডেন্ট। আইএএস"

"হলেই বা আইএএস। প্রেসিডেন্সি আর গুরুদাস কলেজ এক হল? আমরা ইনহেরেন্টলি ইনটেলিজেন্ট। ওরা ঘষেমেজে আইএএস। মেন্টাল হারমনি না থাকলে ফিজিক্যাল রিলেশনও হয় না। টুবলু হওয়ার পর থেকেই নেই। কাজ নিয়ে না থাকলে, পাগল হয়ে যেতাম। এখন সেটাও অসহ্য। টুবলুকে কী বলব? তোর বাবা ঘুষখোর"

"এই চক্করে ঢুকল কেন? ব্যবসার জন্য মাঝেমধ্যে ঘুষ দিতে হয় বটে। খাওয়ার কোনও ব্যাপারই নেই। বিশেষ করে গভর্নমেন্ট অফিসার হলে তো নয়ই"

"কী করে বলি কেন ঢুকল। বোধহয় স্ট্যাটাস বাড়ানোর নেশায়"

"স্ট্যাটাস তো নিজের কাছে। টাকা আর পজিশন দিয়ে কী ওটা কেনা যায়?"

"কে বোঝাবে? বোঝাবার সময় পার হয়ে গেছে। আমাকেই পথ ঠিক করতে হবে"

"ডিভোর্স?"

"তার দরকার বোধহয় হবে না। মেন্টাল সেপারেশন তো টুবলু হওয়ার পরেই। বাকি ছিল ফিজিক্যাল। সিবিআই ওটাও করে দিয়েছে। কী করি বল তো?"

"কী উত্তর দেব। প্রত্যেকের চাওয়াটা নিজের মতো। সব কিছুকে কী নীতির মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায়? এটুকু বলতে পারি, ঐশ্বর্যের মধ্যে শান্তি নেই"

বেশ বুঝতে পারছে অরুন্ধতী কেন বারবার ফিরে আসছে ওর কাছে। অনুসন্ধিৎসু মন অচৈতন্য থেকে চেতনার বিস্তৃতিতে উত্তর খুঁজছে। সীমার মধ্যে অসীমকে দেখার চেষ্টায়। অসীমের কাছ থেকে সীমার ব্যাপ্তি। দোটানায় টালমাটাল। আগে বুঝতে পারেনি। এখন বুঝছে ওর না-পাওয়া অপূর্ণতা। অপূর্ণতাই জীবনের মানে খোঁজায়। অসীমে নয়, জীবনে।

"বিয়ে, সংসার কী খুবই জরুরি? বাচ্চা হয়ে গেছে। হ্যাভ সেক্স উইথ হু-সোএভার ইউ ক্যান রিলেট"

"কম্প্যানিয়নশিপ"

"সংসার চালানোর বাইরে স্বর্ণালীই বা কতটা কম্প্যানিয়নশিপ দিতে পারে?"

অসীমের মনে হল, অরুন্ধতী তো ভুল কিছু বলছে না। সত্যি তো। স্বর্ণালী কতটাই বা মেন্টাল কম্প্যানি দেয়। সংসার একটা রুটিন। তাই কী রুটিনের বাইরে সে বারবার বর্ণালীর কাছে ছোটে? মন আরও কিছু চায়। বৈবাহিক সীমাবদ্ধতার বাইরে। অসীমের মতো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট স্তর না হলেও, বাস্তবের চেতনার স্তরে। সেখানেই প্রেমের জন্ম।

"সংসার তো জীবনযাপনের অঙ্গ। ডিপেন্ডস অন ইওর মেন্টাল মেক আপ। ইফ দ্যাট বি সো, বিয়ে না করলেই পারতে"

"তখন কি ছাই এত বুঝতাম। এখন মনে হচ্ছে আরেকবার ভেবে করা উচিত ছিল। একটাই বোনাস। বিয়ে না করলে টুবলুকে পেতাম না"

"ওটাই বা কম কীসের? মাতৃত্ব না হলে নারী পূর্ণ হয় না। এখন তুমি পূর্ণ। অপশনস আছে। কোন দিকে এগবে, সেটা তোমার ব্যাপার। কি চাও? নাম, টাকা, ঐশ্বর্য, না শান্তি"

সারাসরি প্রশ্ন রেখেছে অসীম। জয়ন্ত যেমন গেছে, ফ্যাশন আনলিমিটেড নয় গেল। বদলে সুব্রত সিংহ। কাহিনিটা উনিশ-বিশ। ওপাশের অন্ধকার এত কালো লাগছে না। লাগুভ্যালিনের ওপর হাওয়ার রেশ ফিকে হলেও ধ্রুবতারাটাকে দেখতে পারছে। বুঝতে পারছে। এখন শুধু অনুভব করাই বাকি। আবর্তে অস্থির মনে স্থিরতা। না-চেনা নক্ষত্রে নতুন আলো। উঠে বসার ঘরের টেবিল থেকে রিফিল করে চুমুক দিয়ে বলল "প্রেম আর ভালোবাসার তফাত কোথায়?"

হঠাৎ! আশ্চর্য অসীম। কোথা থেকে কোথায়। নিজেও চুমুক দিয়ে বলল "যারা বোঝে তাদের কাছে"

"কী রকম?"

"ভালোবাসা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট। যখন জমাট বাঁধে কাউকে ঘিরে, সেটা প্রেম। ভক্তিহিমে নিরাকার জল জমে সাকার বরফ হয়ে যায়। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ভালোবাসা কামনাহিমে জমে প্রেম হয়ে যায়"

সব গুলিয়ে যাচ্ছে। যৌবনে উল্কার মতো ভালোবাসা, না-পাওয়ার শূন্যতা জমাট বেঁধে আবর্তে। ক্ষীণ ধ্রুবতারা মেঘের আড়ালে। জানেই না আদৌ কাউকে ভালবেসেছে কি না। জমাট ভালোবাসার স্বাদ তো বহুদূর। অসীমের প্রতি থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু প্রেমে রূপান্তরের সুযোগ ছিল না, স্বর্ণালীর উপস্থিতিতে। প্রতীক? সেটাও ধোঁয়াশা। শান্তিনিকেতনে দোলপূর্ণিমায় চাঁদের রোশনাইয়ে প্রতীকের স্মৃতি। নেশা চোখে অন্ধকারে তাকিয়ে। আলো খুঁজছে। মন খোয়াই পেরিয়ে দিগন্তে। ঝাপসা কুয়াশা। সন্ধেতে ঠান্ডা ভাব। হাল্কা কুয়াশার চাদর। দূরে মাদলের বিটস। সাঁওতাল পাড়ায়। সন্ধ্যারতির ঢং মিলেছে মাদলের শব্দে। অদ্ভুত মিল। তখন বোঝেনি। এখন বুঝছে। হয়ত দুটোই ওঁ-এর ব্যঞ্জনা।

“প্রেম থেকে ভাব, না ভাব থেকে প্রেম?”

“বুঝলাম না”

“কম বয়সে কথামৃত পড়েছিলাম। ভক্তি থেকে ভাব। ভাব থেকে মহাভাব। মহাভাব থেকে প্রেম। কোথা থেকে কী হয় কেউ বলতে পারে? সাবাই নিজের অনভুতিই বলে। তুমি বলছিলে ভালোবাসা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, প্রেম কংক্রিট। আমার মনে হয় প্রেমও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট। কেন যে ভালো লাগা জমাট বাঁধে তার কেমিস্ট্রি কী তোমার জানা? সাইন্স দিয়ে এক্সপ্লেন করতে গেলে প্রেমের সৌন্দর্যই মাটি”

“ফিলজফার হয়ে গেলে?”

“বিজ্ঞান যেখানে শেষ, সেখানেই তো ফিলজফির শুরু”

কিছু খুঁজছে। যা অসীম দিতে অপারগ। অন্ধকারে ধ্রুবতারা। অসীম ব্রিলিয়াণ্ট হতে পারে। অরুন্ধতী কিছু কম নয়। মনে হল, এখনও সে স্তরে পৌঁছয়নি যেখানে দাঁড়িয়ে অরুন্ধতীকে ধ্রুবতারা দেখাতে পারে। এই টালমাটাল আবর্তে আশ্রয় হতে পারে, দিশা নয়। মোবাইল বেজে উঠল। স্বর্ণালী।

“ফিরতে দেরি হবে?”

“একটু। রাতে খাব না। তুমি খেয়ে নাও”

ফোন কাটতেই অরুন্ধতী বলল “তোমায় দেরি করিয়ে দিচ্ছি”

“আজ শনিবার। কাল অফ”

“ভাবছিলাম স্ক্র্যাচ থেকে উঠেছ। পথ বাতালাতে পারবে”

“ওটা ভাগ্য। আমার বিশেষ কিছু করার ছিল না। সময় মতো ফিট করা ছাড়া। সেটাও বলতে পারো ভাগ্য”

“শুধুই ভাগ্য? তোমার কিছু ছিল না?”

“হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে হয়, না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। শুধু তেলটা সময় মতো মেখেছি”

“গুলিয়ে দিলে। নেশাটা ধরেছে”

কলিং বেলের শব্দে বুঝল প্যারিস কাফে থেকে খাবার এসেছে। পেমেন্ট করে কিচেনে রাখতে অরুন্ধতী বলল “রেখে দাও। পরে বেড়ে দেব”

“বৌদ্ধধর্মের বেসিক প্রিন্সিপ্যাল। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। মানে সাবজেক্টটা আগে বোঝ। তাকে বিস্তার করো। তারপর প্রচার, মানে মার্কেটিং। এই অঙ্কটাই জানি। সাবজেক্ট শেখার পর, ব্যবসার এবিসিডি শিখি। শেষে মার্কেটিং। ইন ফ্যাক্ট এখনও তাই করছি। আমার জ্ঞান খুবই কম। হাভাতের ঘর থেকে এসছি। ধর্ম, দর্শন শেখার সময় কোথায়?”

“সবই দুনিয়াদারির এপিঠ-ওপিঠ। শান্তি কী দুনিয়াদারির মধ্যে? যদি তাই হয় আমি এখানে কেন?”

উত্তরটা অসীমের অজানা। যতই জাগতিক বলয়ে ঝিঁঝিপোকার ডাক শোনার চেষ্টা করুক। নিজের সংকীর্ণতা বুঝতে পারছে। নিশ্চয়ই কোথাও শান্তি আছে। অসীমের জানা নেই। তাই বোধহয় বর্ণালীর কাছে বারেবারে ফিরে যাওয়া। ছাড়তে পারবে না। অথচ শুনতে চাইছে মহাজাগতিকের ভাষা। ভাষাটা কোনও ভাসমান অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নয়। অসীম নামটা জাগতিক হলেও, শব্দটা ধোঁয়াশা মহাজাগতিক হতে পারে না। যখন জগতেই ওর সৃষ্টি। যা জানি, তাই সীমা। যা জানি না, তাই অসীম। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। জাগতিক বলয়ের কোনও মেরুতে নিশ্চয়ই তার অবস্থান।

কোন মেরু?

অসীমের পক্ষে যতটা শক্ত, এখন ঝাড়া হাত-পা অরুন্ধতীর পক্ষে অতটা নাও হতে পারে। বুঝতে পারছে, বন্ধনই চেতনার ক্রীতদাস।

ধ্রুবতারার আভাস অরুন্ধতী পেয়েছে। গতিপথ অজানা। এখন সেই পথটাই খোঁজা। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। কথাটা বারবার বললেও হজম করা সহজ নয়। জয়ন্তর অ্যারেস্ট তাকে মুক্তি দিয়েছে। ফ্যাশন আনলিমিটেডের পূর্ণেন্দু সেন ও মেয়েরা সূত্র। জয়ন্ত পাথেয়। খালি মোহনাটাই জানা বাকি।

"অনেক রাত হল। খাবার বাড়ছি" অরুন্ধতী উঠে কিচেনে।

উনত্রিশ

অরুন্ধতী তার দৃষ্টিভঙ্গির স্থূলতা আরও প্রকট করে দিয়েছে। যতই সন্ধেতে বারান্দায় বসে ঝিঁঝির আওয়াজ শোনার চেষ্টা করুক। শব্দের উৎস জানলেও গূঢ়তা বোঝার অক্ষমতায় বিচলিত। অশান্তির মধ্যে সান্ত্বনার মলম না হয়ে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছে আঁধারের ধোঁয়াশায় প্রবেশ করতে হলে অন্ধকারের গভীরতা আবশ্যক। সে প্রবেশদ্বার অজানা। দরজাই যদি না চিনল, চাবিই বা খুঁজবে কোথায়, খুলবেই বা কী করে।

মনীষীদের টুকরো জ্ঞানের মধ্যে নেই। সীমা অসীমকে সুস্পষ্ট বলিরেখা দিয়ে বিভক্ত করে গেছে পথটা ধোঁয়াশা রেখে। সত্যিই কী ধোঁয়াশা? যদি তাই হত, মানুষের মন বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় তার সন্ধান করত না। দর্শন থেকে ধর্ম। বর্মে ঢাকা মর্ম। চেতনা অবগুণ্ঠনে। যেখানে অবগুণ্ঠন খোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে জগাখিচুড়ি সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কখনও ধর্মের খোলস এঁটে, কখনও দর্শনের মুখোশ ঘেঁটে। যতক্ষণ কনফিউশন, ততক্ষণ ডেলিউশন। মিটলেই সলিউশন। সলিউশনটা পৃথিবীর বাইরে, কোনও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরাচরের আঁধার নয়। জাগতিক বলয়েই তার দীপ্তি। আনতে পারে বাঁচার তৃপ্তি। সেখানেই ধোঁয়াশা। অসম্পূর্ণতা। আদ্যিকাল থেকে আজ অবধি, ধোঁয়াশার কুয়াশা ছড়িয়ে কখনও ধর্মের ব্যঞ্জনা, কখনও দর্শনের রমরমা। আসলে অজ্ঞানের দামামা।

তাই বর্ণালীর কাছে ফেরা। দরজা খুলে বলল “এস অসীমদা। ফোন করলে না?”

“সন্ধেতে তো বাড়িতেই। ফোন করে কী হবে?”

হাউজকোটে গিট বেঁধে বলল “বস। মুখটা ধুয়ে আসি। চা খাবে?”

“কম চিনি”

“মনে আছে”

চা নিয়ে যখন ফিরল, হাউজকোট ছেড়ে শাড়িতে। অ্যাশ টাঙাইল। কোনওকালেই প্রসাধন লাগায় না। আজ ঘরে তো নয়ই। পিএল-এর নীল আলোয় মুখটা শ্যামলা। তবুও কোথায় লালিত্য। স্বর্ণালীর মধ্যে সাবেকিয়ানা থাকলেও, বর্ণালীর লালিত্য নেই। প্রসাধনে ঢেকে নষ্ট করতে চায় না।

বসে চুমুক দিয়ে, অসীম বলল “তুমি তো রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে চর্চা কর। আমার নামের মানে কী?”

হেসে বলল “তোমার নাম। তোমারই তো ভালো জানার কথা”

“মানে জানলেও বুঝি না”

“কবিগুরুও বুঝেছিলেন কি না সন্দেহ। অনেক গানই তো লিখেছেন। অত সহজ নয় অসীমদা। জীবন দিয়ে বুঝতে হয়। তোমার মতো আমার পাণ্ডিত্য নেই। জ্ঞান খুবই কম। যেটুকু বুঝেছি একান্তই নিজের চেতনায়”

“কী বুঝেছ?”

“সবার থেকে একটু আলাদা। যা জানি তাই সীমা। যা জানি না তাই অসীম। ব্যাপারটা অত সাদামাটা নয়। সীমা মানে পৃথিবীর জাগতিক যা কিছু। আর অসীম মানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অজানা দিক, এ তো অজ্ঞানের আরেক ব্যাখ্যা। মরার পর কোথায় যাব, জানি না। বিজিত কোথায়, তুমি বলতে পার?”

“স্বর্গে”

“স্বর্গ-নরক এসব তো তোমার ডেফিনিশন। স্বর্গ দেখেছ? নরক চেন? না-জানাকে কতগুলো গালভরা নাম দিয়ে দিলে। মোদ্দা কথা, যা জান না, তাই স্বর্গ থেকে পাতাল। যা জান তাই মর্ত্য। যখন জেগে আছ

সবকিছু দেখতে, বুঝতে, চিনতে পারছ। ঘুমিয়ে থাকলে সেগুলো অজানা। তার মানে কী নেই? সব আগের মতোই। খালি চেতনা ছাড়া। স্বর্গ, ব্রহ্মাণ্ড, অসীম, অনন্ত বুঝি না। শুধু জীবনই বুঝি। এখানেই চেতন। এখানেই অবচেতন। দেখাটাই বাকি”

অসীমের গুলিয়ে গেল। বর্ণালী ঠিক কী বোঝাতে চাইছে বুঝতে পারছে না। এতদিন ধরে তো আকাশের ভিড়ে নক্ষত্র খোঁজার চেষ্টা করেছে। নাম না-জানা নক্ষত্র। তারাদের মধ্যে। ধ্রুবতারাকেও। আকাশের ওই নীল অসীমে তবে এতকাল ধরে কী খুঁজেছে? না-জানা সৌরমণ্ডল? যেখানে জীবনটাই এই সৌরমণ্ডলে সীমাবদ্ধ?

“জীবনের মধ্যেই অসীমকে খোঁজার কথা বলছ?”

“আর কোথায় খুঁজবে? স্বপ্নে? কল্পনায়? পরলৌকিক আত্মার ব্যাপার বুঝি না। কেউ প্রমাণ করতে পেরেছে কি না জানি না। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেট করতেন। মানে খোঁজার চেষ্টা। পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাই সীমা অসীমকে দুই কম্পার্টমেন্টে ফেলে নিশ্চিন্তে অজস্র জ্ঞান নিয়ে কবিতা লিখে গেছেন”

“আহলে কী অসীম বলে কিছু নেই?”

“থাকতে পারে। আমাদের অজানা। বিজিত মারা যাওয়ার পর জ্যোতিষ নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। সেটাও কদ্দুর ঠিক জানি না। তবে অনেক অ্যাস্ট্রোনমি পড়তে হয়েছিল। এই যে এদেশে পরাশর কিংবা কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে চর্চা হয়, সেটাও ইনকমপ্লিট। এরা তো ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোকে গ্রহের মধ্যেই ফেলে না। শনিকে আমরা কুগ্রহ বলে জানি। শনি তো আউটার লিমিট অফ মরট্যালিটি। সব থেকে দূরের প্ল্যানেট। তার এনক্লোজারে বাকি প্ল্যানেট। তাহলে শনি কুগ্রহ হল কী করে? যখন সব প্ল্যানেটকে বেঁধে রেখেছে। শনি দুনিয়ার নিয়ামক। শনির ওপারে অসীম। যদি তুমি অ্যাস্ট্রলজিক্যালি মানে খোঁজার চেষ্টা কর। তাই বাইবেল তৈরি হয় স্যাটার্নলিয়া থেকে। কোর্টে যাও কালো গাউন পরে। ডিগ্রি নাও হেক্সাগোনাল ক্যাপ পরে। আড়ালে সর্বত্রই শনির বন্দনা”

“বাইবেল তৈরি স্যাটার্নলিয়া থেকে?”

“হ্যাঁ গো। রোম তখন ডামাডোলে। ওরা শনির পুজো করত। স্যাটার্নলিয়া ১৯ থেকে ২৬ ডিসেম্বর। তাই রিলিজিয়াস কনট্রোলের জন্য যিশুর সো কল্ড মৃত্যুর ১৮০ বছর পর লেখা হল, কাল্পনিক ধর্মগুরু খাঁড়া করে। জন্ম মিলিয়ে দেওয়া হল স্যাটার্নলিয়ার সঙ্গে। পলিটিক্যাল মুভ। ছাড় ওসব কথা। ওটা তো পড়া বিদ্যে। মরট্যালিটির বাইরে কী আছে জানি না। যেটুকু অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যাস্ট্রলজি পড়ে শিখেছি, শনি ইজ দ্য প্ল্যানেট অফ অর্ডার। এই অর্ডারই পৃথিবী চালাচ্ছে। আমি এটাই বুঝি। পরলৌকিক, অসীম, অনন্ত এসব বুঝি না”

“তাহলে কী শান্তির পথ ইহলোকে?”

“আলবাত” বর্ণালী উঠে বলল “মোমো করেছিলাম। বস। গরম করে আনছি”

অসীমের মনে হল অরুন্ধতী তো তার কাছে এই পথই খুঁজতে এসেছিল। কোনও বায়বিয় জ্ঞান নয়। উত্তর দিতে পারেনি। জানে না, তাই। দিশাটা আকাশের কোনও অজানা নক্ষত্র নয়। অচেনা ধ্রুবতারা নয়। দিশা এ দুনিয়ায়ই। জানে না বলেই এখানে ওখানে খোঁজা। তত্ত্ব, ধর্মের মধ্যে বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা। অজানাকে আরও গুলিয়ে দেওয়া ছাড়া বেশি কিছু করতে পারেনি। মাঝ সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ে ফেলে ফয়দা লোটা। এভাবেই নতুন ঢঙে, নতুন রূপে পুরনো খেলা বারবার। সারটা না বুঝে অন্ধকারে হাতড়ানো। আলোর পিপাসায়।

বর্ণালীকে পুজো-আচ্চা করতে দেখেনি। ধম্মকম্ম তো নয়ই। গুরু সন্ন্যাসী তো দূরের কথা। নিজের মতো করে যা বুঝেছে তাই বলল। ভুল কি ঠিক, জানে না। নিজের মতো করে উপলব্ধিই শান্তির বীজ। যা ও খুঁজে পেয়েছে। ওরা কেউ পায়নি। ও কী পেয়েছে? পেয়ে থাকলে কী?

“টম্যাটো সস না চিলি সস?” মোমো এগিয়ে বলল।

“টম্যাটো”

“কেমন হয়েছে?”

“ও মোমোকে হার মানিয়ে দেবে। পথের বদলে মোমো। এটাও বিভ্রান্তির চেষ্টা” কামড় দিয়ে অসীম হাসল।

“না, না, কোনও বিভ্রান্তি নয়। ভাবলাম খিদে পেয়েছে” সস ছাড়াই মোমোতে কামড় দিয়ে বলল “শান্তি তো চাওয়া পাওয়া হিসেবের বাইরে। যতক্ষণ চাওয়া, ততক্ষণ অশান্তি। ছাড়লেই শান্তি। বেশিরভাগ সময় তো একা একাই কাটাই। মানুষের সঙ্গে ইন্টার‍্যাকশন খুবই কম। এক সম্বিত, তোমরা আর কাজটুকু ছাড়া। চাওয়ার সঙ্গে দাসত্ব, হারানোর ভয়। ভয়কে জয় করাই শান্তির মূলমন্ত্র”

“সেটা কী করে সম্ভব?”

“চাওয়া ছেড়ে দিলে তো তুমিই রাজা। যার টাকা, নাম, প্রতিপত্তি, ক্ষমতার লোভ নেই, সে তো লিভিং বমসেল। কে তাকে বশে আনবে? সামাজিক ইন্টার‍্যাকশনে নিজের স্থিরতা নষ্ট হয়ে যায়। অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখার চেষ্টা, অনেকটা স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ার মতো। ভাঙতে কতক্ষণ? তার থেকে, নিজের অন্ধকারে ডুব দিলে আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। মানে আর কিছুই নয়, অজানা ফল্ট রেক্টিফাই করা। নিজেকে চেনা। নিজেকে কনট্রোল করা। সেটাই অজানা, অসীম, অনন্ত। নিজের মধ্যেই। আকাশের তারাদের মধ্যে নয়”

কত সহজেই না কথাগুলো বলে গেল। কোনও মন্ত্র নয়। কোনও গুরুগম্ভীর কথা নয়। সহজ, সরল সাদামাটা ভাবে। এভাবে তো ভাবেনি! তারাদের ভিড়ে, আকাশের নীড়ে বৃথাই খুঁজে বেরিয়েছে, যা একান্তই নিজের মধ্যে। এখন বুঝতে পারছে, নিজেকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার মধ্যেই সম্পূর্ণতা। নিজের অজানাকে দেখা, বোঝা, চেনা। ঘুমের অবচেতনকে চেতনায় আনাই সম্পূর্ণতা। ব্রহ্মাণ্ডের আনাচে-কানাচে কী নিজের অবচেতনকে খোঁজা যায়? যায় না। তাই অতৃপ্তি। অন্ধকারে হাতড়ানো। যখন আলোটা নিজের মধ্যেই। কোনও মহাজ্ঞানের আলো নয়। নিজের অন্ধকারকে উত্তরণ করে আলোয় ফেরা। আলো না জ্বালালেও আলোর দিশা। আলো তো নিজেকেই জ্বালাতে হয়। আঁধার দেখে। সেই পথের সন্ধান দিচ্ছে আলো আঁধারিতে। নিজের রোশনাইতে যাতে আলোকিত হয় শান্তির পথ।

অসীমের হঠাৎই নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হল। শূন্যে ঝুলছে। না পারছে অজানা অন্তরের অসীমকে ছুঁতে। না পারছে তপ্ত মাটিতে নামতে। ভাসমান অস্তিত্ব আশ্রয় খুঁজছে। কক্ষপথ থেকে বিচ্ছিন্ন চেনা না-চেনার দোলাচলে। এতদিন তো সীমার বলয়ে, স্বর্ণালীর ছত্রছায়ায়, কাজের ফাঁকের অবসরে, ঝিঁঝির ক্যাকোফনির মধ্যে, আকাশের তারাদের মাঝে তাকে খোঁজার চেষ্টা করছিল। আজ বর্ণালী বুঝিয়ে দিল আকাশের আঁধার নীলে নেই। আছে এখানেই, নিজের কাছেই। বাইরের প্রকৃতির মধ্যে খোঁজা যত সহজ, নিজের ভেতর দেখা ততই শক্ত। অন্ধের মতো হাত বুলিয়ে ছবিটাকে উপলব্ধি। যেখানে ছবিটাই অস্পষ্ট, উপলব্ধি তো অন্ধকারে হাতড়ানো। একা, নিঃসঙ্গ। চেতনার উন্মোচন তো সংঘবদ্ধ হয় না। একাকীই তাকে খুঁজতে হয় অন্ধকারে। গাঢ় আঁধারের আস্তিনে লুকিয়ে গভীর কোণে। চেনে না, জানে না। অথচ সবার মতো মুখোশ এঁটে জীবনের পথে। উত্তরীয়টাকে সরাবে? একমাত্র নিজে ছাড়া কারুর সেখানে পৌঁছনোর ক্ষমতা নেই। প্রবেশ তো নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। গোলকধাঁধার মধ্যে গন্তব্য সুগম নয়। সহজের পথে যে যাত্রা, বর্ণালীর কথায় তা দুর্গম, কঠিন। সহজ পথ তো সবাই নিতে পারে। দুর্গমে পাড়ি দিতে ক’জন পারে? বিশেষ করে নিজের দুর্গমে।

সেখানেই আলো। তাতেই মুক্তি, শান্তি। যেখানে আলো নেই তবু আলোর বন্যা, যেখানে গন্ধ নেই তবু সুগন্ধের ঝর্না, যেখানে কেউ নেই, তবু যেন কার অমৃতস্পর্শে দেহ মন আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে প্রতি পলে। যেখানে স্তম্ভিত জাগ্রত মহাবিশ্ব বরণ করে নেয় তার সত্তা আর আত্মাকে পরম স্নেহে। সেখানেই প্রকৃত আলোর দিশা।

বর্ণালীকে কী এত বছর সেই আঁধারেই আলো খুঁজেছে? জানে না। জানতে চেষ্টা করেনি। বুঝতে চেষ্টা করেনি। চিনতে তো নয়ই। নিউ ইয়র্কে ও বলেছিল ‘তোমরা তো সবসময় থাকবে না। একা হয়ে গেলাম।

সম্পূর্ণ একা। চিরকালের জন্য' সেই একাকী যাত্রা ওকে নিয়ে এসেছে আলো আঁধারের সঙ্গমে। চিনিয়েছে পথ। দেখিয়েছে দিশা। অন্ধকার থেকে আলোর বন্যায়।

ফোনে চমকে উঠল। স্বর্ণালী "কোথায়?"

"বর্ণালীর ওখানে"

"খাবে?"

"হ্যা। একটু পরেই আসছি"

ঝট করে ফোন কেটে দিল।

"ভীষণ অসহায় লাগছে। তুমি সহায় হবে?"

"কেউ তো কারও সহায় হতে পারে না। নিজের সহায় নিজেকেই খুঁজতে হয়"

বেশ বুঝতে পারছে, আসক্তি দানা বাঁধছে। বুঝতেই, অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিল। মিড লাইফ ক্রাইসিস ছাড়াও অসীমদা অচৈতন্য থেকে চেতনার পথে পা বাড়িয়েছে, তা তো একান্তই ব্যক্তিগত। কার কীভাবে চেতনা আসে, কে জানে? কারুর ভোগে, কারুর ত্যাগে, কারও অতিরিক্ত শূন্যতায়। কারুর বা পূর্ণতায়। কেউ মন্দির-মসজিদ-গির্জায় ছোটে। কেই তীর্থ থেকে সাধুবাবাদের চরণে। এমনও তো হতে পারে হুইস্কির নেশায় বুঁদ তাকে পাওয়া। বর্ণালীর কী ক্ষমতা চেনাবে অসীমদাকে অন্তরের পথ? এই দোটানায় তার প্রতি আসক্তি বাড়লেই পারবারিক প্রবলেম। সে কাউকে দিশা দেখাতে গিয়ে ট্রবলে জড়াতে চায় না। সম্পর্ক মানেই বন্ধন। না থাকলেই মুক্তি। কোন পাগল মুক্তি থেকে বন্ধনের দিকে হাঁটে?

ডিনারের আগেই অসীম বাড়িতে। তুলি আগেই খেয়ে শুয়ে পড়েছে। চিকেন স্টু বেড়ে বলল "আজকাল ঘনঘন দিদির ওখানে যাচ্ছ। ব্যাপারটা কী?"

অসীম উত্তর দিল না। নিঃশব্দে স্টু রুটি খেয়ে যাচ্ছে। ভাত কদাচিৎ। ক্যালরি কন্ট্রোল। উত্তর না পেয়ে স্বর্ণালই আবার বলল "হঠাৎ কী মধু পেলে? মৃত্তিকা গেছে, এখন দিদি। মৃত্তিকাদির ব্যাপারে বাধা দিইনি। শেষে পাবলিক স্ক্যাম। এখন আবার কোন স্ক্যামে জড়াতে চাইছ?"

স্টু থেকে মুখ তুলে বলল "আগে তো তোমার সন্দেহ বাতিক ছিল না। হঠাৎ?"

"আগে তো মেয়েদের সঙ্গে এত দহরম মহরম করতে দেখিনি। যত বয়স বাড়ছে, ভীমরতিও। মিড-লাইফ ক্রাইসিসের কথা শুনেছি। এখন দেখছি"

কী করে বোঝাবে বর্ণালীর প্রতি আকর্ষণ, দৈহিক নয়, মানসিক। যার পরিধি সামাজিক বলয়ে সীমাবদ্ধ, চিন্তাধারাও জাগতিক নিয়মে। বর্ণালীর মধ্যে তো নিজের অজানাকে খুঁজছে। রক্তমাংসের মানুষটাকে নয়।

"মিড-লাইফ ক্রাইসিস অনেক রকমের। কদ্দুর জান? তোমার চিন্তা কেবলই পুরুষ-মহিলা সম্পর্কে। কোথায় নামাচ্ছ নিজেকে?"

"আমি নামাচ্ছি! না, তুমি। বাবু সারা সন্ধে টইটই করে মেয়েছেলেবাজি করে বাড়ি ফিরলেন। পড়ে শুধু অসহায় স্ত্রী অভিসারের পর বাবুর খিদমত করতে" ব্যঙ্গে কোনও জড়তা নেই।

"ছিঃ। কী সব যা তা বলছ? তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

"আমার হয়নি, তোমার। যা বলছি সেটাই ঠিক। শুনলে যে কেউ বলবে"

ভাগ্যিস অরুন্ধতীর সঙ্গে আলিপুরের ফ্ল্যাটের কথা জানে না। তাহলে তো কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিত। এটাও যে সে দিকেই এগোচ্ছে, আঁচ করছে। কুরুক্ষেত্র না হলেও ইন্ডোপাক ওয়ার। লোকালাইজড। বাইরের যুদ্ধের কথা ফলাও করে প্রচার হয়। পারিবারিক কলহ তার থেকে কম নয়। প্রাচারিত যুদ্ধের চেয়ে অনেক গুরুতর, বিধ্বংসী। ওখানে শয়ে শয়ে লোক মরছে। এখানে লাখো লাখো ঘর ভাঙছে। আগেও ছিল। এখনও আছে। নারী স্বাধীনতার উত্তরীয়তে আরও বীভৎস, ভয়ঙ্কর। আগে ঘর টিকিয়ে রাখার বাসনা ছিল। এখন

ভেঙে মুক্তি-স্বাধীনতার মায়াস্বপ্ন। দিশাহারা স্বাধীনতার ললিপপ। একবারও ভাবে না আত্মজের কথা। প্রজন্মের ওপর মানসিক প্রভাব। যার প্রতিফলন বয়স হলে সম্পর্কের অস্থিতিতে।

“তোমার যে কেউ মানে তো ক্লাবের গুটি কয়েক দিশাহীন সোসালাইট। তারা ওর বাইরে কী বোঝে? ওর মধ্যেই ওরা মজে” বিরক্ত স্বর্ণালীর অযাচিত সন্দেহে “সেও তো ব্রিটিশের কাছে ধার করা। যারা ব্যবসা বুঝলেও জীবনের মানে খুব বুঝত, মনে হয় না। সাহেবরা শিখিয়ে গেছে চিন্তা করো না। ইট ড্রিংক অ্যান্ড বি মেরি, ফর টুমরো উই ডাই। এটাই অচৈতন্যের পিলার। কেন? ভাবলে যদি বুর্জয়া ক্লাস তৈরি হয়! রাজত্ব, রাজস্বে, টান। ওখানে বন্ধু খুঁজছ? সব ধান্দায়। নয়ত পাস্টটাইম। সাহেবদের তৈরি প্ল্যাটফর্মে এর থেকে কী শিখবে? এখানেই তোমাদের পূর্ণতার স্বপ্ন। আসলে শূন্যতা। ওরা কী বলছে তা নিয়ে আমরা চলব?”

“তুমি নয় চ্যাটার্জি গ্রুপের হরিপুরি। বুঝলেও সত্যি কেউ বলতে পারবে না। আমি তোমার স্ত্রী। বলার অধিকার আমার আছে। আমাকে ওদের সঙ্গেই কাটাতে হয়। তোমার সম্বন্ধে কানাঘুষো আমার কাছেই আসে। কোনও মঙ্গলগ্রহের জীব নই। আমি এখানের। এই সোসাইটির”

বলতে পারল না, এই সোসাইটিতে কে বসিয়েছে? দুঃখ দিতে চায় না ওকে। বউকে অসম্মান করার কথা ভাবতে পারে না। অসীমকে চুপ থাকতে দেখে, তেলেবেগুনে স্বর্ণালী “ওদের কথা ছেড়ে দাও। দিদির সঙ্গে এত ফষ্টিনষ্টি কীসের?”

“তুমি বুঝবে না”

“বুঝব না, না বলবে না। অনেক হয়েছে। মৃত্তিকাদি নিয়ে জল অনেক ঘোলা। আবার রিপিটেশন দেখতে চাই না”

“দেখতে হবে না”

“উনি কোন জ্যোতিষী এলেন! আগে থেকেই সব জানেন। মানে এবার লুকিয়ে চুরিয়ে...”

“লোকানোর থাকলে তোমাকে বলতাম না”

“লোকাবে কী করে? দিদি তো আর পর নয়। দিদি, সম্বিতের কাছ থেকে জেনেই যেতাম। অনেক হয়েছে। এবার থামো, না হলে...”

“কী করবে? গলা কেটে দেবে? বেশ কাটো”

মনে পড়ে না দশ বছরের বিবাহিত জীবনে এত ঝগড়া, এত অভিযোগ শুনেছে কি না। স্বর্ণালি জেলাসিতে পাগল। এখন ওকে বোঝানোর চেষ্টা আগুনে ঘি ঢালা। অসীম উঠে পড়ল। কথা বাড়াতে চায় না। বাড়ালে আরও কদর্য হবে।

অসীমকে উঠতে দেখে, স্বর্ণালী খেপে গেল “সত্যির সামনে এসে পালাচ্ছ? বেশ যাও। এখন আমার যা করার, আমিই করব। তুলির কথা ভেবে আমাকেই করতে হবে। তোমাকে জিজ্ঞেস করাটাই বোকামি। আমাকে আর ভালো লাগছে না। তাই দিদির প্রেমে অন্ধ। বিয়ের আগেই বললে পারতে। বিয়ে করতাম না। দিদিকে ছেড়ে দিতাম। মেয়ে বড় হচ্ছে। বুড়ো বয়সে নষ্টামি”

এরপর ওখানে বসলে ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করবে। নিঃশব্দে নিজের ঘরে না গিয়ে, পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আজ তো আর ড্রিঙ্ক করা যাবে না। ট্রাইকা খেয়ে ঘুমোতে হবে।

পালাতে চাইছে। নিজের থেকে। সংসার থেকে। বর্তমানের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

বাস্তব থেকে স্বপ্নে।

অন্ধকার থেকে আলোতে।

তিরিশ

প্রতীকই পারে। যা অন্যরা পারে না। কী করে যে সুব্রত সিংহকে রাজি করাল, অরুন্ধতী জানে না। কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। জয়ন্ত এখনও সিবিআই হেফাজতে। কেস চলছে। যদিও ক্রিমিন্যাল লইয়ার ঠিক করেছে, হাতেনাতে প্রমাণ থাকতে আশা খুবই ক্ষীণ। এরই মধ্যে প্রতীক হঠাৎ কলকাতায়।

"সকালের ফ্লাইটে এসেছি। কাল ফেরত যাব। বিকেলে দেখা করতে পারি"

স্যাটারডে ক্লাবে বসে অরুন্ধতী বলল "কী করব বুঝতে পারছি না। এদিকে জয়ন্তর কেস ঝুলে। সময় শহর ছেড়ে মুম্বাই যাওয়া..."

"একবার দেখা করে এলে পারো"

"টুবলুকে একা রেখে ওভারনাইট থাকি কী করে?"

"ওভারনাইট থাকতে কে বলছে? টেক এ ফ্লাইট ইন দ্য মর্নিং। মিট হিম। কাম ব্যাক বাই ইভিনিং"

"বাট হি উড ওয়ান্ট এ কংক্রিট অ্যান্সার। উইথ দ্য প্রেজেন্ট স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স, ডোন্ট হ্যাভ এনি"

"হোয়াট আর দ্য চান্সেস অফ জয়ন্তজ রিলিজ?"

"ব্লিক। অলমোস্ট নিল। চাকরি তো যাবেই, ডিউজও আটকে থাকবে। অ্যাট দিস হআওয়ার আই নিড এ জব"

"মুম্বাইতে রিলোকেট করো। টুবলুকে ওখানের স্কুলে ভর্তি করতে হেল্প করতে পারি"

প্রতীকও চাইছিল অরুন্ধতী মুম্বাইতে শিফট করে। কম্প্যানি ছাড়াও সিকিউরিটি। বয়স তো বাড়ছে। হেলথ কখন বিগড়াবে, বলা যায়। ম্যালেরিয়ার পর থেকে ওর প্রতি সাবকন্সাস ডিপেন্ডেন্স। মেয়েরা ফোনে যোগাযোগ করতে পারে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কেউ ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকলে মেন্টাল সিকিউরিটি বেড়ে যায়। তাই অরুন্ধতী।

"দেখি..." অরুন্ধতী উদাসীন।

জানে প্রতীক সবরকম ভাবেই সাহায্য করবে। সুব্রত সিংহর চাকরি নিয়ে ভাবছে। সেই তো একই খেলা। পূর্ণেন্দু সেনের থেকে উনিশ-বিশ। এই খেলাটা আর টানছে না। স্বভাবিক কক্ষপথ থেকে বিচ্ছিন্ন। ঝুলছে। সীমা অসীমের মাঝখানে। এই পৃথিবীতেই। শান্তির খোঁজে। সেদিন অসীমদার সঙ্গে কথার পর বুঝতে পারছে, যে নতুন ধ্রুবতারার আলোর ঝিলিক সে দেখতে পেয়েছে, এতদিনের চিন্তায় ঝড় তুলেছে। রোজগার বাঁচার জন্য আপেক্ষিক। শান্তিটাই প্রধান। মুম্বাইয়ের ফাস্ট লাইফে সম্ভব নয়।

আলো আঁধারি ধোঁয়াশার এই জগৎটা হাতছানি দিচ্ছে। চাওয়ার তো শেষ নেই। এই চাওয়ার নেশায় জয়ন্ত হাজতে। এই র‍্যাটরেসের শেষ তো ফানুস। পোকার মতো আলোর পিপাসায়, ওদিকে ছোটা। পুরনো রীতির গতে। মরীচিকার পেছনে না-চেনা আশায়। আধমরা হয়ে ছটফট করা। না পারবে মৃত্যুকে বরণ করতে। না পারবে জীবনকে ধরতে। গ্ল্যামার-সর্বস্ব জীবনে মরেও বেঁচে থাকা। নগরজীবনের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। প্রকৃতি মানুষকে পোকার থেকে খুব বেশি কিছু দেয়নি। উত্তরণের তাগিদে মানুষ ছোটে আলোর দিকে ধাবমান পোকার নির্বুদ্ধিতায়। চেতনার অভাবে টের পায় না সীমা। অরুন্ধতী সেই সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইছে যা মুম্বাইয়ের ইঁদুরদৌড়ে অসম্ভব।

"মনে হচ্ছে শিওর নও চাকরিটা নেবে কি না"

"তুমি ঝাড়া হাত-পা। তোমার পক্ষে যতটা সহজ, আমার পক্ষে নয়"

"বাঙালিদের এটাই মুস্কিল। চেনা গণ্ডির বাইরে বেরতে চায় না। একবার বেরলে দেখবে অ্যাম্পেল অপারচুনিটিজ। নতুন নতুন দিক খুলে যাচ্ছে"

প্রতীক বুঝতে পারছে না অরুন্ধতী নতুন অ্যাভিনিউজ খুঁজছে না। রেট্রস্পেক্ট করছে। চাকরিটা যাতে হাতছাড়া না হয়, অনন্ত একবার সুব্রত সিংহর সঙ্গে দেখা করা উচিত। বিশেষ করে প্রতীক যখন সব ঠিক করেছে। ফর হিজ সেক।

"সুব্রত সিংহের সঙ্গে দেখা করি। পরে কবে জয়েন করব, ভাবা যাবে। টুবলুকে নয় দুদিন স্বর্ণালীর কাছে রেখে যাব। একদিনে এতটা ধকল নিতে পারব না। ক্যান আই স্টে অ্যাট ইওর প্লেস?"

"বাই অল মিন্স। মোস্ট ওয়েলকাম"

"দ্যাটস ফাইন" সব শুনে সুব্রত সিংহ তার মুম্বাইয়ের ভিলে পার্লের অফিসে অরুন্ধতীকে বলল "ইটজ ওয়ান ওপেন অফার। সর্ট ইওর প্রব্লেমস। ওয়ান্স ডান, গিভ মি এ টিঙ্কল।

"ইট মাইট বি এ ফিউ মান্থস বিফর আই ক্যান সর্ট এভ্রিথিং" অরুন্ধতী স্থির তাকিয়ে।

"নো প্রব্লেমস ফ্রম মাই সাইড"

প্রতীক কী দাওয়াই দিয়েছে জানে না। কিন্তু অব্যর্থ। প্রতীকের উপদেশে টুবলুকে স্বর্ণালীর কাছে রেখে মুম্বাইতে। ঠিকই বলেছে। অন্তত একবার দেখা করা উচিত। নিজের জন্য ছাড়াও প্রতীকের মুখ রাখতে। অল্টারনেটিভটা হাতছাড়া হয়ে গেলে জয়ন্তর চাকরির ডামাডোলে রোজগারের পথটাও বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক হবে না।

"আই অ্যাম অ্যাওয়ার অফ ইউ। হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু লিভ ফ্যাশন আনলিমিটেড? এনি প্রবলেম উইথ সেন?"

"নট অ্যাট অল। উই হ্যাভ ভেরি গুড টার্মস। অ্যাওয়ার অফ ইউ। ওয়ার্কিং আন্ডার ইউ ইন ইওর প্রেস্টিজিয়াস ফার্ম উড ব্রডেন মাই এক্সপারটিজ" ভালোই জানে কী করে সুব্রত সিংহকে তুষ্ট করতে হয়।

"মাই সেক্রেটারি হ্যাজ দ্য কন্ট্র্যাক্ট রেডি। পিক আপ ফ্রম হার ওন ওয়ে আউট। সেন্ড ইট সাইন্ড হোয়েন সেট। উই উইল প্রভাইড ইউ উইথ ফারনিসড অ্যাকমডেশন অ্যান্ড স্যাফর ড্রিভেন কার টু মেক ইওর রিলোকেটিং ইজি" পার্কসের ব্যাপারে দরাজ।

রিলোকেট মানে কলকাতার সার্কেল থাকবে না। গড়ে নিতে হবে নতুন সার্কেল। প্রতীক তো আছেই। অসুবিধা হবে না। ধরেই নিয়েছে জয়ন্তর কানফাইনমেণ্ট অনিবার্য। না হলে, এ প্ল্যানও ওলটপালট। নিজেই জানে না কোথায় দাঁড়িয়ে। সেটাই প্রবলেম। মানুষ অনিশ্চিতের মধ্যে নিশ্চিত হতে চায়। জানে না কোন বাঁকে অনিশ্চিত সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। বুঝতে পারছে বলেই এ নিয়ে আর বেশি ভাবে না।

সুব্রত সিংহর অফিস থেকে বেরিয়ে প্রতীককে ফোন "বিজি?"

"বিজি মনে করলেই বিজি। নইলে নয়। নিজের ব্যবসার এটাই সুবিধে। সময় মতো বিজি হওয়া যায়। সময় মতো ফ্রি করে নেওয়া যায়। হল?"

"কন্ট্র্যাক্ট সঙ্গে। সই করিনি"

"কাম ওভার ফর লাঞ্চ অ্যাট বম্বে জিমখানা। সি ইউ অ্যাট ওয়ান"

"বম্বে জিমখানা কোথায়?"

"মহাত্মা গান্ধি রোড। ফোর্টে"

শহরের এ প্রান্ত থেকে কেন্দ্রবিন্দুতে। প্রতীকের অফিস চার্চগেটের কাছে। ওর পক্ষে ঝট করে চলে যাওয়া বলেই বলা। অরুন্ধতীর হাতে প্রচুর সময়। উবের যখন ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে হয়ে ব্যান্ড্রা-ওয়ার্লি সি-লিঙ্কে, অরুন্ধতীর ঘুম পাচ্ছিল। সকালের ফ্লাইটে মুম্বাই। সোজা সুব্রতর অফিসে। রাতেও ভালো করে ঘুম হয়নি। আগে এমন হত না। আজকাল হচ্ছে। ঘুম আসতে চায় না। শেষে ট্রাইকা খেয়ে ঘুম। কিছুদিন আগে

পর্যন্ত লাইফস্টাইলের একটা গৎ ছিল। এখন নেই। আলো আঁধারি ধোঁয়াশায় গাতানুগতিক জীবন টালমাটাল। যতটা জয়ন্তর জন্যে, তার থেকেও বেশি শান্তির খোঁজে। আগে তো এমন করে শান্তির দিশা খোঁজেনি। পূর্ণেন্দু সেনের আদেশ কী চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছে? না মেয়েগুলোর নেশা ওর নেশা ভেঙে দিয়েছে? ছোটার নেশা। পাওয়ার নেশা। এগবার পাথেয়। তাকে আকৃষ্ট করছে না। জয়ন্তর টাকার নেশা যজ্ঞে ঘি ঢেলেছে। সব মিলে আলো আঁধারে নতুন চেতনা।

এ তো হওয়ারই ছিল। পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করে কাজ বাগানো নিত্যনৈমিত্তিক। কালেভদ্রে শোয়াটাই স্বাভাবিক পরিণতি। সেই স্বাভাবিকতা আজ অস্বাভাবিক কেন? মানসিক ব্যাপ্তি কী দৈনন্দিন কাজের ওপর ছায়াপাত করেছে। আঁধারের ছায়া। নতুন আলোর দিশায়। সুব্রতর চাকরিতে জৈবিক দিক দিয়ে হয়ত কিছুটা এগবে। মানসিক দিক দিয়ে সেই তিমিরে। খাওয়া-পরার জন্য যে কোনও চাকরি করলেই তো চলে। শান্তির জন্য অঢেল রোজগার, কেউকেটা হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং সব ছাড়তে পারলেই তাকে পাওয়া সম্ভব। যা পূর্ণেন্দু বা সুব্রতর চাকরিতে নেই।

ঝিমুনি এসে গেছিল। কাটল উবের যখন ম্যারিন লাইন্স ফ্লাইওভার পার হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বম্বে জিমখানা। প্রতীক রিসেপ্সনেই ছিল "তোমাদের ক্যালকাটা ক্লাবের ক্রস রেকগনিশন আছে। আগে আসনি?"

মাথা নাড়ল অরুন্ধতী। স্বর্ণালীর সঙ্গে উইকেন্ড ছুটির ক্লাব ফুর্তি থেকে প্রতীকের সঙ্গে মিড-উইক কাজের ফাঁকে লাঞ্চ। কলকাতা বা মুম্বাই।

ক্লাবই এখনও জীবন!

একত্রিশ

যা ভেবছিল, তাই হল। অসীমদার চেনা ব্যারিস্টার চেষ্টা করেও কেস জিততে পারল না। সিবিআই মার্ক করা টাকা নিয়ে হাতেনাতে ধরেছে। সেটাই যথেষ্ট প্রমাণ। বাড়ি রেড করে টাকা শুধু পায়নি, কাগজপত্রও। হিসেব বহির্ভূত সম্পত্তি। বিশেষ করে যেটা অরুন্ধতীকে দেবে বলে কিনেছিল। নীলোৎপল ঠিক সময় সটকে পড়লেও কিঙ্কর ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। ওই তো সিবিআইয়ের পাউডার দেওয়া নোট জয়ন্তর বাড়ি পৌঁছে দেয়। আগেই সব ঠিক করা। কিঙ্কর সিবিআইয়ের তুরুপের তাস।

একবার ভেবেছিল নীলিমাকে ফোন করে। করেই বা কী হবে? ওকে তো কিঙ্করই এমপ্লয় করেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করলে রোজগার যাবে। তাছাড়া ওর তথ্য ফাঁস করেই বা কী লাভ? সিবিআই যা করে, ওদের প্রোটকল মাফিক। ইনফর্মেশনের ওপর নয়। তথ্য প্রমাণ সামনে। আনুষঙ্গিক অপ্রয়োজনীয়।

নিয়ে যাওয়ার আগে কোর্টে জয়ন্ত ওর দিকে তাকিয়েছিল। করুণ মিনতি। কিছু করো। কী করবে? এগিয়ে এসে বলেছিল “টুবলু, তোমার কী হবে?”

“কিচ্ছু ভেব না। এখনও তো চাকরিটা আছে। ম্যানেজ করে নেব”

“তুমি কী আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?”

“ডিভোর্স দেওয়ার জন্যে তো বিয়ে বিয়ে করিনি। পাঁচ বছর তো। চালিয়ে নেব। বুড়ো হয়ে গেলেও তোমাকে ছাড়ার কোনও ইচ্ছে নেই”

“তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে?”

“ভুল বোঝাতেই সব থেকে বড় প্রায়শ্চিত্ত। আমি কে, তোমার বিচার করার?”

“বিচার তো হয়ে গেছে। তোমারটার অপেক্ষায়...”

“বিয়ে তো জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন, সেলিব্রেটেড হিয়ার অন আর্থ। খ্রিস্ট ধর্মেও একই কথা। ইন রিচনেস অর ইন হেলথ, ইন সিকনেস অর ইন পভার্টি... আনটিল ডেথ ডু আস অ্যাপার্ট। যারা ভগবানের বন্ধন ভাঙে, তারা সুখী হয় না। সুখ খুঁজছি না। শান্তিও পায় না। শান্তি খুঁজছি”

সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছে কি না, জানে না। বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। অজান্তেই সংসারের আত্মপ্রকাশ। এটাই ক্লাস। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ক্লাস নয়। চেতনাটাই। যা অবগুণ্ঠনে থাকে, আঁধারে। কখনো বা আত্মপ্রকাশ করে কিছু অসতর্ক মুহূর্তে। অবচেতনকে আলোকিত করে সর্বসমক্ষে।

“ভালো থেকো। টুবলুকে দেখে রেখ। আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত। ওকে তো মানুষ করতে হবে”

কিছু না বললেও অরুন্ধতী ভাবল কীসের মানুষ? আজ ফেরত গিয়ে তো টুবলুকে সত্যিটা বলতে হবে। না বললেও তো জানতে পারবে কালকের হেডলাইন্স থেকে। দুনিয়া নিয়ে অত ভাবে না। টুবলুকে নিয়ে ভাবে। কী মুখে দাঁড়িয়ে বলবে ‘তোর বাবা জেলে’। তবুও বলতেই হবে সত্যিটা। ভাবছে কী মুখে দাঁড়াবে ওর সামনে?

“ভালো থেক। প্রতি সপ্তাহে দেখতে আসব”

জেল হেফাজত নয়। চাকরিটাও গেছে। পেনসন পাবে কি না জানে না। এতদিনের স্বপ্ন, শিক্ষা, ভবিষ্যৎ, জেল ফেরত রাস্তায়। সে তো পাঁচ বছর পরের কথা। অরুন্ধতী ভাবছে এখনকার। ছলছলে চোখে মানুষটাকে পুলিস নিয়ে যেতে, মনে হল আগে কড়া হলে এ পরিণতি থেকে রক্ষা পেত। অবচেতনে চেয়েছিল কী? হয়ত নয়। জয়ন্তর সঙ্গে এক ছাদের তালায় বাস করা ছাড়া টুবলু হওয়ার পর থেকেই সবদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন।

সংস্কার যেমন ঘর ভাঙেনি, মনও গড়েনি। ঘরের সঙ্গে মনের কোনওদিনই বন্ধন নেই। তবুও সাংসারিক বলয়ে দুইকে এক সূত্রে বাঁধা প্রথা। যা হাড়েমাসে না ঢুকলেও সামাজিক শৃঙ্খল। মানসিক সীমার লক্ষ্মণরেখা।

গাড়ি স্টার্ট নিতেই ফোন "সেন স্যার ইজ অ্যারেস্টেড" ফ্যাশন আনলিমিটেডের একটি মেয়ে।

হল কী হঠাৎ? সবাই দুমদাম অ্যারেস্টেড, কেন? গ্রহের ফের? জ্যোতিষ না বিশ্বাস করলেও, সবই কাকতালীয় ভাবাটা মুস্কিল। ডামাডোলের মধ্যে আরও গণ্ডগোল। মনে পড়ল এলিনাই বলেছিল 'হোয়েন ইট হ্যাপেন্স, ইউ ডোন্ট নো হোয়াই ইট হ্যাপেন্স। ফাইভ ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন ইউ রিয়েলাইজ হোয়াই ইট হ্যাপেন্ড' সাহেবরা জ্যোতিষ নিয়ে মাতামাতি না করলেও, ডেস্টিনিতে বিশ্বাসী। পূর্ণেন্দু সেনের ডেস্টিনি জানে না। জয়ন্তরটা জেনেই বেরল। দু'জনের ভবিতব্যের সঙ্গে নিজেরটাও জড়িয়ে বুঝতে পারছে।

"হোয়ার ইজ হি?"

"প্রেজিউম ইন হিস টাটা সেন্টার অফিস"

কোথায় যাবে ভাবছিল। টাটা সেন্টারে গেলে জিজ্ঞাসাবাদের সামনে পড়তে পারে। নিজের ফ্যাশন আনলিমিটেডের অফিসেই যাওয়া শ্রেয়। ওখান থেকে খবরাখবর নিতে পারবে। থিয়েটার রোডে নিজের অফিস ঘরে ঢুকতেই সুচরিতা সহ আরও কয়েকটি মেয়ে ম্যাডামের ঘরে।

"খবরটা শুনলাম। টাটা সেন্টার অফিসের অনিমেষ ফোনে জানাল"

"সিবিআই?" সিগারেটে টান।

"তাইতো বলল"

এখানেও সিবিআই! জয়ন্তর ক্ষেত্রেও তাই। সিবিআই কী হঠাৎই তৎপর হয়ে উঠল?

"হোয়াই?"

"নো ক্লু"

বুঝতে পারছে, এ অফিসেও হানা দেবে। অ্যাকাউন্টস অফিসারকে ডেকে পাঠাল "আপ-টু-ডেট অ্যাকাউন্ট কী কম্পিউটারে এন্ট্রি করা আছে?"

"কাল পর্যন্ত। আজকেরটা করা হয়নি। দিনের শেষে করে বাড়ি যাই"

"সেন স্যার অ্যারেস্টেড, শুনেছেন নিশ্চয়ই" মাথা নাড়ল "এ অফিসেও রেড হতে পারে। তার আগে সব ঠিক করে নেওয়া দরকার। আন-অ্যাকাউন্টেড ক্যাশ থাকলে ইমিডিয়েটলি সরিয়ে ফেলুন। ইউ নেভার নো..."

অরুন্ধতী কী নিজেই জানে ফ্যাশন আনলিমিটেডের পরিণাম? যদি চার্জেস প্রমাণিত হয়, সেন স্যার জেলে গেলে, এ কোম্পানিও উঠে যেতে পারে। তখন একটাই অল্টারনেটিভ সুব্রত সিংহ। মানে মুম্বাই। ভবিতব্য কী মুম্বাইয়ের দিকে টানছে? সেখানেও সিকিউরিটি কোথায়? জয়ন্তর অনুপস্থিতিতে এখন চাই স্টেবল ইনকাম। বেশি না হলেও, গ্যারান্টিড জব সেফটি। এসব লাইনে অসম্ভব।

"কথা আছে। আর্জেন্ট" অসীমদাকে ফোন।

"বল"

"এখানে নয়। আলিপুরের ফ্ল্যাটে"

"এখন কয়েকদিন থাক। আই অ্যাম হ্যাভিং লট অফ প্রবলেমস অ্যাট হোম উইথ স্বর্ণালী। সব বলতে পারব না। পারসন্যাল। বুঝতেই পারছ। আমার অফিসে চলে এস"

আধ ঘণ্টায় অসীমের অফিসে। মেহগনির উড প্যানেলিং করা ঝাঁ চকচকে অফিস। বিশাল ঘর। পাশেই লাউঞ্জ। দরজার ওপারে কনফারেন্স রুম। সেক্রেটারিয়েট টেবল ছাড়ার আগে বলল "কনফিডেন্সিয়াল?" মাথা নাড়ল অরুন্ধতী। সেক্রেটারিকে ডিস্টার্ব না করার ইন্সট্রাকশন দিয়ে লাউঞ্জের সোফায়।

"জয়ন্ত গট ফাইভ ইয়ার্স। চাকরিটাও নিশ্চয়ই থাকবে না, যদিও কোর্ট কিছু বলেনি"

"শেখরের কাছে জানলাম"

“আমাদের ফ্যাশন আনলিমিটেডের মালিক অ্যারেস্টেড বাই সিবিআই। চার্জেস প্রুভড হলে আমাদের কোম্পানিও উঠতে কতক্ষণ? অ্যাট দিস আওয়ার এ স্টেবল ইনকাম ইজ ভাইট্যাল। শিওর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড”

কিছুক্ষণ চুপ। অসীম ভাবছে। বলল “তোমার এই শো-বিজ ওয়ার্ল্ডটা বড্ড ফিশি। ওখানের চেয়ে, ট্রাই টু ইউজ ইওর কোয়ালিফিকেশন ইন এ ডিফারেন্ট এরিয়া”

“হুইচ এরিয়া?”

“স্কুলে চাকরি”

“কে দেবে এই মন্দার বাজারে? যেখানে গ্রুপ ডি, ডোমের জন্য মাস্টার্স, পিএইচডি অ্যাপ্লাই করছে?”

“নো হার্ম ইন ট্রায়িং। কলকাতায় নাও পেতে পার। উইথ ইওর কোয়ালিফিকেশন, মফসসলে পেতে পারো”

“এনি সাজেশনস?”

“বাকুড়ার অমরকাননে একটা কনভেন্ট স্কুল আছে। শময়িতা কনভেন্ট স্কুল। রিনাউন্ড। বিভিন্ন শহর থেকে পড়তে আসে। রেসিডেন্সিয়াল গার্লস স্কুল। পেলে, কলকাতা ছাড়তে হবে। পারবে?”

“এমনিতেই কলকাতায় হাঁপিয়ে উঠেছি। শান্তির জন্য এমন সিরিন জায়গা উড বি আইডিয়্যাল। টুবলু?”

“ওটা যদ্দুর জানি গার্লস ওনলি স্কুল। চাকরি পেলে অ্যাকমডেশনও দেবে। ওখান থেকে দুর্গাপুর বেশি দূর নয়। সেন্ট জেভিয়ারস খুবই ভালো স্কুল। কমিউট করবে। স্কুল বাস আছে। চাকরি পেলে জানিও। অল ইন্ডিয়া জেসুইট স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডে আছি। বললে অ্যাডমিশন হয়ে যাবে। আগে তো নেট দেখে অ্যাপ্লাই কর। পরের ব্যাপার পরে”

অসীমদার অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হল, সামনে দুটো পথ। সুব্রত সিংহর ওখানে কনফার্মড চাকরি। মানে মুম্বাইতে রিলোকেশন। সেখানে প্রতীক সহায়। আরেকটা এই মফসসলের টিচারি। একটা গ্ল্যামার, উপরে ওঠার নেশা। একটা পিস। আগের দিন অসীমদার সঙ্গে তো শান্তি নিয়েই কথা হচ্ছিল। কোনটা বড়? সাকসেস না পিস? ইফ শি গেটস দ্য জব, দ্য বল ইজ ইন হার কোর্ট। শি হ্যাস টু চুজ। ডামাডোলে আরও ধোঁয়াশা। মুখে বলা এক, আর কাজে আরেক।

চলার পথে ঈশ্বর সময় সময় ক্রস রোডে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা নেয়। আজ বুঝি অরুন্ধতীর পরীক্ষার দিন।

বত্রিশ

"নিজের স্বামীকে খেয়েছিস। এখন আমারটাকেও খাচ্ছিস" দরজা খুলতেই, ঘরে ঢুকে স্বর্ণালীর রণমূর্তি।

বর্ণালী হতবাক। এই কী নিজের বোন, যাকে ছোটবেলা থেকে সব ছেড়ে সুখী করতে চেয়েছে? এ যে অচেনা স্বর্ণালী। এত বছরেও যাকে চেনেনি।

"কী হয়েছে?" অবাক বর্ণালী সংযত।

"কী আবার হবে? ন্যাকা। অ্যাজ ইফ কিছুই জানিস না"

"সত্যিই জানি না, তুই কী বলছিস"

জিনস-টপসে রাগে ফোঁসা দেহটা ধপাস করে সোফায় ফেলে বলল "বিজিতদা মারা যাওয়ার পর বলেছিলাম বিয়ে করতে। করলি না। তখন কি জানতাম পেটে পেটে এই। অসীমকে তোর বরাবরই ভালো লাগত। বিয়ের আগে বললেই পারতিস। আমি করতাম না। এত বছর পরে কেন?"

বুঝল স্বর্ণালী খেপে। মাথা গরম। আগে একটু জিরক। পরে কথা বলা যাবে।

"চা খাবি?" বর্ণালী শান্ত।

"আর আদিখ্যাতা করতে হবে না। চা খাবি! চা দিয়ে কি মনের জ্বালা মিটবে?"

কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বর্ণালী। রাগ ঠান্ডা হোক। পরে কথা বলা যাবে। বোনের জন্য খাবার করতে কিচেনে। দইবড়া, মিষ্টি, চা। স্বর্ণালী মিষ্টি ভালোবাসে। উত্তপ্ত কাউকে সে সময় কথা বললে, রাগ দ্বিগুণ, বাক বিতণ্ডা। কোনও ঝগড়াতে জড়াবার ইচ্ছে নেই। পরে ঠান্ডা হলে ব্যাপারটা জানা যাবে। ইদানীং ও এ বাড়িতে আসেনি। অসীমদা একাই এসেছে। সমস্যায় জর্জরিত। সান্ত্বনার আশায়। আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা নেই। শুধুই মানসিক ভার লাঘব। তাঁর জন্যেই কী স্বর্ণালীর রাগ? দুঃখের দিনে সম্বল খুঁজতেই পারে। সেটা যে সব সময় স্ত্রী হবে এমন তো নয়। তার মানেই কোনও সম্পর্ক নয়। সেই মুহূর্তে যে সব থেকে বেশি সান্ত্বনা দিতে পারবে, তার কাছেই মানুষ ছোটে।

নানা নামে ভূষিত, দুঃখের সাথির কোনও সামাজিক পরিচয় নেই। পরিচয় না থেকেও কাছের। মনের সহচর। একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছে। ঈশ্বর অনেক ক্রিটিক্যাল সময় এমন কাউকে পাঠিয়ে দেন যার সেখানে থাকার কথাই ছিল না। তারা যেন ওই সাহায্য করতেই আসে। পরে আবার কোথায় হারিয়ে যায়। বর্ণালীর মনে হয় এরা মানুষের বেশে ঈশ্বরের দূত।

আকাশের ওই অসীম অনন্তের ঈশ্বরকে চেনে না। মূর্তি পুজোর মধ্যে ঈশ্বর আছে কি না জানে না। অন্ধ বিশ্বাসে ভর করে বোঝার চেষ্টাও করেনি। অবচেতনের ঈশ্বরকে মানুষ যে ভাবেই সাজাতে চাক না কেন, তা নিরাকার। সাকারে পরিণত করায় চেতনার অপূর্ণতা, নিরাকারের হদিস জানা নেই বলে তাকে রূপ দেওয়ার অর্থ চেতনের গভীরে পৌঁছনোর ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতাই মানুষকে বারবার প্ররোচিত করেছে সহজতম পথে ঈশ্বর লাভে। যেখানে নিরাকার ব্রহ্মের উপস্থাপনা বহু রূপে, বহু বর্ণে, বহু চেতনে ব্যাপ্ত, সেই অসীম আয়ত্তে আনতেই রূপকল্প আয়োজন। তা যদি কাউকে শান্তি দেয় তাতেই বা ক্ষতি কী? অবচেতন নিরাকারকে ঘরে বসেও পাওয়া যায়। আড়ম্বর যাগযজ্ঞের মধ্যে ঈশ্বর খোঁজা বৃথা, যদি ভেতর থেকে উপলব্ধি না আসে। আড়ম্বরহীন জীবনে নিজের গভীরেই খোঁজার চেষ্টা করেছে, পীঠস্থানে নয়। ধর্মস্থানের চূড়াগুলো দেখে মনে হয়েছে, স্রেফ পৌরুষের অহংকার। তাতে ধার্মিক বলয় সৃষ্টি হলেও, ঈশ্বর বহুদূর। ধর্মের গোঁড়ামির মধ্যে ঈশ্বর থাকার কথা নয়। আছে চেতনার উন্মোচনে। তাঁর জন্যে কঠিন আত্মবীক্ষণ প্রয়োজন।

বিজিতের মৃত্যুর পর একাকী খুঁজেছে নিজেকে। হারানোর অন্ধকারে, দুঃখের আঁধারে তাঁর মধ্যেই পেয়েছে আলোর ঠিকানা। নইলে কী এত বছর একা কাটিয়ে দিতে পারত? নিঃসঙ্গ দুনিয়ায় আলোর ঠিকানা খোঁজার জন্যেই একা থাকা। আজ তাকেই কাঠগড়ায় চড়িয়েছে নিজের বোন। ওকে বোঝাতে হবে। রেগে গিয়ে তক্ক করলে তো সুরহা হবে না।

খাবারগুলো টেবিলে মেলে বলল "আগে খেয়ে নে। পরে তোর সব কথা শুনব"

"বলার আর কী বাকি রাখলি? এখন তো তুই বলছিস, ও শুনছে"

"খেয়ে নে তো। বললাম না পরে কথা হবে"

মানসিক ব্যবধান ওদের দুজনের। দু'জন দু'মেরুতে। বিয়ের পরে বুঝলেও কখনো বলেনি। প্রেম করেই বিয়ে করেছে। মানিয়ে সংসার করছে। বোঝাটা নিজের কাছেই। হঠাৎ সেই ছন্দে চিড়। মৃত্তিকার মৃত্যু থেকে বর্ণালীর প্রোগ্রাম। সবই বোধহয় ক্ষীণ সুতোয় দাম্পত্য জীবনে ঘূর্ণি। আবার সব শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ ঘূর্ণি যেন চূর্ণ করতে চাইছে দাম্পত্য বন্ধন। ভাঙতে চাইছে এতদিনের সম্পর্ককে কল্পনায় ভর করে।

খাওয়ার পর পরিবেশ শান্ত হলে বর্ণালী বলল "তুই ভাবলি কী করে অসীমদার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক? মৃত্তিকাদি মারা যাওয়ার পর, ওর মনের অবস্থা বুঝেছিস?"

"বুঝব না কেন? ফলাও করে মিডিয়াতে স্ক্যাম। এই স্ক্যামে মন কেমন থাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না"

"স্ক্যামটাই দেখলি। মানুষটাকে দেখলি না?"

"সবাই স্ক্যাম নিয়েই কথা বলে। মানুষকে কে আর দেখে?"

"সবাই কী বলে জানার দরকার নেই। আমি তোদের মতো সোশ্যাল নই। সামাজিক দুনিয়ায় ঘুরি না। তুই তো স্ত্রী। তুই না বুঝলে আর কে বুঝবে?"

এই প্রথম স্বর্ণালীর মনে হল, সত্যিই কী সে অসীমকে বুঝতে চেয়েছে? স্ক্যামের মাতামাতিতে ভুলেই গেছিল, অসীমও মানুষ। তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার থাকতে পারে। তখন থেকেই ব্যবধান, দূরত্ব।

"তুই বুঝে ওকে সান্ত্বনা দিলে কী ও আমার কাছে আসত? সমাজকেই দেখলি। মানুষটাকে বোঝার চেষ্টা করলি না। বুঝলে হয়ত আজকে তোর কাছ থেকে এসব শুনতে হত না। তুই কী ভাবলি অসীমদা আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসছে? তোর কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বলিনি, কারণ এটা তোদের ব্যাপার। নাক গলাতে চাইনি। বুক ছুঁয়ে বল তো, তুই তখন কতটুকু সহায় হতে পেরেছিস। ভেতরের ব্যাপার জানি না। সাম্রাজ্যের রাজা কাতরাচ্ছে। সেই শশীভূষণ দে স্ট্রিট থেকে নিউ ইয়র্কে। বিজিত মারা যাওয়ার পর। এত বছরের সম্পর্ককে কী বুঝেও ফেলে দেব? তুই অবুঝ হতে পারিস, আমি নই। দুঃখেই আমার জীবন। তাই দুঃখটা বুঝি"

স্বর্ণালী চুপ। ভুলটা বুঝতে পারছে। নিজের কর্তব্য, অসম্পূর্ণতা দেখতে পারছে। দিদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বিয়ে সংসার এক, মানুষ চেনা আরেক। সামাজিক আচার দু'জনকে বেঁধে দিলেও, মানসিক বন্ধন তৈরি হতে বহুদিন লেগে যায়। অসীমকে বিবাহিত স্বামী হিসেবে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড করে, মানুষটাকে অস্বীকার করে গেছে। যখন মানুষের চেয়ে সমাজ বড় হয়ে যায়, তখন মানুষের মূল্য গৌণ হয়ে পড়ে। সেখানেই বিপত্তি, ভুল বোঝাবুঝি, সংঘর্ষ, স্খলন। অসীমের চ্যাটার্জি গ্রুপের প্রতিপত্তির মধ্যে ওর সামাজিক আধিপত্যের ফাঁকে, মানুষটাকেই ভুলে গেছে।

"অসীমদা মৃত্তিকাদির সঙ্গেও প্রেম করেনি। আমার সঙ্গেও নয়। মানুষের এমন অনেক দিক থাকে, সেখানে ঢুকতে না পারলে সম্পূর্ণ মানুষটাকে চেনা যায় না। হয়ত সেই অজানা দিকের সাথি মৃত্তিকাদি। আরেক অজানার সাথি আমি। পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায় সে যদি আমার কাছে ছুটে আসে, তাতে অন্যায় কোথায়? তোরা সব সম্পর্ককে একটা সামাজিক নাম দেওয়ার চেষ্টা করিস। মনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতার আশায় এ রকম হাজারও সম্পর্ক তৈরি হয়। তাকে সামাজিক নাম দেওয়া মূর্খতা"

এত কথা এক সঙ্গে আগে কখনো বলেনি বর্ণালী। স্বর্ণালীর মনে হল দিদি সব হারিয়েও তার থেকে কত এগিয়ে। আর সে সব পেয়েও নিঃস্ব। নিঃস্বতার জন্য করুণার আগে আবার সামাজিক তোপ "হঠাৎ ও ঘটা করে তোর ফাংশন করছে কেন?"

"বিজিতের মৃত্যুদিনে ও এসেছিল। আমি একা গান গাইছিলাম। হয়ত মনে হয়েছিল এটা অবলম্বন হতে পারে। সম্বিত দূরে চলে গেলে আমায় বাঁচিয়ে রাখবে। তাই"

এযাবৎ শুধু নিজের কথাই ভেবেছে। সময় হয়নি দিদির কথা ভাবার। ওর বর্তমান, ভবিষ্যৎ। অসীম ভাবতে পারে বলেই অসীম। সীমার লক্ষ্মণরেখায় অসীমকে খুঁজেছে। যেটুকু পেয়েছে সে তো জাগতিক অসীমকে। মানসিক অসীম থেকে বহুদূরে। দশ বছর বিয়ে হল। চেনা হল না ওকে। এবার বুঝি সেই চেনার সময়।

"আমায় ক্ষমা করে দে"

"ধ্যত। বোন তো দিদির কাছে ক্ষমা চায় না। দাবি করে। তোর দাবিই সব থেকে বড় পাওয়া। তোর কাছে শুধু একটাই চাওয়া। কোনওদিন যদি না থাকি সম্বিতকে তুলির মতো মানুষ করিস"

স্বর্ণালী চলে যাওয়ার পর একা অন্ধকারে বর্ণালী। আলো খুঁজছে। আলোর নিশানা দেখতেও পারছে। সেই পথেই হাঁটতে হবে। ও পথেই তৃপ্তি, মুক্তি, শান্তি। সাংসারিক বলয়ের বাইরে। নিজের মধ্যে।

বাইরের আকাশে তাকিয়ে। আকাশটা অদ্ভুত মায়াময় নরম আলোয় ভরা। আধফোটা কৃষ্ণচূড়ার মতো নরম, ছোট্ট দোয়েলছানা। উষ্ণ। ভোর আকাশে ওড়া বালিহাঁস, দূরে কোথায় হারানো মন-কেমন-করা আলো। ছড়িয়ে থাকা তারাগুলো আনন্দে হাসছে। কাছে দূরে যেখানেই থাক, সব তারাই অদৃশ্য বন্ধনে হাত ধরাধরি করে চাঁদের চারপাশে নাচছে। বিশাল পূর্ণিমার চাঁদ যেন যমুনা পুলিনের তীরে বাঁশি হাতে কানাই। তারাগুলো ব্রজের সুন্দরী গোপবালার দল। শুনতে পাচ্ছে আশ্চর্য সুরে মহাজাগতিক সঙ্গীতঃ

'আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ
ঝুলত ঝুলনে শ্যামরচন্দ ...'

শরীরের রোম শিহরিত। সমগ্র সত্তা অনুভব করছে বিশ্বময়ের মহান অমানুষী প্রেম। চোখের সামনে আস্তে আস্তে সব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে... অজস্র তারার দল, পূর্ণিমার একা পূর্ণচন্দ্র, মোহময় আলোয় ভেসে অনন্ত আকাশে ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। শরীরের প্রতিটা অণু-পরমাণু দিয়ে অনুভব করছে সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী প্রেম। এই কী ঈশ্বর? চোখে জল। এই বিশালের কাছে তার মতো তুচ্ছের কী দাম? জলভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিনছে প্রভুকে, বুঝছে মহান প্রেম। যদি পুতুল ছাড়া ঈশ্বর থাকেন, সে যেমন সত্য, বর্ণালীও। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে। মহতী প্রেমের দিক-ভাসানো বন্যায় ভেসে তাকাল পূর্ণচন্দ্রের দিকে। কানে এল মহান দিব্যবাণীঃ

'ওঁ পূর্ণমদ্য পূর্ণমিদং
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণাস্য পূর্ণমাদায়
পূর্ণমেমাবশিষ্যতে'

তেত্রিশ

উত্তরটা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে, ভাবতে পারেনি অরুন্ধতী। নেটের জমানায় আগের মতো কাজ আটকে পড়ে থাকে না। গভর্নমেন্ট হলে অবশ্য স্বতন্ত্র। পার্মানেন্ট চাকরির সিকিউরিটিতে সরকারি বাবুরা ওভারটাইমেই কাজ করে। নয়ত নয়। ঘুষের সম্ভাবনা থাকলে ভেট না পেলে ফেলেই রাখে। জয়ন্ত পদস্থ অফিসার বলেই সিবিআইয়ের জালে। সরকারি বাবুদের পেছনে সিবিআই লাগলে অফিসের বেশি শতাংশই খালি হয়ে যেত। এরাই ঘুষের টাকায় বাজারে ইলিশের দাম বাড়ায়। মেহেঙ্গার বাজারে এদের গায়ে ছিটেফোঁটা আঁচ লাগে না। এরাই তো সরকারের জামাই। ভোট দেওয়া আম জনতা নয়।

ই-মেলে কনফার্মেশন আগেই এসেছিল। ফোনেতে আহ্বান আসায় অরুন্ধতীকে ডিসিশনের কাঠগড়ায় ফেলে দিল।

মুম্বাই না শময়িতা?

টাকা না শান্তি?

উচ্চ অভিলাষ?

না সাধারণভাবে বাঁচার প্রত্যাশা?

নিজেকে খোঁজার আশা।

“অসীমদা শময়িতা কনভেন্ট স্কুল থেকে কনফার্মেশন এসে গেছে”

“চাকরিটা নেবে?”

“টুবলুর স্কুলের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত ডিসিশন নিতে পারছি না”

“দেখি কথা বলে। সেন্ট জেভিয়ার্স দুর্গাপুরে একটা অ্যাপ্লিকেশন তো পাঠিয়ে দাও। মেলে তার কপিটা ফরওয়ার্ড করে দিও” ফোনটা কেটে দিল।

প্রতীককে ফোন “আরেকটা চাকরি পেয়েছি। বাঁকুড়ার শময়িতা স্কুলে টিচারের চাকরি। ভাবছি কী করি। তুমি কী কলকাতায় আসছ?”

“কাল একদিনের জন্য অ্যাপোলোতে যেতে হবে কন্ট্র্যাক্ট সই করতে”

“ক'টা নাগাদ শেষ হবে?”

“আশা করি লাঞ্চটাইমের মধ্যে”

“দেখা করতে পারি?”

“শিওর”

“আমি স্ট্যাডেলে অপেক্ষা করব। হোয়েন ইউ ফিনিশ, জয়েন মি ফর লাঞ্চ দেয়ার”

একটার একটু পরে প্রতীক ঢুকে বলল “এ চাকরিটার হদিস কোত্থেকে পেলে?”

“কথাচ্ছলে অসীমদা বলেছিল। ভাবলাম অ্যাপ্লাই করে দেখি না কেন। আজ কনফার্মেশন এসেছে”

“কী করবে তাহলে?”

“সেই জন্যেই তো তোমার সঙ্গে। ডিসিশন নিতে পারছি না। এর মধ্যে আবার পূর্ণেন্দু সেনকে সিবিআই অ্যারেস্ট করেছে। মানে ফ্যাশন আনলিমিটেড বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায়”

“তোমার কাছে তাহলে এখন দুটোই অল্টারনেটিভ। সুব্রত অর শময়িতা স্কুল”

“জয়ন্ত পাঁচ বছর হাজতে। ফিরেও রোজগারের চান্স কম। নিড এ স্টেবল ইনকাম নাউ। কান্ট সিট লাইক এ ডাক উইথ দ্য ফেট অফ ফ্যাশন আনলিমিটেড হ্যাঙ্গিং ইন দ্য এয়ার”

"এনি প্রেফারেন্স?"

"সুব্রতর চাকরি পূর্ণেন্দুর থেকে উনিশ-বিশ। সেই মডেলিং, শো-বিজ। ফাস্ট লাইফ। স্লোলি দ্যাট ইজ গেটিং অন মাই নার্ভস। ওয়াজন্ট কোয়ালিফায়েড টু দিজ টাইপ্স অফ ওয়ার্ক। অলসো নিড এ স্পেস টু লুক অ্যাট মাইসেল্ফ। হুইচ আই ওন্ট গেট ইন ফাস্ট মুম্বাই লাইফ"

"সো ইউ প্রেফার দ্য ল্যাটার"

"লুকস মোর টু মাই মেন্টাল মেক আপ। হোয়াই নট গিভ ইট এ ট্রাই। আই ক্যান অলওয়েজ রিভার্ট টু সুব্রত, ইন কেস ইট ডাজেন্ট ফিট মাই মেন্টালিটি। এক সময় ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম। এখানে পুরনো বিদ্যে ঝালিয়ে নেওয়া যাবে। টুবলুকে পড়াবার সময়ও পাব। মুম্বাইতে থাকলে বোর্ডিং স্কুলে দিতে হবে। অ্যাটাচমেন্ট চলে যাবে"

"দ্যাট সাউন্ডস লজিক্যাল। আমি তো মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলে রেখে পড়াইনি। নিজের কাছেই মানুষ করেছি। দে স্টিল হ্যাভ দ্যাট বন্ডিং হোয়ারএভার দে আর। ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ এ কম্প্রোমাইজ। র‍্যাট রেসে কে কদ্দুর এগোচ্ছে, তা কী নিজেই জানে? খালি জানে ছুটতে হবে। কোথায় ছুটছে, কেন ছুটছে, ছুটে কী হবে, না ছুটলেই বা কী লোকসান, ভাবার সময় আছে?"

"সেই সময়টাই খুঁজছি। নিজেকে দেখার। কম বয়সের ধ্রুবতারার রংটা পালটে গেছে। নতুন তারাকে চেনার চেষ্টা মাত্র। সুব্রতকে এখন কিছু বল না। লেট ইট স্টে অ্যাজ ইট ইজ। লেট মি জয়েন অ্যান্ড সি। অলওয়েজ হ্যাভ দ্য অপশন অফ রিভারটিং..."

বলল ডিসিশন নেয়নি। সাবকন্সিয়াসলি নিয়েই ফেলেছিল। প্রতীককে মনের কথাটাই বলল। মন যা চায় তাই করুক।

ওখানেই শান্তি।

ওখানেই তৃপ্তি।

ওখানেই মুক্তি।

গঙ্গাজলঘাঁটি পেরিয়ে অমরকানন। বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে আধা শহর। ছোট হলেও তুচ্ছ নয়। জগদ্বিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা ছাড়াও আছে বিখ্যাত শময়িতা মঠ। মঠগুরু পূজ্যপাদ শ্রী প্রভুজি মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনী ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি শিক্ষা ও চিকিৎসার সেবাডালি নিয়ে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের মধ্যে। যাঁদের এক বড় অংশই আদিবাসী।

সে অন্য গল্প।

অমরকাননে ঢোকার আগেই চোখে পড়ে দূরে বাঁ দিকে ছবির মতো ছোট্ট পাহাড়। কবি নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত কোরো পাহাড়। উচ্চতার আভিজাত্য নেই। শুশুনিয়া পাহাড়ের মতো অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানিও নেই। শান্ত পরিবেশে, নীল আকাশের কোলে, ছোট্ট ত্রিভুজাকৃতি সবুজে মোড়া পাহাড়টির মাথায় দুধসাদা মন্দির। চোখ জুড়ানো ল্যান্ডস্কেপ।

এমনই পরিবেশ খুঁজছিল অরুন্ধতী। শহরের কোলাহল, র‍্যাট রেস থেকে দূরে, নিরিবিলি। যেখানে নিজেকে দেখার সময় আছে। টুবলুকেও। নিজের মতো করে পাওয়ার মুহূর্ত। কাজ হাসিলের উন্মাদনায় রাতদিন সং সেজে ঢং করতে হবে না। মধ্যবিত্তর নিতান্ত গেরস্ত জীবনযাপন। ঐশ্বর্যের কোলে বড় হওয়া, জয়ন্তর অর্থলিপ্সার পরিণতি, তাকে বিমুখ করেছে। যে টাকা শান্তি দিতে পারে না, তার মূল্য কতটুকু? শান্তিটাই মুখ্য, পাওয়ার উন্মাদনা গৌণ।

মেন রাস্তার গায়ে ন্যাশনাল হাইওয়ের তকমা থাকলেও গরিব দুঃখী চেহারা। একদিকে রাস্তা চলে গেছে রানিগঞ্জ হয়ে বীরভূমের মোরগ্রাম, অন্যদিকে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হয়ে খড়্গপুর। গঙ্গাজলঘাঁটি পেরিয়ে মেন রাস্তা থেকে ডানদিকে মোড় নিয়েছে একসারি দোকানঘরের আড়ালে। একটু এগোতেই প্রচণ্ড গরমে এক পশলা বৃষ্টির মতো হঠাৎ চোখে পড়ে এক ঝলক সবুজ মুক্তি। দুধারে সবুজ মাঠ। তার বুক চিরে ডানদিক থেকে বাঁদিকে ছোট্ট শালি নদী। শালি নদীর ছোট ব্রিজ পেরোবার আগেই ডানদিকে বড় গেট। ভেতরে বড় বিল্ডিং। ওটাই শময়িতা মঠ পরিচালিত কনভেন্ট স্কুল। শালি নদীর পাড়ে, দিগন্তবিস্তৃত সবুজের হাতছানির মধ্যে সাদা স্কুল বাড়িটি দেখে প্রথমেই যে চিন্তা ওর মাথায় এল, আহা রে, যদি এই স্কুলে পড়তে পারতাম! লরেটো কনভেন্ট, এটাও। তফাত ওখানে নানরা পড়ায়। এখানে অরুন্ধতীর মতো তুখোড় ছাত্রীরা। নেট থেকেই জেনেছে পশ্চিমবাংলার এক কোণায় এই স্কুলের খ্যাতি।

এগোতেই বাঁদিকে অনেকগুলো ছোটবড় বিল্ডিং। পরে জেনেছে রণবহালের শময়িতা মঠ পরিচালিত কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্কুল। সঙ্গে মাঝারি আকারের হাসপাতাল। বহু মানুষ, সংস্থার দান সাহায্যে গড়া আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসক সহ প্রতিটি কর্মীই ভলেনটারি সার্ভিসে। সেবা, একমাত্র সেবাই এদের মন্ত্র। প্রচারবিমুখ সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে কর্মীরাও বিশ্বাস করে জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। জীব সেবাই শিব সেবা।

রাস্তাটা সোজা চলে গেছে রণবহাল গ্রামের দিকে। বাঁদিকে শময়িতা মঠ, ডানদিকে শালি নদী পেরিয়ে দিগন্তে ধোঁয়াটে শুশুনিয়া পাহাড়। শালি নদীর ওপর গানদুয়া ড্যাম। এখান থেকে দেখা না গেলেও।

হাসপাতালের পরে পরপর ছাত্রীদের হোস্টেল, মঠের অফিস, সন্ন্যাসিনীদের থাকার বিল্ডিং। কিছুটা গ্যাপ দিয়ে শান্ত তপোবনের মতো গাছ পরিবেষ্টিত মূল মঠ। গেট দিয়ে ঢুকতেই অরুন্ধতীর চোখে পড়ল কতগুলো ছোট ঘর। একপাশে বেড়া দিয়ে আলাদা অতি সাধারণ বাড়ি। প্রভুজি মহারাজের বাসস্থান, সাধনকক্ষ। সাধারণের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রভুজি মহারাজের আদেশ ছাড়া কেউই ওখানে যেতে পারে না। পরে জেনেছে মহারাজের অসংখ্য ভক্ত। অনেকেই প্রতিদিন বিকেলে আসে মহারাজের দর্শনে। প্রভুজি প্রতিদিন সন্ধের আগে বাইরে বেরিয়ে বাগানে পায়চারি করেন। নিঃশব্দে, জোড়হাতে দাঁড়িয়ে, ভক্তরা নতমস্তকে আশীর্বাদ নেয় প্রভুজির। কথাবার্তা নেই। নিস্তব্ধতা ভাঙে হাজারও পাখির কলতানে। সময় যেন থমকে সত্যযুগের আবহে।

হাসপাতালের পিছনে দোতলা আধুনিক সুন্দর গেস্ট-হাউস। সেটাই আপাতত অরুন্ধতীর বাসস্থান। যদ্দিন না কোয়ার্টারের ব্যবস্থা হচ্ছে। গেস্ট-হাউসের ঘর থেকেই চোখ চলে গেল দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ, ধানখেতের মখমলে। দূরে কোরো পাহাড়ের হাতছানি। প্রতিধ্বনি করছেঃ

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ
শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ সর্বে মে
দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব শান্তিভিঃ শয়মামোহহং যদিহ ঘোরং যদিহ
ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ।।

গেস্ট-হাউসের পেছনে নতুন ফ্ল্যাট। ভক্তরা অনেকেই ফ্ল্যাট কিনেছে শেষ জীবন শান্তির কোলে অতিবাহিত করতে। সব মিলিয়ে নিটোল শান্তির আশ্রয়।

অরুন্ধতীর মন ভরে গেল। এই পরিবেশই তো নিজেকে দেখার মোক্ষম জায়গা। নিজেকে চিনলে, দুনিয়ার লাফালাফি, দাপাদাপিকে সার্কাস ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। নিজের অজানা দিককে নিজের করে পাওয়ার মধ্যেই তো জীবনের সার্থকতা। কে বুঝল, না বুঝল, বয়েই গেল। অসীমের স্বর্গ তো অজানা আকাশে নয়।

ইহলোকেই। সীমার মধ্যে। শুধু চেনাটাই বাকি ছিল। অজানা ধ্রুবতারা আকাশের আঁধারপথে আলো দেখায়নি, চিনিয়েছে নিজেকে। সীমার গণ্ডিতে ধরে রেখেছে অন্তরের অসীমকে। আঁধার কেটে গেছে। আলোকিত চেতনা মেকি অন্ধকার মুক্ত করে জ্বালিয়েছে দীপশিখা। যার পবিত্র আলোয় অরুন্ধতী চিনতে পারছে নিজেকে।

প্রয়োজন নেই অন্য কিছু দেখার। নিজেকে দেখে, চিনে, বুঝলেই তো ঈশ্বর। আচারে নয়, মনে। শান্ত, নিবিড় কোণে। একাকী উন্মোচনে। এখানেই খুঁজে নিতে হবে বাঁচার পথ। নতুন অর্থ। যা এতদিন শেখেনি।

এখানে শুধু পড়াতেই আসেনি। পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে নিজের অসম্পূর্ণ শিক্ষাও সম্পূর্ণ করতে এসেছে।

চৌত্রিশ

আলিপুরের বাংলোর বাগানে ব্রেকফাস্ট শেষ করে উঠতে যাবে, লোহার ফটক ঠেলে হঠাৎ সম্বিতকে ঢুকতে দেখে বলল "এত সকালে? এস, এস"

উইক-ডেতে সময় না পেলেও, বরাবরই উইকেন্ডে লনেই ব্রেকফাস্ট খায়। শহরের কর্মব্যস্ততায় প্রকৃতিকে কাছে পাওয়া। সকাল সকাল উঠলে লনেই জগিং করে, গাছে জল দিয়ে, ব্রেকফাস্ট। স্বর্ণালীও আগে থাকত। দূরত্বের পর ইদানীং আর থাকে না। ভোরের কুয়াশাস্নাত ফুলে জল দিয়ে প্রকৃতির ঘ্রাণ নেয়। যেমন নিত ছোটবেলায়, বাঘাযতিনের পুকুরপাড়ে। তফাত শুধু মাঝে এত বছর। মেজাজটা আগের মতোই। পুকুরপাড় বাহারি না-হলেও এই লনটা ফুলে, গাছে সাজিয়ে রেখেছে মালি।

সম্বিত অসীমের হাতে একটা চিঠি এগিয়ে দিল "মা দিয়েছে"

"ব্রেকফাস্ট খাবে?"

মাথা নাড়ল। চিঠিটা খোলার সময় অবাক হল। এর আগে তো বর্ণালী কখনও চিঠি দেয়েনি। যা বলার ফোনে বা সাক্ষাতেই বলেছে। আজ হঠাৎ!

অসীমদা,

চললাম।

দূরে বহুদূরে, এমন এক জায়গায় যেখানে নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারব। সংসারের ব্যস্ততায় সময় হয়নি বলার। মনে হল, অনেক তো হল। আর ভালো লাগছে না। এমন এক জায়গার সন্ধান পেয়েছি, যেখানে নিজের সঙ্গে কথা বলার অফুরন্ত সুযোগ। সংসার আর আমায় টানে না। ভেব না সন্ন্যাসী হয়ে গেছি। ও সব আমার মধ্যে নেই। এমনিতেই পুজো-আচ্চা করি না। তাই সন্ন্যাসে আসক্তি নেই। সম্পর্ক, নিয়ম, দায়িত্বের জাঁতাকলে নিজের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলাম। বিজিত মারা যাওয়ার পর সম্বিতের কথা ভেবেই ছাড়তে পারিনি। এখন ও বড় হয়েছে। ব্যাঙ্গালুরুতে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছে। আশা করি পেয়ে যাবে। কখনও তো কিছু চাইনি। আজ চাইছি। ওর দায়িত্ব তোমার আর স্বর্ণালীর হাতে দিয়ে গেলাম। সাদার্ন অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটের চাবিটা ও-ই তোমায় দিয়ে দেবে। ফ্ল্যাটটা শখ করে বিজিত কিনেছিল। দেখে রেখ। ওর খরচ দিয়ে তোমাকে ছোট করব না। বহন করার ক্ষমতা তোমাদের আছে।

স্বর্ণালী ও তুলিকে আমার ভালোবাসা দিও। বল, দিদির ওপর যাতে রাগ না রাখে। আমারই তো ছোট বোন। জেদি হলেও আদুরে। ওর অধিকারে কোনোদিনও ভাগ বসাইনি। আজও নয়। আশীর্বাদ কর যে রত্নের সন্ধানে সব ছেড়েছুড়ে বেড়িয়ে পড়লাম, তা যাতে খুঁজে পাই। ঈশ্বর তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন। ভালো থেক। তোমারা সুখী হও।

প্রণাম নিও।

বর্ণালী

চিঠিটা হাতে চুপ বসে। সম্বিত ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে। দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল ছেলেটা। একেবারে বর্ণালীর মুখ বসানো।

"এখন থেকে এখানেই থাকবে"

"মা বলে গেছে। ও হ্যাঁ, এই চাবিটাও তোমাকে দিতে বলেছে" ফ্ল্যাটের চাবি বার করে মেসোর হাতে দিল।

"তোমার জিনিসপত্র?"

"ফ্ল্যাটেই আছে। আনতে হবে"

"তোমার সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসব। তুমি খাও। ভেতরে গিয়ে তোমার থাকার ব্যবস্থা করি"

চিঠিটা পড়ে স্বর্ণালী আকাশ থেকে পড়ল "দিদি চলে গেল?"

উত্তর দিল না অসীম। কেন চলে গেছে, অসীম না জানলেও সে তো জানে। অনুতাপ হচ্ছে। রাগের মাথায় দিদিকে যা-তা বলা ঠিক হয়নি। দিদি বরাবরই স্বল্পভাষী। তবুও সেদিন আবেগে অনেক কথা বলে ফেলেছিল। কতটা দুঃখ দিয়েছে, বুঝতে পারছে। এখন অনুতাপ করে কী হবে? দিদির কাছে গিয়ে ক্ষমাও তো চাইতে পারবে না। বরং ওর আত্মজকে আপন করে মানুষ করার মধ্যেই প্রায়শ্চিত্ত। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। মনে হল, প্রতি সকালেই তো সূর্য ওঠে। কিন্তু এমনভাবে তো নয়। আজ যেন অন্যরকম।

অসীমকে চলে যেতে দেখে ভীষণ দুঃখ হল। আগের মতো তো লোকটা কিছু বলল না। বলতে চাইল না। নিঃশব্দে বাথরুমে। চিঠি হাতে একা বসে ভাবছে, এটাই কী হওয়ার ছিল? না, ঠেকানো যেত। ভবিতব্যকে কী ঠেকানো যায়?

বাথরুম থেকে বেরতেই বলল "আজ কী অফিসে যেতেই হবে"

"কেন?"

"ভাবছিলাম সম্বিত এসেছে। চল না কোথাও লং ড্রাইভে ঘুরে আসি"

অবাক তাকাল অসীম। ইদানীং স্বর্ণালী ক্লাব, বন্ধুবান্ধব, বিউটি পার্লার নিয়েই ব্যস্ত। কখনও তো এভাবে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেনি। হল কী আজ?

বাহির ছেড়ে ঘরে।

পর ছেড়ে আপনারে।

সমাজ ভুলে নতুন সুরে।

কিছুক্ষণ। ভাবছে। বুঝতে পারছে। বর্ণালীর যাওয়ায়, চেতনা। বর্ণালী শুধু চেতনা থেকে অসীমকে দেখতেই বেরয়নি। সীমার মধ্যেই তাকে খুঁজতে গেছে। সঙ্গে অদৃশ্য মায়াবলে জাগতিক প্রেমের বীজও উপহারে। এই মূল্যহীন রত্নকে জাগতিক দামে কেনা সকলের সামর্থ্য নেই। অসীমের তো নয়-ই।

"বেশ, চল। কোথায় যাবে?"

পঁয়ত্রিশ

কটেজের জানলা দিয়ে বাইরে পাইন জঙ্গলের দিকে আনমনে বর্ণালী চেয়ে। পাইনের গন্ধটা খুব চেনা। যেন জন্ম-জন্মান্তরের। প্রাণভরে পাইনের ঘ্রাণ নিল। গন্ধটা শুধু পাইন জঙ্গল থেকেই আসছে, তা নয়। ও যে ঘরে বসে, তাও পাইন কাঠের তক্তায় তৈরি। মেঝে, দেয়াল, ছাদের সিলিং, সবই। প্রতিটা তক্তা থেকেই ওই গন্ধ। ও দিয়েই ওরা কথা বলে। সে ভাষা বুঝতে মনেপ্রাণে পাইন হতে হবে। বোঝা যাবে ওদের না-জানা ভাষা। শোনা যাবে পাইনের গান। পাহাড়ি মাটির বুকে নেচে নেমে আসা সুন্দরী ঝর্ণার তান। ঢেউ তোলা হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে বর্ণালীর মনে হল, ওই নিস্তব্ধ পাহাড়ের ধ্যানের ওপারেই কী সেই 'এলস হোয়ার'-এর হাতছানি? না কি, সবই মনের ভুল, মায়া?

কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সব লাফালাফিই দু'দিনের। তারপরে অনন্ত অন্ধকার। ওপারে কী? তমসঃ পরস্তাত আদিত্যবর্ণ পুরুষ কী শুধুই কবির কল্পনা, না সত্যি? সীমা-অসীমের বাইরে কী? মিনোস্কি ডায়াগ্রাম। আইনস্টাইন কী বলে?

ঠিক তিনমাস সতেরো দিন এখানে। সম্বিতকে ছেড়ে আসার সময় কোনও ডেফিনিট প্ল্যান নিয়ে বেরয়নি। খারাপ লাগছিল উপস্থিতিটা স্বর্ণালী-অসীমের দাম্পত্য জীবনে সংঘাত আনছে। শহুরে জীবনে চাওয়া কোনওদিনই ছিল না। শুধু সম্বিতের জন্য পড়ে থাকা। ভালো ছাত্র। নিশ্চয়ই ব্যাঙ্গালুরুতে পেয়ে যাবে। তারপর কলকাতাতেও একা, বাইরেও। সামাজিক বলয় বিকাশ উত্তরণের পরিপন্থী। হাঁপিয়ে উঠছিল।

সম্বিতকে একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করল "আমি না থাকলে তোর অসুবিধা হবে?"

"তুমি আবার কোথায় যাবে?"

"তুই ব্যাঙ্গালুরু চলে গেলে এখানে একা পড়ে কী লাভ?"

সম্বিতের মনে হয়েছিল, মা এই শহুরে দুনিয়া থেকে মুক্তি চাইছে। বাবার মৃত্যুর পর, ওর মুখ চেয়েই তো সব চাওয়া, আনন্দ-উচ্ছ্বাস সরিয়ে রেখেছে। আজ যদি তার কাছে কিছু চায়, বাধা দেওয়া ঠিক হবে না।

"অসীম মেসো, স্বর্ণালী মাসির কাছে থাকলে অসুবিধা হবে?"

মা তো একা ফেলে যাচ্ছে না। মাসি-মেসোর ওপর দায়িত্ব দিয়েই যাচ্ছে। সারাজীবন মা তার জন্যেই করেছে।

"বেশ। যাও"

সাদার্ন অ্যাভিনিউর সংসার, সম্বিতকে অসীমদা-স্বর্ণালীর কাছে পাঠিয়ে, সভ্যতা ছেড়ে, ছোট ট্র্যাভেল ব্যাগে সামান্য কয়েকটা জামাকাপড়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ফ্লাইটে শ্রীনগর। তারপর ভাবা। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে পাহেলগাঁও। ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে সারাদিনের ট্যুরে চন্দনবাড়ি, বেতাব ভ্যালি হয়ে আরু ভ্যালি। মন ভোলানো সুন্দর আরু গ্রাম যেন শান্তির ছবি। বন্ধন মুক্ত জীবন। কিছুদিন কাটাতে মন চাইল। ছবির মতো ছোট্ট সুন্দর হোটেল। কিছুদিন বদলে মাস।

হোটেলের সামনে কয়েকটা দোকানের পরেই সবুজ ঘাসের কার্পেটের মাঠ। পাশে পাহাড়ি নালা। ছলছল কলকল স্বচ্ছ বরফ-ঠান্ডা জলধারা বইছে আরু নদীর দিকে। দিনের বেলায় মাঠে ঘোড়া, পাহাড়ি ছাগল। ডে-টুরিস্টদের দৌড়োদৌড়ি। অনেকেই ঘোড়ায় চড়ে পাইন বন, পাহাড় ঘোরে। রাতে মাঠের অন্য রূপ। চাঁদ না থাকলে তারার আলোয় রূপকথার রহস্যময় তেপান্তর। সেখানে সাদা ঘোড়ায় সওয়ার রূপকুমার রাজপুত্তুর। মাঠে চাঁদের আলোর বন্যায় খেলে স্বপ্নপুরের পরিরা। সারারাত নদীর পাড়ে ছুটোছুটি, দাপাদাপি। ভোরের আজান শুরু হতেই লোকায় পাইন বন পাহাড়ের মাথায় জমা নরম বরফের চাদরের ভাঁজে।

জায়গাটা ভাল লাগায়, ঠিক করল এখানেই থেকে যাবে। অনেক খোঁজ করে গ্রামের শেষপ্রান্তে এই কটেজটা ভাড়া নিয়ে এখানে মাস দুয়েক। ভাড়া নেওয়া সহজ হয়নি। একা মহিলাকে ভাড়া দেওয়া নিয়ে প্রবলেম। তাও মেমসাহেব হলে হত। ভারতীয় একা মহিলা এরকম কটেজ ভাড়া নিয়ে রিমোট পাহাড়ি গ্রামে থাকতে পারে, আরু গ্রামের লোকেদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। কটেজ ভাড়ার জন্য খোঁজ। প্রাথমিক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে পেয়েও গেল গ্রামের শেষপ্রান্তের এই পাইনকাঠের কটেজ। হোটেল মালিকের ভাইয়ের। মাঝেসাঝে ট্রেকাররা থাকে দু-এক দিন। সাহেবরা কেউ সাত-দশ দিন। বর্ণালীই প্রথম একবারে ছ'মাসের জন্য অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে ভাড়া নিল। কাজের লোকও জুটে গেল। রান্না করে দেবে।

ডে-টুরিস্টদের দেখে অভ্যস্ত। তারা তো ফেরত চলে যায়। আর একদল টুরিস্ট আরু গ্রামকে বেস করে কোলাহাই গ্লেসিয়ার ট্রেকিং-এ যায়। সাহেবই বেশি। ওদের জন্য এই রিমোটেও ছোটবড় অ্যালপাইন কটেজের মতো হোটেল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়ার সুন্দর পাহাড়ি বর্ণাঢ্য। সাধারণ টুরিস্টদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি বাঙালি। তাই দোকানদার, ঘোড়াওলারা বাংলা ভালোই বোঝে। কেউবা ভাঙা দু'একটা কথাও বলতে পারে।

প্রথম আরু ভ্যালি সম্বন্ধে বর্ণালী জানে এক বাংলা ভ্রমণ ম্যাগাজিন থেকে। লেখক বারবার লিখেছিল ডে-ট্রিপ না করে দু'দিন থেকে যেতে। লেখকের নাম মনে নেই। শহর থেকে অনেক দূরে কোলাহাই গ্লেসিয়ার থেকে নামা উচ্ছ্বল আরু নদীর পাড়ে পাইনবনের ছায়ায়, পহেলগাঁওয়ের থেকেও বেশি বন্য সুন্দর।

দিনে বর্ণালী সবুজ মাঠে হাঁটে। কখনও ঘোড়া নিয়ে দূর পাহাড়ের কোলে। কয়েকদিন পরেই বুঝল এটাই ম্যাগাজিনের আরু ভিলেজ। এখানেই আত্মার শান্তি, মনের আরাম। সীমা-অসীমের ওপারে মিনোস্কি ডায়াগ্রামের 'এলস হোয়ার'। পরম রহস্যময়ের পথে।

প্রজ্ঞানন ব্রহ্ম থেকে পাওয়া জাগ্রত চেতনার বিন্যাস। তার দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিন্যাসেই সভ্যতা থেকে বর্ণালী এখানে। পঞ্চেন্দ্রিয় মানে অজানা। জ্ঞান জানা। বিজ্ঞান ব্যাখ্যা। সত্ত, রজ, তম ক্রমশ অচৈতন্য থেকে চেতনায়। সীমার মধ্যেই অসীমকে পাওয়ার হাতছানি। এর বাইরে প্রাজ্ঞানম-ই চৈতন্যে উত্তরণ। ঋগ্বেদের ধ্রুবতারাই ব্রহ্ম কি না জানে না। মহাব্যোমে খোঁজা মানে জাগতিক বলয়ের বাইরে। সেই অজানায় কী চেতনার পূর্ণতা পাওয়া যায়? যদি মানুষ অমৃতাস্য পুত্রই হয়, ব্রহ্মাণ্ডের ইউনিভার্সাল এনার্জির একাংশ, তবে সে কোন অজানা অসীমে খুঁজবে উত্তরণের চেতনা? তা কী মুনি-ঋষিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

অহম ব্রহ্মাস্মি বলে, ঘুমের সময় বা সদ্য জাগ্রত শিশুর জাগরণেই অচৈতন্য। জানা নেই অস্তিত্ব। অথবা আধ-চৈতন্য স্বপ্নের ঘোর। জানা, কিন্তু দেখার ক্ষমতা নেই। জাগ্রত 'চেতনা' পঞ্চেন্দ্রিয়র আমিত্ব বাসনা। সীমার মধ্যেই খ্যাতি, দ্যুতি থেকে অবলুপ্তি। শিকল বাঁধা সাংসারিক বলয়ে আমিত্বের আস্ফালন। ব্যক্তি অহং ছেড়ে চেতনার মার্গে ছোটার চেষ্টা। ব্রহ্ম দর্শন, আত্মা। আমার আমিকে না বুঝে অনির্দিষ্ট অসীমের নামে খেলা। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার মধ্যেই অধিষ্ঠান। আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি।

এত কিছু পড়ে বর্ণালী খুঁজে পায়নি বর্ণিত অসীম। শাশ্বত গ্রন্থ থেকে কবিগুরু। সীমার নাগপাশেই সীমাবদ্ধ। অসীম ধোঁয়াশা। এখনও অজানা, অচেনা। মাণ্ডুক্য উপনিষদের চেতনার ব্যাপ্তিতেও অসীম সেই অজানা। জাগ্রত স্তরে তো কেবল নিজেকেই দেখা। অস্তিত্বের তারতম্য নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অচৈতন্যের আরেক রূপ। স্বপ্নেও অর্ধ-চৈতন্য। ঘুমের আমি আর বাইরের তারতম্য ভেদে অপারগ। এ কোন আমি? গভীর সুপ্তিতে আমিটাই আচ্ছাদিত। দেহ, মন, ইন্দ্রিয় অস্তিত্বহীন। তুরীয়তে আত্মজ্ঞান জাগ্রত। আত্মা ব্রহ্ম মিলেমিশে একাকার। যেখানে নিদ্রা, জাগরণ আপেক্ষিক।

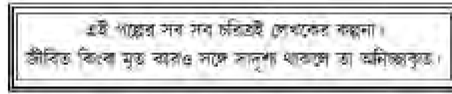
বর্ণালী মুনি-ঋষি নয়। সিদ্ধপুরুষও নয়। নিতান্তই সাধারণ মহিলা। তায় বাঙালি গৃহবধূ। সংসারী, বিধবা। তার শান্তির পথ কী পুঁথির পাতায়? না, হিমালয়ের গুহায়? সংসার পেছনে ফেলে আলো আঁধারিতে। শান্তি যদি এই কঠিন অজানায়, তার মতো সাধারণ কী করে পাবে সেই সন্ধান?

কটেজ থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে রাতের কালোয়। আকাশে সাজো সাজো রব। লক্ষকোটি তারা অলিন্দে জ্বালাচ্ছে ঝিকমিকে আলোর রংমশাল। কয়েকটা বড় তারা গম্ভীর দেখছে। মেজো তারাগুলোর মিটমিটে হাসি। ফচকেগুলো আকাশগঙ্গায় আলোর নদীতে হুটপাটি করছে। উচ্ছ্বল হাসি ছড়িয়ে ছটিয়ে হাজার আলোর ফুলকি। বর্ণালী আনমনে আকাশের দিকে তাকাল। তারার আলোয় কালো আকাশে মায়াময় মূর্ছনা। কারা যেন হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে সেখানে।

হঠাৎ চোখ পড়ল পশ্চিম আকাশে। তার গায়ে আধফালি চাঁদ। উজ্জ্বল নয়, অনুজ্জ্বলও নয়। আকাশের গায়ে আলগোছে লেপটানো পার্থিব চাঁদকে দেখে মনে হল, এই চাঁদ যেখানে লেগে, সেটা নিতান্ত শূন্য আকাশ নয়, আলোর বন্যা আর আঁধারের জ্যোৎস্না তো তার মধ্যেই। পুঁথির ধোঁয়াশায় নয়। তার অচেনা আমিকে দেখার মধ্যেই অসীমের স্বাদ। নিজেকে দেখা, চেনা, বোঝার মধ্যেই আলো। অসীমের আঁধারে নয়। আদেখা আমিকে দেখে ভয়কে জয়ের পথেই পূর্ণতা। সীমাহীন আকাশের অদৃশ্য কোণায় নয়। সীমার বন্ধনে, চেতনার উন্মেষেই শান্তি। যেখানে বাহির আপেক্ষিক।

মন ভরে গেল পরম আশ্রয়দায়িনী শান্তির মন্ত্রে। ফেরার ইচ্ছে নেই। এই প্রকৃতির কোলেই নিজের মধ্যে পূর্ণতার আলোয় তার ইহলোক, পরলোক। সব লোকের সমন্বয়ে জাগ্রত অন্তরের মহালোক।

অন্তরের প্রণবধ্বনি বোধহয় ক্ষীণ হলেও শুনতে পাচ্ছে। বাস্তবে তার মনকে নিয়ে যেতে চায় ইহলোকের স্বপ্নমহলে। অগম্য পরম প্রশান্তিময় ভূলোকে।


এই গল্পের সব সব চরিত্রই লেখকের কল্পনা।
জীবিত কিংবা মৃত কারও সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত।